তুঙ্গভদ্রার তীরে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

শক : শ্রীফণিভূষণ দেব
ন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যের বিক্রমশীল ধর্মপাল
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
সহৃদয়েষু

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত। Sewell-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনাকাল খৃ ১৪৩০এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।

অনেকের ধারণা পোর্তুগীজদের ভারতে আগমনের (খৃ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ অনুমান করেন, সুলতান ইলতুৎমিসের সময় ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে স্বয়ং বাবর শাহ্ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালী যোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। এই কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবতারণা অলীক কল্পনা নয়। তবে বাবর শাহের আমলেও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে আবির্ভূত হয় নাই।

দেশ-মান সম্বন্ধে সেকালে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। চাণক্য এক কথা বলেন, অমরসিংহ অন্য কথা। আমি মোটামুটি ৬ ফুটে ১ দণ্ড, ২০ গজে ১ রজ্জু এবং ২ মাইলে ১ ক্রোশ ধরিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার এই কাহিনী Fictionised history নয়, Historical fiction.

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊর্মিমর্মর

দক্ষিণ ভারতে বাক্য প্রচলিত আছে: গঙ্গার জলে স্নান, তুঙ্গার জল পান। অর্থাৎ গঙ্গার জলে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তুঙ্গার জল পান করিলেও সেই পুণ্য। তুঙ্গার জল পীযূষতুল্য, মৃত-সঞ্জীবন।

সহ্যাদ্রির সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র নদী উত্থিত হইয়াছে, তুঙ্গা ও ভদ্রা। দুই নদী পর্বত হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পরস্পর মিলিত হইয়াছে, এবং তুঙ্গভদ্রা নাম গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা নদী স্বভাবতই তুঙ্গা বা ভদ্রা অপেক্ষা পুষ্টসলিলা, কিন্তু তাহার পুণ্যতোয়া খ্যাতি নাই। তুঙ্গভদ্রা অনাদৃতা নদী।

তুঙ্গভদ্রার যাত্রাপথ কিন্তু অল্প নয়! ভারতের পশ্চিম সীমান্তে যাত্রা আরম্ভ করিয়া সে ভারতের পূর্ব সীমায় বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইতে চায়। পথ জটিল ও শিলা-সঙ্কুল, সঙ্গিসাথী নাই। কদাচিৎ দুই-একটি ক্ষীণা তটিনী আসিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা তরঙ্গের মঞ্জীর বাজাইয়া দুর্গম পথে একাকিনী চলিয়াছে।

অর্ধেকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিবার পর তুঙ্গভদ্রার সঙ্গিনী মিলিল। শুধু সঙ্গিনী নয়, ভগিনী। কৃষ্ণা নদীও সহ্যাদ্রির কন্যা, কিন্তু তাহার জন্মস্থান তুঙ্গভদ্রা হইতে অনেক উত্তরে। দুই বোন একই সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল; পথে দেখা। দুই বোন গলা জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে চলিল।

তুঙ্গভদ্রার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে নাই, তাহার তীরে তীর্থ-সিদ্ধাশ্রম মঠ মন্দির রচিত হয় নাই, তাহার নীরে মহানগরীর তুঙ্গ সৌধচূড়া দর্পণিত হয় নাই। কেবল একবার, মাত্র দুই শত বৎসরের জন্য তুঙ্গভদ্রার সৌভাগ্যের দিন আসিয়াছিল। তাহার দক্ষিণ তীরে বিরূপাক্ষের পাষাণমূর্তি ঘিরিয়া এক প্রাকারবদ্ধ দুর্গ-নগর গড়িয়া

উঠিয়াছিল। নগরের নাম ছিল বিজয়নগর। কালক্রমে [illegible] বিজয়নগর সমস্ত দাক্ষিণাত্যের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া[illegible] বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র ছয় শতাব্দীর কথা। কিন্তু ইহারই মধ্যে বিজয়নগরের গৌরবময় স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে বিজয়নগরের বহুবিস্তৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে কী বিচিত্র ঐতিহ্য সমাহিত আছে তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল তুঙ্গভদ্রা ভোলে নাই।

কোনো এক স্তব্ধ সন্ধ্যায়, আকাশে সূর্য যখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু নক্ষত্র পরিস্ফুট হয় নাই, সেই সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে ত্রিকোণ ভূমির উপর দাঁড়াও। কান পাতিয়া শোনো, শুনিতে পাইবে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার কানে কানে কথা বলিতেছে; নিজের অতীত সৌভাগ্যের দিনের গল্প বলিতেছে। কত নাম—হরিহর বুক্ক কুমার কম্পন দেবরাজ মল্লিকার্জুন—তোমার কানে আসিবে। কত কুটিল রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম-বিদ্বেষ, কৌতুক কুতূহল জন্মমৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবে।

তুঙ্গভদ্রার এই ঊর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু সকল ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া থাকে। যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে ইতিহাস নাই। আমরা আজ তুঙ্গভদ্রার স্মৃতিপ্রবাহ হইতে এক গণ্ডূষ তুলিয়া লইয়া পান করিব।

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থল হইতে ক্রোশেক দূর ভাটির দিকে তিনটি বড় নৌকা পালের ভরে উজানে চলিয়াছে। তাহারা বিজয়নগর যাইতেছে, সঙ্গম পার হইয়া বামদিকে তুঙ্গভদ্রায় প্রবেশ করিবে। বিজয়নগর পৌঁছিতে তাহাদের এখনো কয়েকদিন বিলম্ব আছে, সঙ্গম হইতে বিজয়নগরের দূরত্ব প্রায় সত্তর ক্রোশ।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণ। ১৩৫২ শকাব্দ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

তিনটি নৌকা আগে পিছে চলিয়াছে। প্রথম নৌকাটি আয়তনে বিশাল, সমুদ্রগামী বহিত্র। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও রণতরীর আকারে গঠিত, সংকীর্ণ ও দ্রুতগামী; তাহাতে পঞ্চাশ জন যোদ্ধা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। তৃতীয় নৌকাটি ভারবাহী ভড়, তাহার গতি মন্থর। তাই তাহার সহিত তাল রাখিয়া অন্য বহিত্র দুটিও মন্থর গতিতে চলিয়াছে।

নৌকা তিনটি বহুদূর হইতে আসিতেছে। পূর্ব সমুদ্রতীরে কলিঙ্গদেশের প্রধান বন্দর কলিঙ্গপত্তন, সেখান হইতে তিন মাস পূর্বে তাহাদের যাত্রা সুরু হইয়াছিল। এতদিনে তাহাদের যাত্রা শেষ হইয়া আসিতেছে; আর সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহারা বিজয়নগরে পৌঁছিবে—যদি বায়ু অনুকূল থাকে।

যে-সময়ের কাহিনী সে-সময়ের সহস্রবর্ষ পূর্ব হইতেই ভারতের প্রাচ্য উপকূলে নৌবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। উত্তরে 'নৌ-সাধনোদ্যত' বঙ্গদেশ হইতে দক্ষিণে তৈলঙ্গ তামিল দেশ পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে সমুদ্রযাত্রী বৃহৎ বহিত্র প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে চড়িয়া ভারতের বণিকেরা ব্রহ্ম শ্যাম কাম্বোজ ও সাগরিকার দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য

করিয়া ফিরিতেছিল ; উপনিবেশ গড়িতেছিল, রাজ্যস্থাপন করিতে।

এই ভাবে বহু শতাব্দী চলিবার পর একদা কালান্তক ঝড়ের ম[illegible] দিক্‌প্রান্তে আরব জলদস্যু দেখা দিল, তাহার সংঘাতে ভারতে রতনভরা তরী লবণজলে ডুবিল। তবু ভারতের তটরেখা ধ[illegible] সমুদ্রপোতের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইল না, তটভূমি ঘেঁ[illegible] নৌ-যোদ্ধার দ্বারা সুরক্ষিত পোত এক বন্দর হইতে অন্য বন্দ[illegible] যাতায়াত করিতে লাগিল। নদী-পথেও নৌবাণিজ্যের গমনাগ[illegible] অব্যাহত রহিল।

নৌকা তিনটির মধ্যে সবাগ্রগামী নৌকাটির প্রধান যাত্রী কলি[illegible] দেশের রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা। রাজকন্যা বিজয়নগরে যাইতেছেন বিজয়নগরের তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে বিবাহ করিবার জন্য।

প্রথম নৌকাটি ময়ূরপঙ্খী। তাহার বহিরঙ্গ ময়ূরের ন্যায় গাঢ় নীল ও সবুজ রঙে চিত্রিত ; পালেও নীল-সবুজের বিচিত্র চিত্রণ। দ্বিতীয় নৌকাটি মকরমুখী ; তাহার দেহে বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, ধূসর বর্ণের নৌকা। তাহার ভিতরে আছে ত্রিশ-জন নৌযোদ্ধা : তাহারা এই নৌবহরের রক্ষী। এতদ্ব্যতীত নৌকায় আছে পাচক সূপকার নাপিত ও নানা শ্রেণীর ভৃত্য। সর্ব পশ্চাৎবর্তী ভড় বিবিধ তৈজস, আবশ্যক বস্তু ও খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ। এতগুলো লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া আহার করিবে, চাল দাল ঘৃত তৈল গম তিল গুড় শর্করা লবণ হরিদ্রা, কাশমর্দ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে চলিয়াছে।

ভড়ের পিছনে একটি শূন্য ডিঙি দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ল্যাজের মত ভড়ের অনুসরণ করিয়াছে। এক নৌকা হইতে অন্য নৌকায় যাতায়াত করিবার সময় ইহার প্রয়োজন।

এইভাবে রাজকীয় আড়ম্বরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজনন্দিনী বিদ্যুন্মালা বিবাহ করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই।

সেদিন অপরাহ্ণে তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া ক্লান্ত চক্ষে জলের পানে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রী ভগিনী মণিকঙ্কণা তাঁহা[illegible]

সঙ্গে ছিল। মণিকঙ্কণা শুধু তাঁহার ভগিনী নয়, সখীও। তাই বিদ্যুন্মালা যখন বিবাহে চলিলেন তখন মণিকঙ্কণাও স্বেচ্ছায় সঙ্গে চলিল। বিবাহের যিনি বর তিনি ইচ্ছা করিলে বধূর সহিত তাহার অনূঢ়া ভগিনীদেরও গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা না করিলে পাত্রকুলের অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতেন। এই প্রথা আবহমানকাল প্রচলিত ছিল।

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার বৈমাত্রী ভগিনী, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটু প্রভেদ ছিল। বিদ্যুন্মালার মাতা পট্টমহিষী রুক্মিণী দেবী ছিলেন আর্যা, কিন্তু মণিকঙ্কণার মাতা চম্পাদেবী অনার্যা। আর্যগণ প্রথম দক্ষিণ ভারতে আসিয়া একটি সুন্দর রীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন: আর্য পুরুষ বিবাহকালে আর্যা বধূর সঙ্গে সঙ্গে একটি অনার্যা বধূও গ্রহণ করিতেন। বংশবৃদ্ধিই প্রধান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথাটি লোভনীয় বলিয়াই বোধকরি টিকিয়া ছিল। আর্যা পত্নীর মর্যাদা অবশ্য অধিক ছিল, কিন্তু অনার্যা পত্নীও মাননীয়া ছিলেন।

বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার বয়স প্রায় সমান, দু'এক মাসের ছোট বড়। কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক তফাৎ। আঠারো বছর বয়সের বিদ্যুন্মালার আকৃতির বর্ণনা করিতে হইলে প্রাচীন উপমার শরণ লইতে হয়। তন্বী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, কিন্তু চকিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চলনয়না নয়। নিবিড় কালো চোখ দুটি শান্ত অপ্রগল্‌ভ; সর্বাঙ্গের উচ্ছলিত যৌবন যেন চোখ দুটিতে আসিয়া স্থির নিস্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতিতেও একটি মধুর ভাবমন্থর গভীরতা আছে যাহা সহজে বিচলিত হয় না। অন্তঃসলিলা প্রকৃতি, বাহির হইতে অন্তরের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়।

মণিকঙ্কণা ঠিক ইহার বিপরীত। সে তন্বী নয়, দীর্ঘাঙ্গী নয়, তাহার সুবলিত দৃঢ়-পিনদ্ধ দেহটি যেন যৌবনের উদ্বেল উচ্ছ্বাস ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চঞ্চল চক্ষু দুটি খঞ্জনপাখির মত সঞ্চরণশীল, অধর নব-কিশলয়ের ন্যায় রক্তিম। দেহের বর্ণ বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বল গৌর নয়, একটু চাপা; যেন সোনার কলসে কচি দূর্বাঘাসের ছায়া পড়িয়াছে।

কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। তাহার প্রকৃতিও বড় মিষ্ট, মোটেই অন্তর্মুখী নয়; বাহিরের পৃথিবী তাহার চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। মনে ভাবনা-চিন্তা বেশি নাই, কিন্তু সকল কর্মে পটীয়সী; বিচিত্র এবং নূতন নূতন কর্মে লিপ্ত হইবার জন্য সে সর্বদাই উন্মুখ। পৃথিবীটা তাহার রঙ্গকৌতুক খেলাধূলার লীলাঙ্গন।

কিন্তু তিন মাস নিরবচ্ছিন্ন নৌকারোহণ করিয়া দুই ভগিনীই ক্লান্ত। প্রথম প্রথম সমুদ্রের ভীমকান্ত দৃশ্য তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়াছিল, তারপর নদীর পথে দুই তীরের নিত্যপরিবর্তমান চলচ্ছবি কিছুদিন তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল। নদীর কিনারায় কখনো গ্রাম কখনো শস্যক্ষেত্র কখনো শিলাবন্ধুর তটপ্রপাত; কোথাও জলের মাঝখানে মকরাকৃতি বালুচর, বালুচরের উপর নানা জাতীয় জলচর পক্ষী—সবই অতি সুন্দর। কিন্তু ক্রমাগত একই দৃশ্যের পুনরাবর্তন দেখিতে দেখিতে আর ভাল লাগে না। নৌকার অল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ জীবনযাত্রা অসহ্য মনে হয়, স্থলচব জীবের স্থলাকাঙ্ক্ষা দুর্বার হইয়া ওঠে।

সেদিন দুই ভগিনী পালের ছায়ায় গুণবৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়াছিলেন। ছাদের উপর অন্য কেহ নাই; নৌকার পিছন দিকে হালী একাকী হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে ছাদ হইতে দেখা যায় না। বিদ্যুন্মালার ক্লান্ত চক্ষু জলের উপর নিবদ্ধ, মণিকঙ্কণার চক্ষু দুটি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত চারিদিকে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। মণিকঙ্কণার মনে অনেক অসন্তোষ জমা হইয়া উঠিয়াছে। এ নৌকাযাত্রার কি শেষ নাই? আর তো পারা যায় না! সহসা তাহার অধীরতা বাঙ্‌মূর্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল, সে বিদ্যুন্মালার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'একটা কথা বল্ দেখি মালা। চিরদিনই বিয়ের বর কনের বাড়িতে বিয়ে করতে যায়। কিন্তু তুই বরের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এ কেমন কথা?'

সত্যই তো, এ কেমন কথা! এই বিপরীত আচরণের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে কিছু ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে।

॥ দুই ॥

সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই, হরিহর ও বুক্ক বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনকথা অতি বিচিত্র। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘ্‌লক দুই ভ্রাতার অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাদের জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। সে-সময়ে গুণী ও কর্মকুশল হিন্দু পাইলেই মুসলমান রাজারা তাঁহাদের বলপূর্বক মুসলমান করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু হরিহর ও বুক্ক বেশি দিন মুসলমান রহিলেন না। তাঁহারা পলাইয়া আসিয়া শৃঙ্গেরি শঙ্করমঠের এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইলেন। সন্ন্যাসীর নাম বিদ্যারণ্য, তিনি তাঁহাদের হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করিলেন। তারপর দুই ভাই মিলিয়া গুরুর সাহায্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিজয়নগরের আদি নাম বিদ্যানগর, পরে উহা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিণত হয়।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যখন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল, ঠিক সেই সময় কৃষ্ণার উত্তর তীরে একজন শক্তিশালী মুসলমান দিল্লীর নাগপাশ ছিন্ন করিয়া এক স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের নাম বহমনী রাজ্য। উত্তরকালে বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহমনী রাজ্যের চেষ্টা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমান অধিকার প্রসারিত করিবে, বিজয়নগরের প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমানকে ঢুকিতে দিবে না।

রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুমান শত বর্ষ পরে বিজয়নগরের যিনি রাজা হইলেন তাঁহার নাম দেবরায়। ইতিহাসে ইনি প্রথম দেবরায় নামে পরিচিত। দেবরায় অসাধারণ রাজ্যশাসক ও রণপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তুরস্ক হইতে ধানুকী সৈন্য আনাইয়া নিজ সৈন্যদল দৃঢ় করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চাশবর্ষব্যাপী শাসনকালে সমস্ত দাক্ষিণাত্য বিজয়নগরের পদানত

হইয়াছিল, মুসলমান রাজশক্তি কৃষ্ণার দক্ষিণে পদার্পণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু দেবরায়ের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও বিজয়রায় ছিলেন কর্মশক্তিহীন অপদার্থ। ভাগ্যক্রমে বিজয়রায়ের পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় পিতামহের মতই ধীমান এবং রণদক্ষ। তাই প্রথম দেবরায় নিজের মৃত্যুকাল আসন্ন দেখিয়া দুই পুত্রের সহিত তরুণ পৌত্রকেও যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন এবং কতকটা নিশ্চিন্ত মনে দেহরক্ষা করিলেন।

তরুণ দেবরায় পিতা ও পিতৃব্যকে ডিঙাইয়া রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। অতঃপর আট বৎসর অতীত হইয়াছে। পিতৃব্য রামচন্দ্র বেশি দিন টিকিলেন না, কিন্তু পিতা বিজয়রায় অদ্যাপি জীবিত আছেন। রাজা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই, প্রৌঢ় বয়সে রাজপ্রাসাদে বসিয়া তিনি দুষ্ট শিশুর ন্যায় বিচিত্র খেলা খেলিতেছেন।

দেবরায়ের বয়স বর্তমানে পঁয়ত্রিশ বছর। তাঁহার দেহ যেমন দৃঢ় ও সুগঠিত, চরিত্রও তেমনি বজ্রকঠিন। গম্ভীর মিতবাক্ সংবৃতমন্ত্র পুরুষ। রাজ্যশাসন আরম্ভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ম্লেচ্ছ শত্রু তো আছেই, উপরন্তু হিন্দু রাজারাও নিরন্তর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একতা নাই, সমধর্মিতা নাই। অথচ ম্লেচ্ছ-শক্তির গতিরোধ করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেবরায় একটি একটি করিয়া রাজকন্যা বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা যদি ঐক্যসাধন না হয় কুটুম্বিতার দ্বারা হইতে পারে। সেকালে রাজন্যবর্গের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহ মোটেই বিরল ছিল না, বরং রাজনৈতিক কূটকৌশলরূপে প্রশংসার্হ কার্য বিবেচিত হইত।

সকল রাজা অবশ্য স্বেচ্ছায় কন্যাদান করিলেন না, কাহারও কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইল। সবচেয়ে কষ্ট দিলেন কলিঙ্গের রাজা গজপতি চতুর্থ ভানুদেব।

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রতীরে কলিঙ্গ দেশ, বিজয়নগর

তে বহু দূর। দেবরায়ের দূত বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হল। কলিঙ্গরাজ ভানুদেব ভাবিলেন, এই বিবাহের প্রস্তাব প্রকারান্তরে তাঁহাকে বিজয়নগরের বশ্যতা স্বীকার করার আমন্ত্রণ। তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবেশী অন্ধ্র রাজ্য সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন, কারণ অন্ধ্র দেশ বিজয়নগরের মিত্র।

সংবাদ পাইয়া দেবরায় সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ভানুদেব পরাজিত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিলেন। শান্তির শর্তস্বরূপ তাঁহাকে দেবরায়ের হস্তে নিজ কন্যাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব স্বীকার করিতে হইল। দেবরায় কিন্তু বিবাহ করিতে শ্বশুরগৃহে আসিতে পারিবেন না; কন্যাকে বিজয়নগর পাঠাইতে হইবে, সেখানে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

তৎকালে রাজাদের নিজ রাজ্য ছাড়িয়া বহু দূরে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। চারিদিকে শত্রু ওৎ পাতিয়া আছে, সিংহাসন শূন্য দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তাছাড়া ঘরের শত্রু তো আছেই।

ভানুদেব কন্যাকে বিজয়নগরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থলপথ অতি দুর্গম ও বিপজ্জনক; কন্যা জলপথে যাইবে। কলিঙ্গপত্তন বন্দরে তিনটি বহিত্র সজ্জিত হইল। খাদ্যসামগ্রী উপঢৌকন ও জলযোদ্ধার দল সঙ্গে থাকিবে। রাজদুহিতা বিদ্যুন্মালা সখী পরিজন লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তিনটি নৌকা সমুদ্রপথে দক্ষিণদিকে চলিল। তারপর কৃষ্ণা নদীর মোহনায় পৌঁছিয়া নদীতে প্রবেশ করিল। তদবধি নৌকা তিনটি উজানে চলিয়াছে।

যাত্রা শেষ হইতে বেশি বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে দুই রাজকন্যা অধীর ও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গে কন্যাকর্তারূপে আসিয়াছেন মাতুল চিপিটকমূর্তি, এবং রাজকন্যাদের ধাত্রী মন্দোদরী। রাজবৈদ্য রসরাজও সঙ্গে আছেন। ইহাদের কথা ক্রমশ বক্তব্য।

॥ তিন ॥

মণিকঙ্কণার কথা শুনিয়া কুমারী বিদ্যুন্মালা তাহার দিকে ফিরিলেন না, সম্মুখে চাহিয়া থাকিয়া অলসকণ্ঠে বলিলেন—'কঙ্কণা, তুই হাসালি। এ নাকি বিয়ে! এ তো রাজনৈতিক দাবাখেলার চাল।'

মণিকঙ্কণা পা গুটাইয়া বিদ্যুন্মালার দিকে ফিরিয়া বসিল। বলিল —'হোক দাবাখেলার চাল। বর বিয়ে করতে আসবে না কেন?'

সম্মুখে অর্ধ ক্রোশ দূরে দুই নদী মিলিত হইয়া যেখানে বিক্ষুব্ধ জলভ্রমি রচনা করিয়া ছুটিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া বিদ্যুন্মালার অধরপ্রান্তে একটু বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'তিন-তিনটি বৌ ছেড়ে আসা কি সহজ? তাই বোধহয় আসতে পারেনি।'

মণিকঙ্কণা হাসি-হাসি মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বিদ্যুন্মালার বাহুর উপর হাত রাখিয়া বলিল—'মহারাজ দেবরায়ের তিনটি রানী আছে, তুই হবি চতুর্থী। তাই বুঝি তোর ভাল লাগছে না?'

বিদ্যুন্মালা এবার মণিকঙ্কণার পানে চক্ষু ফিরাইলেন—'তোর বুঝি ভাল লাগছে?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'আমার ভালও লাগছে না, মন্দও লাগছে না। রাজাদের অনেকগুলো রানী তো থাকেই। এক রাজার এক রানী কখনো শুনিনি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি শুনেছি। রামচন্দ্রের একটিই সীতা ছিল।'

মণিকঙ্কণা হাসিল—'সে তো ত্রেতাযুগের কথা। কলিকালে মেয়ে সস্তা, তাই পুরুষেরা যে যত পাবে বিয়ে করে। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা।'

বিদ্যুন্মালার কণ্ঠস্বর একটু উদ্দীপ্ত হইল—'বিশ্রী ব্যবস্থা। স্ত্রী যদি স্বামীকে পুরোপুরি না পায়, তাহলে বিয়ের কোনো মানেই হয় না।'

মণিকঙ্কণা কিয়ৎকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'পুরোপুরি পাওয়া কাকে বলে ভাই? স্বামী তো আর স্ত্রীর সম্পত্তি নয় যে, কাউকে ভাগ দেবে না। বরং স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তি।'

বিদ্যুন্মালার বিম্বাধর স্ফুরিত হইল, চোখে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—'আমি মানি না।'

মণিকঙ্কণা কলস্বরে হাসিয়া উঠিল—'না মানলে কী হবে, বিয়ে করতে তো যাচ্ছিস!'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'যাচ্ছি! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নিরপরাধ মানুষ যেমন বধ্যভূমিতে যায়, আমিও তেমনি যাচ্ছি। যে-স্বামীর তিনটে বৌ আছে তাকে কোনোদিন ভালবাসতে পারব না।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার গলা জড়াইয়া ধরিল—'কেন তুই মনে কষ্ট পাচ্ছিস ভাই! ভেবে দ্যাখ, তোর মা আর আমার মা কি মহারাজাকে ভালবাসেন না? বিয়ে হোক, তুইও নিজের মহারাজটিকে ভালবাসবি। তখন আর সতীনের কথা মনে থাকবে না।'

বিদ্যুন্মালা কিছুক্ষণ বিরসমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—'মনে কর, মহারাজ দেবরায় আমার সঙ্গে সঙ্গে তোকেও গ্রহণ করলেন; তুই তাঁকে ভালবাসতে পারবি?'

মণিকঙ্কণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'পারব না! বলিস কি তুই! তাঁকে অন্য বৌরা যতখানি ভালবাসে আমি তার চেয়ে ঢের বেশি ভালবাসব। আমার বুকে ভালবাসা ভরা আছে। যিনিই আমার স্বামী হবেন তাঁকেই আমি প্রাণভরে ভালবাসব।'

বিদ্যুন্মালা মণিকঙ্কণাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আমি যদি তোর মতন হতে পারতুম! আমার মন বড় স্বার্থপর, যাকে চাই কাউকে তার ভাগ দিতে পারি না।'

মণিকঙ্কণা আবেগভরে বিদ্যুন্মালাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া লইয়া বলিল—'না না, কখনো না। তুই বড় বেশি ভাবিস; অত ভাবলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। যা হবার তাই যখন হবে তখন ভেবে কি লাভ?'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না; দুই ভগিনী ঘনীভূত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। সূর্যের বর্ণ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপ নিম্নগামী; দক্ষিণ তীরের গন্ধ লইয়া মন্দ মধুর বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীবক্ষে এই সময়টি পরম মনোরম।

ছাদের নীচে মড়্‌মড়্‌ মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনিয়া যুবতিদ্বয়ের চমক ভাঙিল। মণিকঙ্কণা চকিত হাসিয়া চুপিচুপি বলিল—'মন্দোদরীর ঘুম ভেঙেছে।'

অতঃপর ছাদের উপর এক বিপুলকায়া রমণীর আবির্ভাব ঘটিল। আলুথালু বেশ, হাতে একটি রূপার তাম্বূলকরঙ্ক; সে আসিয়া থপ্‌ করিয়া রাজকন্যাদের সম্মুখে বসিল, প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া তুড়ি দিল, বলিল, 'নমো দারুব্রহ্ম।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালাকে চোখের ইঙ্গিত করিল, মন্দোদরীকে ক্ষেপাইতে হইবে। সময় যখন কাটিতে চায় না তখন মন্দোদরীকে লইয়া দু'দণ্ড রঙ্গ-পরিহাস করিতে মন্দ লাগে না।

কলিঙ্গের উত্তরে ওড্রদেশ, মন্দোদরী সেই ওড্রদেশের মেয়ে। বয়স অনুমান চল্লিশ, গায়ের রঙ গব্য ঘৃতের মত; নিটোল নিভাজ কলেবরটি দেখিয়া মনে হয় একটি মেদপূর্ণ অলিঞ্জর। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সদাই হাস্য-বিম্বিত। আঠারো বছর পূর্বে সে বিদ্যুন্মালার ধাত্রীরূপে কলিঙ্গের রাজসংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, অদ্যাপি সগৌরবে সেখানে বিরাজ করিতেছে। বর্তমানে সে দুই রাজকন্যার অভিভাবিকা হইয়া বিজয়নগরে চলিয়াছে। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, রাজসংসারই তাহার সংসার।

মণিকঙ্কণা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—'দারুব্রহ্ম তোমার মঙ্গল করুন। আজ দিবানিদ্রাটি কেমন হল?'

মন্দোদরী পানের ডাবা খুলিতে খুলিতে বলিল—'দিবানিদ্রা আর হল কই। খোলের মধ্যে যা গরম, তালের পাখা নাড়তে নাড়তেই দিন কেটে গেল। শেষ বরাবর একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলুম।'

বিদ্যুন্মালা উদ্বেগভরা চক্ষে মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'এমন করে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক'দিন বাঁচবি মন্দা! দিনের বেলা

তোর চোখে ঘুম নেই, রাত্রে জলদস্যুর ভয়ে চোখে-পাতায় করতে পারিস না। শরীর যে দিন দিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছে।'

মন্দোদরী গদ্‌গদ হাস্য করিয়া বলিল—'যা যা, ঠাট্টা করতে হবে না। আমি তোদের মতন অকৃতজ্ঞ নই, খাই-দাই মোটা হই। তোরা খাস-দাস কিন্তু গায়ে গত্তি লাগে না।'

পানের বাটা খুলিয়া মন্দোদরী দেখিল তাহার মধ্যে ভিজা ন্যাকড়া জড়ানো দুই তিনটি পানের পাতা রহিয়াছে। ইহা বিচিত্র নয়, কারণ দীর্ঘপথ আসিতে পানের অভাব ঘটিয়াছে। দুই-একটি নদীতীরস্থ গ্রামে ডিঙি পাঠাইয়া কিছু কিছু পান সংগ্রহ করা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়। অথচ পানের ভোক্তা অনেক। মন্দোদরী প্রচুর পান খায়, মাতুল চিপিটকমূর্তিও তাম্বুল-রসিক। বস্তুত যে পানের বাটাটি মন্দোদরীর সম্মুখে দেখা যাইতেছে, তাহা মাতুল মহাশয়ের। মন্দোদরী নিজের বরাদ্দ পান শেষ করিয়া মামার বাটায় হাত দিয়াছে।

বাটায় পান ছাড়াও চূণ গুয়া কেয়াখয়ের মৌরী এলাচ দারুচিনি, নানাবিধ উপচার রহিয়াছে। মন্দোদরী পানগুলি লইয়া পরিপাটিভাবে পান সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

দুই ভগিনী দেখিলেন স্থূলতার প্রতি কটাক্ষপাতে মন্দোদরী ঘামিল না, তখন তাহারা অন্য পথ ধরিলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'আচ্ছা মন্দোদরি, তোকে তো আমরা জন্মে অবধি দেখছি, কিন্তু তোর রাবণকে তো কখনো দেখিনি। তোর রাবণের কি হল?'

মন্দোদরী বলিল—'আমার রাবণ কি আর আছে, অনেক দিন গেছে। আমি রাজসংসারে আসার আগেই তাকে যমে নিয়েছে।'

বিদ্যুন্মালা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'সত্যিই তোর স্বামীর নাম রাবণ ছিল নাকি?'

মন্দোদরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, তার নাম ছিল কুম্ভকর্ণ।'

মণিকঙ্কণা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—'ও—তাই! তোর কুম্ভকর্ণ যাবার সময় ঘুমটি তোকে দিয়ে গেছে।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তাহলে তোর এখন শুধু বিভীষণ বাকি!'

মন্দোদরী আর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আর বিভীষণ! তোদের সামলাতে সামলাতেই বয়স কেটে গেল, এখন আর বিভীষণ কোত্থেকে পাব।'

মণিকঙ্কণা সান্ত্বনার স্বরে বলিল—'পাবি পাবি। কতই বা তোর বয়স হয়েছে। এই দ্যাখ না, বিজয়নগরে যাচ্ছিস, সেখানকার বিভীষণেরা তোকে দেখলে হাঁ করে ছুটে আসবে।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'কে বলতে পারে, ম্লেচ্ছ দেশের আমীর-ওমরা হয়তো তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেগম করবে।'

মন্দোদরী বলিল—'ও মা গো, তারা যে গরু খায়।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তোকে পেলে তারা গরু খাওয়া ছেড়ে দেবে।'

মন্দোদরী জানিত ইহারা পরিহাস করিতেছে; কিন্তু তাহার অন্তরের এক কোণে একটি লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই ধরনের রসিকতায় তৃপ্তি পাইত। সে পান সাজিয়া মুখে দিল, চিবাইতে চিবাইতে বলিল—'তা যা বলিস। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে? নমো দারুব্রহ্ম।'

এই সময়ে নৌকার নিম্নতল হইতে তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। শব্দটি স্ত্রী-কণ্ঠোত্থিত মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত উহা মাতুল চিপিটকমূর্তির কণ্ঠস্বর। কোনো কারণে তিনি জাতক্রোধ হইয়াছেন।

পরক্ষণেই তিন চার লাফ দিয়া চিপিটকমূর্তি ছাদে উঠিয়া আসিলেন। মন্দোদরী কোলের কাছে পানের বাটা লইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইল, তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সূচীতীক্ষ্ণ কণ্ঠে তর্জন করিলেন—'এই মন্দোদরি! আমার ডাবা চুরি করেছিস!' তিনি ছোঁ মারিয়া ডাবাটি তুলিয়া লইলেন।

মন্দোদরী গালে হাত দিয়া বলিল—'ও মা! ওটা নাকি তোমার ডাবা! আমি চিনতে পারিনি।'

চিপিটকমূর্তি ডাবা খুলিয়া দেখিলেন একটিও পান নাই, তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—'রাক্কুসী! সব পান খেয়ে ফেলেছিস!

দাঁড়া, আজ তোকে যমালয়ে পাঠাব। ঠেলা মেরে জলে ফেলে দেব, হাঙরে কুমীরে তোকে চিবিয়ে খাবে।'

মন্দোদরী নির্বিকার রহিল; সে জানে তাহাকে ঠেলা দিয়া জলে ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য চিপিটকমূর্তির নাই। তাছাড়া এইরূপ অজাযুদ্ধ তাহাদের মধ্যে নিত্যই ঘটিয়া থাকে। চিপিটকমূর্তি মহাশয়ের কণ্ঠস্বর যেমন সূক্ষ্ম তাঁহার চেহারাটিও তেমনি নিরতিশয় ক্ষীণ। তাঁহাকে দেখিলে গঙ্গাফড়িং-এর কথা মনে পড়ে যায়; সারা গায়ে কেবল লম্বা এক জোড়া ঠ্যাং, আর যাহা আছে তাহা নামমাত্র। কিন্তু মাতুল মহাশয়ের পূর্ণ পরিচয় যথাসময়ে দেওয়া যাইবে।

দুই রাজকন্যা বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া মাতুল মহাশয়ের বাহ্বাস্ফোট পরম কৌতুকে উপভোগ করিতেছেন ও হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। সূর্য তুঙ্গভদ্রার স্রোতে রক্ত উদ্‌গিরণ করিয়া অস্ত যাইতেছে। নৌকা সঙ্গমের নিকটবর্তী হইতেছে, সম্মিলিত নদীর উত্তরোল তরঙ্গে অল্প অল্প দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নৌকাগুলি দক্ষিণ দিকেব তটভূমির পাশ ঘেঁষিয়া যাইতেছে, এইভাবে সঙ্গমের তরঙ্গভঙ্গ যথাসম্ভব এড়াইয়া তুঙ্গভদ্রার স্রোতে প্রবেশ করিবে। উত্তরের তটভূমি বেশ দূরে। মণিকঙ্কণার চঞ্চল চক্ষু জলের উপর ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক স্থানে আসিয়া স্থির হইল; কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সে বিদ্যুন্মালাকে বলিল—'মালা, ছাখ তো—ঐ জলের ওপর—কিছু দেখতে পাচ্ছিস!' বলিয়া উত্তরদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

॥ চার ॥

দুই ভগিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্যুন্মালা চোখের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া দেখিলেন, তারপর বলিয়া উঠিলেন—'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। একটা মানুষ ভেসে যাচ্ছে—ঐ যে হাত তুলল—হাতে কি একটা রয়েছে—'

মণিকঙ্কণাও দেখিতেছিল, বলিল—'কৃষ্ণা নদী দিয়ে ভেসে এসেছে, বোধহয় অনেক দূর থেকে সাঁতার কেটে আসছে—আর ভেসে থাকতে পারছে না—সঙ্গমের তোড়ের মুখে পড়লেই ডুবে যাবে।'

হঠাৎ মণিকঙ্কণা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। বিদ্যুন্মালা উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। মামাও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া ইতি-উতি ঘাড় ফিরাইতে লাগিলেন। অন্য নৌকা দু'টির বাহিরে লোকজন নাই। কেহ কিছু লক্ষ্যও করিল না।

তারপর শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে মণিকঙ্কণা আবার ছাদে উঠিয়া আসিল, সে শঙ্খ আনিবার জন্য নীচে গিয়াছিল। শাঁখ বাজাইয়া এক নৌকা হইতে অন্য নৌকার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই নৌ-বহরের সাধারণ রীতি; কেবল আশঙ্কাজনক কিছু ঘটিলে ডঙ্কা বাজিবে! মণিকঙ্কণা পুনঃ পুনঃ শাঁখ বাজাইয়া চলিল; বিদ্যুন্মালা উদ্বেগভরা চক্ষে ভাসমান মানুষটার দিকে চাহিতে লাগিলেন। মানুষটা স্রোতের প্রবল আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রাণপণে ভাসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

শঙ্খনাদ শুনিয়া দ্বিতীয় নৌকার খোলের ভিতর হইতে পিল্ পিল্ করিয়া লোক বাহির হইয়া পটপত্তনের উপর দাঁড়াইল। সকলের দৃষ্টি ময়ূরপঙ্খীর দিকে। বিদ্যুন্মালা বাহু-প্রসারিত করিয়া ভাসমান মানুষটাকে দেখাইলেন। সকলের চক্ষু সেইদিকে ফিরিল।

ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না; একটা মানুষ স্রোতে পড়িয়া অসহায়ভাবে নাকানি-চোবানি খাইতেছে, তলাইয়া যাইতে বেশি দেরি নাই। তখন দ্বিতীয় নৌকা হইতে একজন লোক জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, ক্ষিপ্র বাহু সঞ্চালনে সাঁতার কাটিয়া মজ্জমানের দিকে চলিল। তাহার দেখাদেখি আরো দুই-তিনজন জলে ঝাঁপ দিল।

ময়ূরপঙ্খীর ছাদে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা, মন্দোদরী ও মাতুল চিপিটকমূর্তি সাগ্রহ উত্তেজনাভরে দেখিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ রাজবৈদ্য রসরাজও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি চোখে ভাল দেখেন না, মণিকঙ্কণা তাঁহাকে পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিল।

প্রথম সাঁতারুর নাম বলরাম ; লোকটা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘবাহু। সে প্রবল বাহু তাড়নায় তীরের মত জল কাটিয়া অগ্রসর হইল ; নদীর মাঝখানে উত্তরোল জলপ্রবাহ তাহার গতি মন্থর করিতে পারিল না : যেখানে মজ্জমান ব্যক্তি স্রোতের মুখে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোনোক্রমে ভাসিয়া চলিয়াছিল তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। লোকটি চতুর, কি করিয়া মজ্জমানকে উদ্ধার করিতে হয় তাহা জানে। মজ্জমান লোকের হাতের কাছে যাইলে সে উন্মত্তের ন্যায় উদ্ধর্তাকে জড়াইয়া ধরিবে ; তাই বলরাম তাহার হাতের নাগালে না গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিল।

ময়ূরপঙ্খীর ছাদে যাঁহারা শতচক্ষু হইয়া চাহিয়া ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন, বলরাম ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাঁহার পাঁচ-ছয় হাত ব্যবধানে মজ্জমান লোকটি তাহার অনুসরণ করিতেছে ; যেন কোনো অদৃশ্যসূত্রে দুইজন আবদ্ধ রহিয়াছে। তারপর দেখা গেল, অদৃশ্য সূত্রটি বংশদণ্ড। দুইজনে বংশদণ্ডের দুই প্রান্ত ধরিয়াছে এবং বলরাম অন্য ব্যক্তিকে নৌকার দিকে টানিয়া আনিতেছে। অন্য সাঁতারুরাও আসিয়া পড়িল। তখন দেখা গেল, একটা নয়, দুইটা বংশদণ্ড। সকলে মিলিয়া বংশের এক প্রান্ত ধরিয়া লোকটিকে টানিয়া আনিতে লাগিল।

নৌকার উপর সকলে বিস্ময় অনুভব করিলেন। বংশদণ্ড দুটা কোথা হইতে আসিল ? তবে কি মজ্জমান ব্যক্তির হাতেই লাঠি ছিল ? কিন্তু লাঠি কেন !

ইতিমধ্যে দুইজন নাবিক বুদ্ধি করিয়া ডিঙিতে চড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু মজ্জমান ব্যক্তিকে ডিঙিতে তোলা সম্ভব হইল না ; উদ্ধর্তরা ডিঙির কানা ধরিল, ডিঙির নাবিকেরা দাঁড় টানিয়া সকলকে নৌকার দিকে লইয়া চলিল।

নৌকা তিনটি পাল নামাইয়াছিল এবং স্রোতের টানে অল্প অল্প পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মণিকঙ্কণা দেখিল ডিঙাটি মাঝের নৌকার দিকে যাইতেছে, সে হাত তুলিয়া আহ্বান করিল। তখন ডিঙা আসিয়া ময়ূরপঙ্খীর গায়ে ভিড়িল। বলরাম ও সাঁতারুরা

নৌকায় উঠিল, মজ্জমানকে নৌকায় টানিয়া তুলিয়া নৌকার গুড়ার উপর শোয়াইয়া দিল। লোকটিকে দেখিয়া মৃত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে দুই হাতে দুইটি বংশদণ্ড দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছে।

নৌকার ছাদ হইতে সকলে দেখিলেন জল হইতে সদ্যোদ্ধৃত ব্যক্তি বয়সে যুবা; তাহার দেহ দীর্ঘ এবং দৃঢ়, কিন্তু বর্তমানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দেহের গৌর বর্ণ দীর্ঘকাল জলমজ্জনের ফলে মৃতবৎ পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যুন্মালার হৃদয় ব্যথাভরা করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; আহা, হতভাগ্য যুবক কোন দৈব দুর্বিপাকে এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—হয়তো বাঁচিবে না—

মণিকঙ্কণা তাঁহার মনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সংহত কণ্ঠে বলিল—'বেঁচে আছে তো?'

মাতুল চিপিটকমূর্তি গ্রীবা লম্বিত করিয়া দেখিতেছিলেন, শিরঃ-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'মরে গিয়েছে, জল থেকে তোলবার আগেই মরে গিয়েছে।'

বলরাম সংজ্ঞাহীন যুবকের বুকে হাত রাখিয়া দেখিতেছিল, সে ফিরিয়া ছাদের দিকে চক্ষু তুলিল, সসম্ভ্রমে বলিল—'আজ্ঞা না, বেঁচে আছে; বুক ধুক্‌ধুক্ করছে। রসরাজ মহাশয় দয়া করে একবার নাড়ীটা দেখবেন কি?'

ক্ষীণদৃষ্টি রসরাজ এতক্ষণ সবই শুনিতেছিলেন এবং অস্পষ্টভাবে দেখিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই ভালভাবে ধারণা করিতে না পারিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'হঁ হাঁ, অবশ্য অবশ্য। আমি যাচ্ছি—এই যে—'

মণিকঙ্কণা তাঁহার হাত ধরিয়া পাটাতনের উপর নামাইয়া দিল, তিনি সন্তর্পণে গিয়া প্রথমে যুবকের গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, তারপর নাড়ী টিপিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। মণিকঙ্কণা তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন দেখছেন?'

রসরাজ সজাগ হইয়া বলিলেন—'নাড়ী আছে, কিন্তু বড় দুর্বল।

দাঁড়াও, আমি ওষুধ দিচ্ছি।' তিনি রইঘরের দিকে চলিলেন। মণিকঙ্কণা তাঁহার সঙ্গে চলিল।

ময়ূরপঙ্খী নৌকায় দুইটি রইঘর; একটিতে দুই রাজকন্যা থাকেন, অন্যটিতে মাতুল চিপিটকমূর্তি ও রসরাজ। নিজের রইঘরে গিয়া রসরাজ একটি পেটরা খুলিলেন। পেটরার মধ্যে নানাবিধ ঔষধ, খল-নুড়ি প্রভৃতি রহিয়াছে। রসরাজ একটি স্ফটিকের কুপ্পা তুলিয়া লইলেন; তাহাতে জলের ন্যায় বর্ণহীন তরল পদার্থ রহিয়াছে। এই তরল পদার্থ তীব্রশক্তির কোহল। রসরাজ একটি পানপাত্রে অল্প জল লইয়া তাহাতে পাঁচ বিন্দু কোহল ফেলিলেন, মণিকঙ্কণার হাতে পাত্র দিয়া বলিলেন—'এতেই কাজ হবে। খাইয়ে দাও গিয়ে।'

মণিকঙ্কণা দ্রুতপদে উপরে গিয়া পাত্রটি বলরামের হাতে দিল, বলিল—'ওষুধ খাইয়ে দাও।'

'এই যে রাজকুমারি!' বলরাম পাত্রটি লইয়া নিপুণভাবে সংজ্ঞাহীনের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল। মণিকঙ্কণা সপ্রশংস নেত্রে তাহার কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে বলিল—'তুমিই প্রথমে গিয়ে ওকে ভাসিয়ে রেখেছিলে—না? তোমার নাম কি?' মণিকঙ্কণা রাজকন্যা হইলেও সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতে পারে।

বলরাম হাত জোড় করিয়া বলিল—'দাসের নাম বলরাম কর্মকার। আমি বঙ্গদেশের লোক, তাই ভাল সাঁতার জানি।'

মণিকঙ্কণা কৌতূহলী চক্ষে বলরামকে দেখিল, হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া তাহার পরিচয় স্বীকার করিল, তারপর ছাদে উঠিয়া গিয়া বিদ্যুন্মালার পাশে বসিল। রসরাজ মহাশয়ও ইতিমধ্যে ছাদে ফিরিয়া গিয়াছেন। ছাদ পাটাতন হইতে বেশি উচ্চ নয়, মাত্র তিন হাত। ছাদে উঠিবার দুই ধাপ তক্তার সিঁড়ি আছে। রসরাজ মহাশয় সহজেই ছাদে উঠিতে পারেন, কেবল নামিবার সময় কষ্ট।

অতঃপর প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল, ঔষধের ক্রিয়া কতক্ষণে আরম্ভ হইবে। মাতুল ও রসরাজ নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন,

দুই রাজকন্যা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া মৃতকল্প যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন; মন্দোদরী থুম হইয়া বসিয়া রহিল।

অর্ধ দণ্ড কাটিতে না কাটিতে যুবক ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। বলরাম তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল, সহাস্য মুখে বলিল—'এখন কেমন মনে হচ্ছে?'

দর্শকদের সকলের মুখেই উৎফুল্ল হাসি ফুটিয়াছে। যুবক প্রশ্নের উত্তর দিল না, ধীর সঞ্চারে ঘাড় ফিরাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। বলরাম বলিল—'তুমি কে? তোমার দেশ কোথা? নাম কি? নদীতে ভেসে যাচ্ছিলে কেন?'

এবারও যুবক উত্তর দিল না, দুইহাতে লাঠিতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। রসরাজ ছাদ হইতে বলিলেন—'আহা, ওকে এখন প্রশ্ন কোরো না। নিজেদের নৌকায় নিয়ে যাও, আগে এক পেট গরম ভাত খাওয়াও। নাড়ী সুস্থ হবে, তখন যত ইচ্ছা প্রশ্ন করো।'

'যে আজ্ঞা।'

বলরাম ও নাবিকেরা ধরাধরি করিয়া যুবককে ডিঙিতে তুলিল। ডিঙি মকরমুখী নৌকার দিকে চলিয়া গেল।

পশ্চিম আকাশে দিনের চিতা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। নৌকা তিনটি পাল তুলিয়া আবার সম্মুখদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী, আকাশে চাঁদ আছে। নৌকা তিনটি সঙ্গম পার হইয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রবেশ করিবে, তারপর তীর ঘেঁষিয়া কিংবা নদীমধ্যস্থ চরে নোঙ্গর ফেলিবে। নদীতে রাত্রিকালে নৌকা চালনা নিরাপদ নয়।

রসরাজ মহাশয় উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—'কোহলের মত তেজস্কর ওষুধ আর আছে! পরিস্রুত সুরাসার—সাক্ষাৎ অমৃত। এক ফোঁটা মুখে পড়লে তিন দিনের বাসি মড়া শয্যায় উঠে বসে।'

মন্দোদরী একটি গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—'জয় দারুব্রহ্ম।'

মণিকঙ্কণা হাসিয়া উঠিল—'এতক্ষণে মন্দোদরীর দারুব্রহ্মকে মনে পড়েছে।—চল মালা, নীচে যাই। আজ আর চুল বাঁধা হল না।'

॥ পাঁচ ॥

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ মাথার উপর উঠিয়াছে। নৌকা তিনটি সঙ্গম ছাড়াইয়া তুঙ্গভদ্রার খাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং একটি চরের পাশে পরস্পর হইতে শতহস্ত ব্যবধানে নোঙর ফেলিয়াছে। চারিদিক নিথর নিস্পন্দ, বহতা নদীর স্রোতেও চাঞ্চল্য নাই; চরাচর যেন জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম মল্লবস্ত্র সর্বাঙ্গে জড়াইয়া তন্দ্রাঘোরে অবাস্তবের স্বপ্ন দেখিতেছে।

ময়ূরপঙ্খী নৌকার একটি কক্ষ স্নিগ্ধ দীপের প্রভায় উন্মেষিত। সন্ধ্যাকালে ঘরে অগুরু-চন্দনের ধূপ জ্বালা হইয়াছিল, তাহার গন্ধ এখনো মিলাইয়া যায় নাই। একটি সুপরিসর শয্যার উপর দুই রাজকন্যা পাশাপাশি শয়ন করিয়াছেন। মন্দোদরী দ্বারের সম্মুখে আড় হইয়া জলহস্তীর ন্যায় ঘুমাইতেছে।

রাজকুমারীদের চেতনা বারংবার তন্দ্রা ও জাগরণের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। বৈচিত্র্যহীন জলযাত্রার মাঝখানে আজ হঠাৎ একটি অতর্কিত ঘটনা ঘটিয়াছে; তাই তাঁহাদের উৎসুক মন নিদ্রার সীমান্তে পৌঁছিয়া আবার জাগ্রতে ফিরিয়া আসিতেছে। অপরাহ্ণের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে।

দুই ভগিনী মুখোমুখি শুইয়াছিলেন। মণিকঙ্কণা এক সময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল বিদ্যুন্মালার চক্ষু মুদিত, সেও চক্ষু মুদিত করিল। ক্ষণেক পরে বিদ্যুন্মালা চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন কঙ্কণার চক্ষু মুদিত, তিনি আবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তারপর দুইজনে একসঙ্গে চক্ষু খুলিলেন।

দুইজনের মুখে হাসি উপচিয়া পড়িল। মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার

মুখের আরো কাছে মুখ আনিয়া শুইল। বিদ্যুম্মালা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—'ভাগ্যে তুই দেখতে পেয়েছিলি, নইলে লোকটাকে উদ্ধার করা যেত না।'

মণিকঙ্কণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'মানুষটি উচ্চবর্ণের মনে হল। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়।'

বিদ্যুম্মালা বলিলেন—'কিন্তু গলায় পৈতে ছিল না।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'পৈতে হয়তো নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু হাতে লাঠি কেন ভাই? লাঠি নিয়ে কেউ কি জলে নামে?'

বিদ্যুম্মালা ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'হয়তো ইচ্ছে করেই লাঠি নিয়ে জলে নেমেছিল, যাতে ভেসে থাকতে পারে। বাঁশের লাঠি তো, ভাসিয়ে রাখে।'

'তাই হবে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ জল্পনা-কল্পনার পর তাঁহাদের চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল, তাঁহারা ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ময়ূরপঙ্খীর যে কক্ষটিতে রসরাজ ও চিপিটকমূর্তি থাকেন তাহা নিষ্প্রদীপ। দুইজনে পৃথক শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। রসরাজ মহাশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। চিপিটক অন্ধকারে জাগিয়া আছেন; তাঁহার মস্তিষ্কবিবরে নানা কুটিল চিন্তা উইপোকার ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—যে লোকটিকে নদী হইতে তোলা হইয়াছে সে হিন্দু না মুসলমান? মুসলমান হইলে শত্রুর গুপ্তচর হইতে পারে; হিন্দু হইলেও হইতে পারে—আজকাল কে শত্রু কে মিত্র বোঝা কঠিন। ছুতা করিয়া নৌকায় উঠিয়াছে, কী অভিসন্ধি লইয়া নৌকায় উঠিয়াছে কে বলিতে পারে—

চিপিটকমূর্তির গঙ্গাফড়িং-এর ন্যায় আকৃতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, এবার তাঁহার প্রকৃতিগত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। মাতুল মহোদয়ের যথার্থ নাম চিপিটক নয়, অবস্থাগতিকে চিপিটক হইয়া পড়িয়াছিল। বিংশ বৎসর পূর্বে কলিঙ্গের চতুর্থ ভানুদেব দক্ষিণ দেশের এক সামন্তরাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া যখন স্বদেশে ফিরিলেন,

খন তাঁহার অসংখ্য শ্যালকদিগের মধ্যে একটি শ্যালক সঙ্গে আসিল। কছুকাল কাটিবার পর ভানুদেব দেখিলেন শ্যালকের স্বগৃহে ফিরিবার ইচ্ছা নাই; তিনি তাহাকে রাজপরিবারের ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজ-ভাণ্ডারে বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে রাশি রাশি চিপিটক স্তূপীকৃত থাকে, দধি ও গুড় সহযোগে ইহাই ভৃত্য-পরিজনের জলপান। শ্যালক মহাশয়ের আদি নাম বোধকরি হরিআপ্পা কৃষ্ণমূর্তি গোছের একটা কিছু ছিল, কিন্তু তিনি যখন ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে চিপিটক বিতরণ করিতে লাগিলেন তখন ভৃত্য-পরিজনের মধ্যে তাঁহার নাম অচিরাৎ চিপিটকমূর্তিতে পরিণত হইল। ক্রমে নামটি সাধারণের মধ্যেও প্রচারিত হইল। শুধু চিপিটক বিতরণের জন্যই নয়, শ্যালক মহাশয়ের নাকটিও ছিল চিপিটকের ন্যায় চ্যাপ্টা।

মনুষ্যচরিত্র লইয়া প্রকৃতির এক বিচিত্র পরিহাস দেখা যায়, যাহার বুদ্ধি যত কম সে নিজেকে তত বেশী বুদ্ধিমান মনে করে। চিপিটকমূর্তি মহাশয় পিতৃরাজ্যে অবস্থানকালে নিজের ভ্রাতাদের কাছে নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রখ্যাত ছিলেন, তাই সুযোগ পাইবামাত্র তিনি অভিমানভরে ভগিনীপতির রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর রাজ-ভাণ্ডারের অধিকর্তার পদ পাইয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে ভানুদেব তাঁহার বুদ্ধির মর্যাদা বুঝিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার নিভৃত অন্তরে যে চরম আশাটি লুক্কায়িত ছিল তাহা অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির মধ্যে—সম্ভবত দ্রাবিড় জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে—একটি বিশেষ সামাজিক নীতি প্রচলিত হইয়াছিল; তাহা এই যে, মাতুলের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ পরম স্পৃহণীয় ও বাঞ্ছিত বিবাহ। উত্তরাপথে যাঁহারা এই জাতীয় বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যে গিয়া দেশাচার ও লোকাচার বরণ করিয়া লইতেন। দীর্ঘকালের ব্যবহারে ইহা সহজ ও স্বাভাবিক বিধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তাই চিপিটকমূর্তি যখন ভগিনীপতির ভবনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন তখন তাঁহার মনে দূর ভবিষ্যতের একটি আশা বীজরূপে বিরাজ করিতেছিল। যথাকালে

তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীর আবির্ভাব ঘটিল, চিপিটকের আশা অ হইল। তারপর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, মাতুলের সহিত রাজকন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করিল না। চিপিটকের আশার অঙ্কুর জলসিঞ্চনের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল; শ্যালকরূপে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া রাজ-জামাতা পদে উন্নীত হইবার উচ্চাশা তাঁহার ফলবতী হইল না। চিপিটকমূর্তি একবার ভগিনীর কাছে কথাটা উত্থাপন করিয়াছিলেন, শুনিয়া রাজমহিষী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—'এ কথা অন্য কারুর কাছে বলো না।'

প্রকৃত কথা, কলিঙ্গের সমাজবিধি ঠিক আর্যাবর্তের মতও নয়, দাক্ষিণাত্যের মতও নয়, মধ্যপথগামী। ভারতের মধ্যপ্রদেশীয় রাজ্য-গুলির অবস্থা প্রায় একই প্রকার; তাহারা সুবিধামত এক‌ূল-ওকূল দুকূল রাখিয়া চলে। কলিঙ্গের লোকেরা মামা-ভাগিনেয়ীর বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না। আবার অতি উচ্চাঙ্গের সৎকার্য বলিয়াও মনে করে না। স্ত্রীলোকের কাছা দিয়া কাপড় পরার মত ইহা তাহাদের কাছে কৌতুকজনক ব্যাপার, তার বেশি নয়।

চিপিটক কিন্তু আশা ছাড়িলেন না, ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। ভাগিনেয়ী বিদ্যুন্মালা বড় হইয়া উঠিল। তারপর যুদ্ধ-বিগ্রহ নানা বিপর্যয়ের মধ্যে বিদ্যুন্মালার বিবাহ স্থির হইল বিজয়নগরের দেবরায়ের সঙ্গে। এবং এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে, চিপিটকমূর্তি বধূর মাতুল বিধায় অভিভাবকরূপে তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইলেন।

আশা আর বিশেষ ছিল না। কিন্তু চিপিটক হাল ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি নৌকায় চড়িয়া চলিলেন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

সে-রাত্রে নৌকার অন্ধকার বইঘরে শয়ন করিয়া চিপিটক চিন্তা করিতেছিলেন—নদী হইতে উদ্ধৃত লোকটা নিশ্চয় মুসলমান এবং শত্রুর গুপ্তচর। কাল সকালে তাহাকে নৌকায় ডাকিয়া কূট প্রশ্ন করিলেই গুপ্তচরের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িবে। গুপ্তচর যত ধূর্তই হোক চিপিটকের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না।

॥ ছয় ॥

ওদিকে মকরমুখী নৌকায় সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কেবল দুইজন রাত-প্রহরী নৌকার সম্মুখে ও পিছনে জাগিয়া বসিয়া ছিল। আর জাগিয়া ছিল বলরাম কর্মকার ও জলোদ্ধৃত যুবক। চাঁদের আলোয় পাটাতনের উপর বসিয়া দুইজনে নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল। যুবক এক পেট গরম ভাত খাইয়া ও দুই দণ্ড ঘুমাইয়া লইয়া অনেকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাদের বাক্যালাপ অধিকাংশই প্রশ্নোত্তর; বলরাম প্রশ্ন করিতেছে, যুবক উত্তর দিতেছে। বলরাম যে যুবককে প্রশ্ন করিতেছে তাহা কেবল কৌতূহল প্রণোদিত নয়, অনাহূত অতিথির প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করাই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বুদ্ধিহীন চিপিটকমূর্তি ও বুদ্ধিমান বলরামের মনোভাব একই প্রকার।

বলরাম বলিল—'তুমি যে মুসলমান নও তা আমি বুঝেছি। তোমার নাম কি?'

যুবক বলরামের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া চরের দিকে চক্ষু ফিরাইল, অস্পষ্ট স্বরে বলিল—'আমার নাম অর্জুনবর্মা।'

বলরাম মৃদুস্বরে হাসিল—'ভাল। আমি ভেবেছিলাম তোমার নাম বুঝি দণ্ডপাণি।'

অর্জুনবর্মার পাশে দণ্ড দুটি রাখা ছিল, সে একবার সেই দিকে চক্ষু নামাইয়া বলিল—'তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কিন্তু এই দণ্ড দুটি না থাকলে এতদূর আসতে পারতাম না, তার আগেই ডুবে যেতাম।'

বলরাম বলিল—'তুমি কোথা থেকে আসছ?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'গুলবর্গা থেকে।'

বলরাম বলিল—'গুলবর্গা—নাম শুনেছি। দক্ষিণে যবনদের রাজধানী। ওরা বড় অত্যাচারী, বর্বর জাত। আমিও ওদের জন্যে দেশ ছেড়েছি। বাংলা দেশ যবনে ছেয়ে গেছে। তুমিও কি ওদের অত্যাচারে দেশ ছেড়েছ?'

'হ্যাঁ।' অর্জুনবর্মা থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—'গুলবর্গার কাছে ভীমা নদী—ওদের অত্যাচারে আজ সকালবেলা ভীমা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম—ভীমা এসে কৃষ্ণাতে মিশেছে—তার অনেক পরে কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রায় মিশেছে—এত দূর তা ভাবিনি—লাঠি দুটো ছিল তাই কোনোমতে ভেসে ছিলাম—তারপর তুমি বাঁচালে—'

বলরাম প্রশ্ন করিল—'কোথায় যাচ্ছিলে?'

'বিজয়নগর। ভেবেছিলাম সাঁতার কেটে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে উঠব, তারপর পায়ে হেঁটে বিজয়নগরে যাব।'

'তা ভালই হল। আমরাও বিজয়নগরে যাচ্ছি। তোমার পায়ে হাঁটার পরিশ্রম বেঁচে গেল।'

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল, তারপর অর্জুনবর্মা প্রশ্ন করিল—'তোমরা কোথা থেকে আসছ?'

'কলিঙ্গ থেকে। তিন মাসের পথ।'

'সামনের বড় নৌকায় কারা যাচ্ছে?'

বলরাম একটু চিন্তা করিল। কিন্তু এখন তাহারা তুঙ্গভদ্রার স্রোতে প্রবেশ করিয়াছে, নদীর দুই কূলেই বিজয়নগরের অধিকার, যবন রাজ্য অনেক দূরে কৃষ্ণার পরপারে, সুতরাং অধিক সাবধানতা নিষ্প্রয়োজন। সে বলিল—'কলিঙ্গের দুই রাজকন্যা যাচ্ছেন। বড় রাজকন্যার সঙ্গে বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের বিয়ে হবে।'

অর্জুনবর্মা আর কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলরাম পাটাতনের উপর লম্বমান হইয়া বলিল—'রাত হয়েছে, শুয়ে পড়। এখনো তোমার শরীরের গ্লানি দূর হয়নি।'

অর্জুন লাঠি দুটি পাশে লইয়া শয়ন করিল, বলিল—'তোমার নিজের কথা তো বললে না। তুমি কলিঙ্গ দেশের মানুষ, বাংলা দেশের কথা কী বলছিলে?'

বলরাম বলিল—'আমি কলিঙ্গ থেকে আসছি বটে, কিন্তু বাংলা-দেশের লোক। আমার নাম বলরাম, জাতিতে কর্মকার।'

অর্জুন বলিল—'বাংলা দেশ তো অনেক দূর! তুমি তার নজরে এতদূর এসেছ!'

বলরাম আক্ষেপভরে বলিল—'আর ভাই, বাংলা দেশ কি আর বাংলা দেশ আছে, শ্মশান হয়ে গেছে; সেই শ্মশানে বিকট প্রেত-পিশাচ নেচে বেড়াচ্ছে। তাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।'

'বাংলা দেশে বুঝি যবন রাজা?'

'হ্যাঁ। মাঝে কয়েক বছর রাজা গণেশ সিংহাসনে বসেছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুর বরাত ফিরেছিল। তারপর আবার যে-নরক সেই নরক।'

'ওরা বড় অত্যাচারী, বড় নৃশংস'—অর্জুনের কথাগুলি অসমাপ্ত রহিয়া গেল, যেন মনের মধ্যে অসংখ্য অত্যাচার ও নৃশংসতার কাহিনী অকথিত রহিয়া গেল।

বলরাম হঠাৎ বলিল—'ভাল কথা, তোমার বিয়ে হয়েছে?'

'না।' আকাশে অবরোহী চন্দ্রের পানে চাহিয়া অর্জুন ম্রিয়মাণ স্বরে বলিল—'যবনের রাজধানীতে বিয়ে করলে তার প্রাণসংশয়, বিশেষত যদি বৌ সুন্দরী হয়। যাদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে জন্মেছে তারা মেয়ের বয়স সাত-আট বছর হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। অনেকে মেয়ের মুখে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে মেয়েকে কুৎসিত করে দেয়, যাতে যবনদের নজর না পড়ে। তাতেও রক্ষে নেই, মুসলমান সিপাহীরা যুবতী মেয়ে দেখলেই ধরে নিয়ে যায়, আর স্বামীকে কেটে রেখে যায়; যাতে নালিশ করবার কেউ না থাকে। দক্ষিণ দেশে মেয়েদের পর্দা ছিল না; এখন তারা যবনের ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।'

বলরাম উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল—'যেখানে যবন সেখানেই এই দশা। তবে আমার জীবনের কাহিনী বলি শোনো। বর্ধমানের নাম তুমি বোধ হয় শোননি; দামোদর নদের তীরে মস্ত নগর। সেখানে আমার কামারশালা ছিল; বেশ বড় কামারশালা। কাস্তে কুড়ুল কাটারি তৈরি করতাম, ঘোড়ার খুরে নাল ঠুকতাম,

'হ্যাঁ।' ∙ চাকায় হাল বসাতাম। তলোয়ার, সড়কি, এমনকি বন্দুক পর্যন্ত তৈরি করতে জানি, কিন্তু মুসলমান রাজারা তৈরি করতে দিত না; মাঝে মাঝে রাজার লোক এসে তদারক করে যেত। আমরা অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতাম। কিন্তু সে যাক—'

'একবার লোহা কিনতে জংলিদের গাঁয়ে গিয়েছিলাম। ওরা পাহাড় জঙ্গল থেকে লোহা-নুড়ি সংগ্রহ করে এনে পুড়িয়ে লোহা তৈরি করে; আমরা কামারেরা গরুর গাড়ি নিয়ে যেতাম, তাঁদের কাছ থেকে লোহা কিনে আনতাম। সেবার গাঁ থেকে লোহা কিনে দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখি, মুসলমান সেপাইরা আমার কামারশালা তছনছ করে দিয়েছে, আর আমার বৌটাকে ধরে নিয়ে গেছে—' বলরাম আবার শয়ন করিল, কিছুক্ষণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—'বৌটা মুখরা ছিল বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে ছিল। যাক গে, মরুক গে : যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে। আমার আর দেশে মন টিকল না। ভাবলাম যে-দেশে মুসলমান নেই সেই দেশে যাব। তারপর একদিন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একটা জঙ্গী জোয়ানের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে কলিঙ্গ দেশে চলে এলাম।'

'কলিঙ্গ দেশে এখনও যবন ঢুকতে পারেনি। কিন্তু ঢুকতে কতক্ষণ? আমি একেবারে কলিঙ্গের দক্ষিণ কোণে কলিঙ্গপত্তনে এসে আবার নতুন করে কামারশালা ফেঁদে বসলাম। কলিঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছে, কামারদের খুব পসার। আমি অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে লেগে গেলাম। রাজা থেকে পদাতি পর্যন্ত সবাই আমার নাম জেনে গেল। তারপর যুদ্ধ থামল, বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে কলিঙ্গের রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হল। নৌবহর সাজিয়ে রাজকন্যে বিয়ে করতে যাবেন। আমি ভাবলাম, দূর ছাই, দেশ ছেড়ে এতদূর যখন এসেছি তখন বিজয়নগরেই বা যাব না কেন? বিজয়নগরের রাজবংশ বীরের বংশ, একশো বছর ধরে যবনদের কৃষ্ণা নদী ডিঙোতে দেয়নি।

ন রাজা শুধু বীর নয়, গুণের আদর জানেন ; যদি তাঁর নজরে পড়ে যাই আমার বরাত ফিরে যাবে। গেলাম নৌ-নায়ক মশায়ের কাছে। নৌবহরে দূরযাত্রার সময় যেমন সঙ্গে ছুতোর দরকার, তেমনি কামারও দরকার। নৌ-নায়ক মশায় আমার নাম জানতেন, খুশী হয়ে নৌকোয় কাজ দিলেন। আর কি, যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই থেকে চলেছি।'

বলরামের কথা বলিবার ভঙ্গী হইতে মনে হয়, সে জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, কিন্তু দুঃখ বস্তুটাকে সে বেশী আমল দেয় না। দুঃখ তো আছেই, দুঃখ তো জীবনের সঙ্গী ; তাহার ফাঁকে ফাকে যতটুকু সুখ আহরণ করা যায় ততটুকুই লাভ।

বলরাম ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অর্জুনবর্মার চক্ষু মুদ্রিত, সে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ক্লান্তি-শিথিল মুখের পানে চাহিয়া বলরাম হৃদয়ের মধ্যে একটু স্নেহের ভাব অনুভব করিল। আহা, ছেলেটার কতই বা বয়স হইবে, বড় জোর একুশ-বাইশ, বলরামের চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট। এই বয়সে অভাগা অনেক দুঃখ পাইয়াছে ; অনেক দুঃখ না পাইলে কেহ দেশ ছাড়িয়া পালাইবার জন্য নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে না।

॥ সাত ॥

পরদিন প্রত্যূষে নৌকা তিনটি নোঙ্গর তুলিয়া আবার উজানে যাত্রা করিল।

তুঙ্গভদ্রায় বড় নৌকা চালানো কিন্তু কৌশলসাধ্য কর্ম, তজ্জন্য আড়কাঠির সাহায্য লইতে হয়। নদীগর্ভ পূর্বের ন্যায় গভীর নয়, নদীর তলদেশ শিলাপ্রস্তরে পূর্ণ, কোথাও পাথুরে দ্বীপ জল হইতে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে ; অতি সাবধানে লগি দিয়া জল মাপিতে মাপিতে অগ্রসর হইতে হয়। নদীর প্রসারও অধিক নয়, কোথাও পাঁচদশ রজ্জু, কোথাও আরো কম ; দুই তীরের উচ্চ পাষাণ-প্রাকার

নদীকে সঙ্কীর্ণ খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নৌকা নদীর মাঝখান দিয়া চলিলেও দুই তীর নিকটবর্তী।

সঙ্গে দেশজ্ঞ আড়কাঠি আছে, তাহার নির্দেশে হাঙ্গরমুখী নৌকাটি সর্বাগ্রে চলিল। তার পিছনে ময়ূরপঙ্খী, সর্বশেষে ভড়। হাঙ্গরমুখী নৌকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও লঘু, তাই আড়কাঠি তাহাতে থাকিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। কখনো দক্ষিণ তীর ঘেঁষিয়া, কখনো উত্তর তীর চুম্বন করিয়া; কখনো দাঁড় টানিয়া, কখনো পাল তুলিয়া নৌকা তিনটি ভুজঙ্গপ্রয়াত গতিতে স্রোতের বিপরীত মুখে অগ্রসর হইল।

মধ্যাহ্নে আহারাদি সম্পন্ন হইলে চিপিটকমূর্তি আজ্ঞা দিলেন—'যে লোকটাকে কাল নদী থেকে তোলা হয়েছে, আমার সন্দেহ সে শত্রুর গুপ্তচর; তাকে এই নৌকায় নিয়ে এস। সঙ্গে যেন দুজন সশস্ত্র রক্ষী থাকে।'

চিপিটকমূর্তি যদিও সাক্ষিগোপাল, তবু তিনি নামত এই অভিযানের নায়ক, তাই তাঁহার ছোটখাটো আদেশ সকলে মানিয়া চলিত।

মকরমুখী নৌকায় আদেশ পৌঁছিলে অর্জুনবর্মা লাঠি দুটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলরাম হাসিয়া বলিল—'লাঠি রেখে যাও। চিপিটক মামার কাছে লাঠি নিয়ে গেলে মামার নাভিশ্বাস উঠবে।'

অর্জুনবর্মা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলরামকে বলিল—'তুমি লাঠি দুটি রাখ, আমি ফিরে এসে নেব।'

অর্জুন দুইজন সশস্ত্র প্রহরীসহ ডিঙিতে চড়িয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চলিয়া গেল। বলরাম কৌতূহলের বশে লাঠি দুটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। সে লাঠির দেশের লোক, যে-দেশে বাঁশের লাঠিই সাধারণ লোকের প্রধান অস্ত্র সেই দেশের মানুষ। সে দেখিল, বাঁশের লাঠি দুটি বাংলা দেশের লাঠির মতই, বিশেষ পার্থক্য নাই; ছয় হাত লম্বা গাঁটগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, দুই প্রান্তে পিতলের তারের শক্ত বন্ধন; যেমন দৃঢ় তেমনি লঘু। এরূপ একটি লাঠি হাতে থাকিলে পঞ্চাশজন শত্রুর মহড়া লওয়া যায়। কিন্তু দুটি লাঠি কেন?

বলরাম লাঠি দুটি হাতে তৌল করিয়া দেখিল; তাহাদের গর্ভে সোনা-রূপা লুকানো থাকিলে এত লঘু হইত না, জলে পড়িলে ডুবিয়া যাইত। তবে অর্জুনবর্মা লাঠি দুটি হাতছাড়া করিতে চায় না কেন? ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল, সে আবার লাঠি দুটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করিল। ও—এই ব্যাপার! তাহার ধারণা ছিল বাংলা দেশের বাহিরে এ কৌশল আর কেহ জানে না, তা নয়। বলরামের মুখে হাসি ফুটিল; সে বুঝিল অর্জুনবর্মা বয়সে তরুণ হইলেও দূরদর্শী লোক।

ওদিকে অর্জুনবর্মা ময়ূরপঙ্খী নৌকায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে পাটাতনের উপর বা রইঘরের ছাদে প্রখর রৌদ্র; চিপিটক তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কক্ষটি দিবা দ্বিপ্রহরেও ছায়াচ্ছন্ন। দারুনির্মিত দেওয়ালগুলিতে জানালা নাই, জানালার পরিবর্তে তঙ্কার ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি অনেকগুলি ছিদ্র প্রাচীরগাত্রে জাল রচনা করিয়াছে; এইগুলি আলো এবং বাতাসের প্রবেশপথ। চিপিটক একটি মাদুরের উপর বালিশ হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। এক কোণে বৃদ্ধ রসরাজ একখানি পুঁথি, বোধ হয় সুশ্রুত-সংহিতা, চোখের নিকট ধরিয়া পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্জুনবর্মা ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার দুই করতল যুক্ত করিয়া সম্ভাষণ জানাইল, তারপর দ্বারের সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল।

বলা বাহুল্য, অর্জুনবর্মাকে যখন নৌকায় ডাকা হইয়াছিল তখন রাজকন্যারা জানিতে পারিয়াছিলেন; স্বভাবতই তাঁহাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছিল। অর্জুনবর্মা মামার কক্ষে প্রবেশ করিলে মণিকঙ্কণা চুপিচুপি বলিল—'মালা, চল্, ও-ঘরে কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনি।'

বিদ্যুন্মালা ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—'ও ঘরে আমাদের যাওয়া কি উচিত হবে?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'ও ঘরে যাব কেন? দেওয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মারব। আয়।'

দুই ভগিনী নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পাশের দিকে চলিলেন, সন্তর্পণে সচ্ছিদ্র গৃহ-প্রাচীরের কাছে গিয়া ছিদ্রপথে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। কক্ষের অভ্যন্তরে তখন পরম উপভোগ্য প্রহসন আরম্ভ হইয়াছে।

চিপিটক বালিশ ছাড়িয়া চিড়িক মারিয়া উঠিয়া বসিলেন, অর্জুনবর্মার দিকে অভিযোগী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রমণীসুলভ কণ্ঠে তর্জন করিলেন—'তুমি ম্লেচ্ছ! তুমি মুসলমান!'

অর্জুনবর্মার মেরুদণ্ড কঠিন ও ঋজু হইয়া উঠিল, চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; সে মেঘমন্দ্র স্বরে বলিল—'না, আমি হিন্দু, ক্ষত্রিয়।'

চিপিটক তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'বটে! বটে! তুমি কেমন ক্ষত্রিয় এখনি বোঝা যাবে।—ওরে, ওর গা শুঁকে দেখ তো, হিঙ্গু-পলাণ্ডু-রসুনের গন্ধ বেরুচ্ছে কি না।'

রক্ষিদ্বয় আদেশ পাইয়া অর্জুনবর্মার গা শুঁকিল, বলিল—'আজ্ঞা না, পেঁয়াজ-রসুন-হিঙের গন্ধ নেই।'

ঘরের কোণে বসিয়া রসরাজ শুনিতেছিলেন, তিনি মুখে বিরক্তি-সূচক চট্‌কার শব্দ করিলেন। চিপিটক কিন্তু দমিলেন না, বলিলেন—'হুঁ, গায়ের গন্ধ নদীর জলে ধুয়ে গেছে।—তোমার নাম কি?'

অর্জুনবর্মা নাম বলিল। শুনিয়া চিপিটক বলিলেন—'বটে—অর্জুনবর্মা। একেবারে পৌরাণিক নাম! ভাল, বল দেখি, অর্জুন কে ছিল?'

অর্জুনবর্মা এতক্ষণে চিপিটক মামার বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়া লইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে রঙ্গকৌতুকে তাহার রুচি নাই। সে গম্ভীর মুখে বলিল—'পাণ্ডব।'

'হুঁ, অর্জুনের বাবার নাম কি ছিল?'

'শুনেছি দেবরাজ ইন্দ্র।'

চিপিটক অমনি কল-কোলাহল করিয়া উঠিলেন—'ধরেছি ধরেছি! আর যাবে কোথায়! যে অর্জুনের বাবার নাম জানে না সে কখনো

হিন্দু হতে পারে না। নিশ্চয় যবনের গুপ্তচর।—রক্ষি, তোমরা ওকে বেঁধে নিয়ে যাও—'

রসরাজ রুক্ষস্বরে বাধা দিলেন, বলিলেন—'চিপিটক, তুমি থামো, চীৎকার করো না। অর্জুনের বাবার নাম ও ঠিক বলেছে। তুমিই অর্জুনের বাবার নাম জান না, সুতরাং বেঁধে রাখতে হলে তোমাকেই বেঁধে রাখতে হয়।'

চিপিটক থতমত খাইয়া গেলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'কিন্তু অর্জুনের বাবার নাম তো পাণ্ডু!'

রসরাজ বলিলেন—'পাণ্ডু নামমাত্র বাবা, আসল বাবা ইন্দ্র।'

চিপিটক অগত্যা নীরব রহিলেন, রসরাজ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, বেদ-পুরাণে পারঙ্গম; তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না।

রসরাজ অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তোমার শরীর কেমন? গায়ে ব্যথা হয়েছে?'

অর্জুন বলিল—'সামান্য। আপনার ঔষধের গুণে দেহের সমস্ত গ্লানি দূর হয়েছে।'

রসরাজ বলিলেন—'ভাল ভাল। তুমি যদি আত্মপরিচয় দিতে চাও, দিতে পার, না দিতে চাও দিও না। তুমি অতিথি, আমরা প্রশ্ন করব না।'

অর্জুন বলিল—'আমার পরিচয় সামান্যই।' সে বলরামকে যাহা বলিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিল।

রসরাজ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'যবনের রাজ্যে হিন্দুর ধর্ম কৃষ্টি স্বাধীনতা সবই নির্মূল হয়েছে। তুমি পালিয়ে এসেছ ভালই করেছ। দক্ষিণ দেশে এখনো স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কতদিন থাকবে কে জানে।—আচ্ছা, আজ তোমরা এস বৎস।'

অর্জুনবর্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিপিটক চোখ পাকাইয়া বলিলেন—'আজ ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পরে যদি জানতে পারি তুমি গুপ্তচর, তাহলে তোমার মুণ্ড কেটে নেব!'

রসরাজ বলিলেন—'চিপিটক, তোমার বায়ু বৃদ্ধি হয়েছে। এস ঔষধ দিই।'

বাহিরে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা ছিদ্রপথে সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পালা শেষ হইলে তাঁহারা পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মুক্ত পটপত্তনে দাঁড়াইয়া অন্য নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অর্জুনবর্মা রক্ষিদের সঙ্গে বাহিরে আসিল, তাহার মুখে একটা চাপা হাসি। রাজকুমারীদের দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে যুক্তপাণি হইয়া অভিবাদন করিল, তারপর ডিঙিতে নামিয়া বসিল। রক্ষী দুইজন দাঁড় টানিয়া সম্মুখে হাঙ্গরমুখী নৌকার দিকে চলিল।

মণিকঙ্কণা সেই দিকে কটাক্ষপাত করিয়া লঘুস্বরে বলিল—'অর্জুনবর্মা! হ্যাঁ ভাই, সত্যিই ছদ্মবেশে দ্বাপরযুগের অর্জুন নয় তো!'

বিদ্যুন্মালা ঈষৎ ভৎর্সনা-ভরা চক্ষে মণিকঙ্কণার পানে চাহিয়া তাহার লঘুতাকে তিরস্কৃত করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের প্রস্তরময় তীরে নৌকা বাঁধা হইল। দিনের গলদ্‌ঘর্ম প্রখরতার পর চন্দ্রমাশীতল রাত্রি পরম স্পৃহনীয়। নৈশাহারের পর দুই রাজকন্যা মাঝিদের আদেশ দিলেন, তাহারা পাটাতন দিয়া নৌকা হইতে দ্বীপ পর্যন্ত সেতু বাঁধিয়া দিল; রাজকন্যারা দ্বীপে অবতরণ করিলেন। জনশূন্য দ্বীপ, কঠিন কর্কশ ভূমি; তবু মাটি। অনেকদিন তাঁহারা মাটির স্পর্শ অনুভব করেন নাই; দুই ভগিনী হাত ধরাধরি করিয়া চন্দ্রালোকে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

নৌকা তিনটি পরস্পর শত হস্ত ব্যবধানে নিথর দাঁড়াইয়া আছে: যেন তিনটি অতিকায় চক্রবাক রাত্রিকালে দ্বীপপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে, প্রভাত হইলে উড়িয়া যাইবে।

সহসা হাঙ্গরমুখী নৌকা হইতে মৃদঙ্গ মন্দিরার নিক্বণ ভাসিয়া আসিল। দুই রাজকন্যা চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। শত হস্ত দূরে হাঙ্গরমুখী নৌকার পটপত্তনের উপর কয়েকটি লোক গোল হইয়া বসিয়াছে, অস্পষ্ট আবছায়া কয়েকটি মূর্তি। তারপর মৃদঙ্গ

মন্দিরার তালে তালে উদার পুরুষকণ্ঠে জয়দেব গোস্বামীর গান শোনা গেল—

মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে!

বলরাম জাতিতে কর্মকার হইলেও সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুকণ্ঠ। সে নৌকাযাত্রার সময় মৃদঙ্গ ও করতাল আনিয়াছিল; তারপর নৌকায় আরো দু'চারজন সঙ্গীত-রসিক জুটিয়া গিয়াছিল। মন উচাটন হইলে তাহারা মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া বসিত। পূর্ব ভারতে জয়দেব গোস্বামীর পদাবলী তখন সকলের মুখে মুখে ফিরিত; ভাষা সংস্কৃত হইলে কী হয়, এমন মধুর কোমলকান্ত পদাবলী আর নাই।

বলরামের দলের মধ্যে অর্জুনবর্মাও ছিল। সে গাহিতে বাজাইতে জানে না, কিন্তু সঙ্গীতরস উপভোগ করিতে পারে। তাই আজ বলরামের আহ্বানে সেও নৈশ কীর্তনে যোগ দিয়াছিল।

ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ বলরামের মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল; ধ্রুবপদ আর একবার আবৃত্তি করিয়া সে অন্তরা ধরিল—

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্।
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥

নিস্তরঙ্গ বাতাসে রসের লহর তুলিয়া অপূর্ব সঙ্গীত প্রবাহিত হইল; দূরে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা মুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা কলিঙ্গের কন্যা, জয়দেবের পদ তাঁহাদের অপরিচিত নয়; কিন্তু এমনি নিরাবিল পরিবেশের মধ্যে এমন গান তাঁহারা পূর্বে কখনো শোনেন নাই। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় নিবিড় রসাবেশে আপ্লুত হইল।

মধ্যরাত্রে সঙ্গীত-সভা ভঙ্গ হইল। দুই রাজকন্যা নিঃশব্দে ময়ূরপঙ্খী নৌকায় উঠিয়া গেলেন, রইঘরে গিয়া শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিলেন। কথা হইল না, দুইজনে অর্ধনিমীলিত নেত্রে পরস্পর চাহিয়া একটু হাসিলেন; তারপর চক্ষু মুদিয়া সঙ্গীতের অনুরণন শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হৃদয়ে রসাবেশ লইয়া নিদ্রা যাইলে কখনো কখনো স্বপ্ন দেখিতে হয়। সকলে দেখে না, কেহ কেহ দেখে। দুই রাজকন্যার মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিলেন—

স্বয়ংবর সভা। রাজকন্যা বীর্যশুল্কা হইবেন! তিনি মালা হাতে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন, চারিদিকে রাজন্যবর্গ। যিনি জলে ছায়া দেখিয়া শূন্যে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিতে পারিবেন তাঁহার গলায় রাজকন্যা মালা দিবেন। একে একে রাজারা শরক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিলেন না। রাজকন্যার মনে অভিমান জন্মিল। অর্জুন কেন এখানে আসিতেছেন না। অন্য কেহ যদি পূর্বেই লক্ষ্যভেদ করেন তখন কী হইবে! অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জুন আসিয়া ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন, জলে ছায়া দেখিয়া ঊর্ধ্বে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিলেন। অভিমানের সঙ্গে আনন্দ মিশিয়া রাজকুমারীর চক্ষে জল আসিল, তিনি অর্জুনের গলায় মালা দিলেন। অর্জুন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখে নতজানু হইলেন, বলিলেন—

মা কুরু মানিনি মানময়ে।

॥ আট ॥

নৌকা তিনটি চলিয়াছে।

ক্রমশ তীরে জনবসতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুষ্ক ঊষরতার ফাঁকে ফাঁকে একটু হরিদাভা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রাম-শিশুরা বৃহৎ নৌকা দেখিয়া কলরব করিতে করিতে তীর ধরিয়া দৌড়ায়; যুবতীরা জল ভরিতে আসিয়া নৌকার পানে চাহিয়া থাকে, তাহাদের নিরাবরণ বক্ষের নির্লজ্জতা চোখের সলজ্জ সরল চাহনির দ্বারা নিরাকৃত হয়; গ্রাম-বৃদ্ধেরা দধি নবনী শাকপত্র ফলমূল লইয়া ডাকাডাকি করে; নৌকা হইতে ডিঙি গিয়া টাটকা খাদ্য ক্রয় করিয়া আনে।

নদীর উপর প্রভাত বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ। কিন্তু যত বেলা বাড়িতে

থাকে দুই তীরের পাথর তপ্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে দুঃসহ করিয়া তোলে। দ্বিপ্রহরে নৌকাগুলির নাবিক ও সৈনিকেরা জলে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটে, ছুড়াছুড়ি করে। তাহাদের দেখিয়া রাজকুমারীদেরও লোভ হয় জলে পড়িয়া খেলা করেন, কিন্তু অশোভন দেখাইবে বলিয়া তাহা পারেন না; তোলা জলে স্নান করেন।

অপরাহ্ণে সহসা বাতাস স্তব্ধ হইয়া যায়। মনে হয় বায়ুর অভাবে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আড়কাঠি উদ্বিগ্ন চক্ষে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে; কিন্তু নির্মেঘ আকাশে আশঙ্কাজনক কোনো লক্ষণ দেখিতে পায় না। তারপর অগ্নিবর্ণ সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা নামিয়া আসে। ধীরে ধীরে আবার বাতাস বহিতে আরম্ভ করে।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়াছে। পূর্ণিমা অতীত হইয়া কৃষ্ণপক্ষ চলিতেছে, আর দুই-এক দিনের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাইবে। পথশ্রান্ত যাত্রিদের মনে আবার নূতন ঔৎসুক্য জাগিয়াছে।

এই কয়দিনে বলরাম ও অর্জুনবর্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো গাঢ় হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন দেশের লোক, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মনের ঐক্য খুঁজিয়া পাইয়াছে; উপরন্তু অর্জুনবর্মার পক্ষে অনেকখানি কৃতজ্ঞতাও আছে। বিদেশ-বিভূঁই-এ মর্মজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু বড়ই বিরল, তাই তাহারা কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়ে না, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে ঘুমায়, একসঙ্গে উঠে বসে। ইতিমধ্যে মনের অনেক গোপন কথা তাহারা বিনিময় করিয়াছে। দেশত্যাগের দুঃখ এবং তাহার পশ্চাতে গভীরতর আঘাতের দুঃখ তাহাদের হৃদয়কে এক করিয়া দিয়াছে।

বিজয়নগর যত কাছে আসিতেছে, দুই রাজকন্যার মনেও অলক্ষিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে। প্রথম নৌকায় উঠিবার সময় তাঁহারা কাঁদিয়াছিলেন, শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে সকল মেয়েই কাঁদে, তা রাজকন্যাই হোক আর সাধারণ গৃহস্থকন্যাই হোক। কিন্তু এখন তাঁহাদের মনে অজানিতের আতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে। বিজয়নগর রাজ্যে সমস্তই অপরিচিত; মানুষগুলো কি জানি কেমন, রাজা দেবরায়

না জানি কেমন। মণিকঙ্কণার মুখে সদাস্ফুট হাসিটি ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছে। বিদ্যুন্মালার ইন্দীবর নয়নে শুষ্ক উৎকণ্ঠা। জীবন এত জটিল কেন!

বিজয়নগরে পৌঁছিবার পূর্বরাত্রে দুই রাজকন্যা রইঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘুম সহজে আসিতেছিল না। কিছুক্ষণ শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিবার পর মণিকঙ্কণা উঠিয়া বসিল, বলিল—'চল্‌ মালা, ছাদে যাই। ঘরে গরম লাগছে!'

বিদ্যুন্মালাও উঠিয়া বসিলেন—'চল্‌।'

মন্দোদরী দ্বারের সম্মুখে আগড় হইয়া শুইয়া ছিল, তাহাকে ডিঙাইয়া দুই বোন রইঘরের ছাদে উঠিয়া গেলেন। নৌকার রক্ষী দুইজন রাজকন্যাদের বহিরাগমন জানিতে পারিলেও সাড়াশব্দ দিল না।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি, মধ্যযামে চাঁদ উঠিবে। নৌকা বাঁধা আছে, তাই বায়ুর প্রবাহ কম। তবু উন্মুক্ত ছাদ বেশ ঠাণ্ডা, অল্প বায়ু বহিতেছে। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। দুই ভগিনী দেহের অঞ্চল শিথিল করিয়া দিয়া ছাদের উপর বসিলেন।

নক্ষত্রখচিত ঝিকিমিকি অন্ধকারে দুইজনে নীরবে বসিয়া রহিলেন। একবার বিদ্যুন্মালার নিশ্বাস পড়িল। ক্লান্তি ও অবসাদের নিশ্বাস।

মণিকঙ্কণা জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভাবছিস্‌?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'ভাবছি শিরে-সংক্রান্তি।'

'ভয় করছে?'

'হ্যাঁ। তোর ভয় করছে না?'

'একটু একটু। কিন্তু মিথ্যে ভয়, একবার গিয়ে পৌঁছলেই ভয় কেটে যাবে।'

'হয়তো ভয় আরো বাড়বে।'

'তুই কেবল মন্দ দিকটাই দেখিস!'

'মন্দকে যে বাদ দেওয়া যায় না।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার ধরা-ধরা গলার আওয়াজ শুনিয়া মুখের

কাছে মুখ আনিয়া দেখিল বিদ্যুন্মালার চোখে জল। সে হ্রস্বস্বরে বলিল—'তুই কাঁদছিস্!'

বিদ্যুন্মালা তাহার কাঁধে মাথা রাখিলেন।

এখন, স্ত্রীজাতির স্বভাব এই যে, একজনকে কাঁদিতে দেখিলে অন্যজনেরও কান্না পায়। সুতরাং মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার কাঁধে মাথা রাখিয়া একটু কাঁদিল।

মন হালকা হইলে চক্ষু মুছিয়া আবার দুইজনে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ মণিকঙ্কণা ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'মালা, পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ—কিছু দেখতে পাচ্ছিস?'

বিদ্যুন্মালা চকিতে পশ্চিম দিকে..ঘাড় ফিরাইলেন। দূরে নদীর অন্ধকার যেখানে আকাশের অন্ধকারে মিশিয়াছে সেইখানে একটি অগ্নিপিণ্ড জ্বলিতেছে; হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা রক্তবর্ণ গ্রহ অস্ত যাইতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দেখা যায়, আলোকপিণ্ডটি কখনো বাড়িতেছে কখনো কমিতেছে, কখনো ঊর্ধ্বে শিখা নিক্ষেপ করিতেছে। অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আগুনের পিণ্ড! কোথায় আগুন জ্বলছে?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'বিজয়নগর তো ওই দিকে। তাহলে নিশ্চয় বিজয়নগরের আলো। দাঁড়া, আমি খবর নিচ্ছি।—রক্ষি!'

দুইজনে বস্ত্র সংবরণ করিয়া বসিলেন; একজন রক্ষী ছায়ামূর্তির ন্যায় কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—'আজ্ঞা করুন।'

মণিকঙ্কণা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—'ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কোথাকার আলো তুমি জানো?'

রক্ষী বলিল—'জানি দেবী। আজই সন্ধ্যার পর আড়কাঠি মশায়ের মুখে শুনেছি। বিজয়নগরে হেমকূট নামে পাহাড়ের চূড়া আছে, সেই চূড়া পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকে দেখা যায়। প্রত্যহ রাত্রে হেমকূট চূড়ায় ধুনী জ্বালা হয়, সারা রাত্রি ধুনী জ্বলে। সারা দেশের লোক জানতে পারে বিজয়নগর জেগে আছে।—আমরা কাল অপরাহ্ণে বিজয়নগরে পৌঁছব।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মণিকঙ্কণা বলিল—'বুঝেছি। আচ্ছা তুমি যাও।'

রক্ষী অপসৃত হইল। দুইজনে দূরাগত আলোকরশ্মির পানে চাহিয়া রহিলেন। উত্তর ভারতের দীপগুলি একে একে নিভিয়া গিয়াছে, নীরন্ধ্র অন্ধকারে অবসন্ন ভারতবাসী ঘুমাইতেছে; কেবল দাক্ষিণাত্যের একটি হিন্দু রাজ্য ললাটে আগুন জ্বালিয়া জাগিয়া আছে।

॥ নয় ॥

পরদিন অপরাহ্নে নৌকা তিনটি বিজয়নগরের নিকটবর্তী হইল। অর্ধক্রোশ দূর হইতে সূর্যের প্রখর আলোকে নগরের পরিদৃশ্যমান অংশ যেন পৌরুষ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ঝলমল করিতেছে।

নদীর উত্তর তীরে উগ্র তপস্বীর উৎক্ষিপ্ত ধূসর জটাজালের ন্যায় গিরিচক্রবেষ্টিত অনেগুন্দি দুর্গ। আদৌ এই দুর্গ বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল; পরে রাজধানী নদীর দক্ষিণ তীরে সরিয়া আসিয়াছে। অনেগুন্দি দুর্গ বর্তমানে একটি নগররক্ষক সৈন্যাবাস।

নদীর দক্ষিণ-কূলে শতবর্ষ ধরিয়া যে মহানগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যেমন শোভাময়ী তেমনি দুষ্প্রধর্ষা। সমকালীন বিদেশী পর্যটকের পাণ্ডুলিপিতে তাহার গৌরব-গরিমার বিবরণ ধৃত আছে। নগরীর বহিঃপ্রকাশের বেড় ছিল ত্রিশ ক্রোশ। তাহার ভিতর বহু ক্রোশ অন্দরে দ্বিতীয় প্রাকার। তাহার ভিতর তৃতীয় প্রাকার। এইভাবে একের পর এক সাতটি প্রাকার নগরীকে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাকারগুলির ব্যবধান-স্থলে অসংখ্য জলপ্রণালী তুঙ্গভদ্রা হইতে নগরীর মধ্যে জলধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। নগরীর ভূমি সর্বত্র সমতল নয়; কোথাও ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও সংকীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকাগুলিতে মানুষের বাস, শস্যক্ষেত্র, ফল ও ফুলের বাগান, ধনী ব্যক্তিদের উদ্যান-বাটিকা। নগরবৃত্তের নেমি হইতে যতই নাভির

দিকে যাওয়া যায়, জনবসতি ততই ঘনসংবদ্ধ হয়। অবশেষে ১৯ চক্রের মধ্যে পৌঁছিলে দেখা যায়, রাজপুরীর বিচিত্র সুন্দর হর্ম্যগুলি সহস্রার পদ্মের মধ্যবর্তী স্বর্ণকেশরের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নদীমধ্যস্থ নৌকা হইতে কিন্তু সমগ্র নগর দেখা যায় না, নগরের যে অংশ নদীর তটরেখা পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাই দৃশ্যমান। অনুমান, দুই ক্রোশ দীর্ঘ এই তটরেখা মণিমেখলার ন্যায় বঙ্কিম, তাহাতে সারি সারি সৌধ উদ্যান ঘাট মন্দির হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে।

নগর-সংলগ্ন এই তটরেখার পূর্ব সীমান্তে বিস্তীর্ণ ঘাট। বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর নির্মিত এই ঘাটের নাম কিল্লাঘাট; শুধু স্নানের ঘাট নয়, খেয়া ঘাটও। এই ঘাট হইতে সিধা উত্তরে অনেগুন্দি দুর্গে পারাপার হওয়া যায়। এই ঘাটে আজ বিপুল সমারোহ।

কলিঙ্গের রাজকুমারীদের লইয়া নৌ-বহর দেখা দিয়াছে, আজই অপরাহ্নে আসিয়া পৌঁছিবে, এ সংবাদ মহারাজ দেবরায় প্রাতঃকালেই পাইয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব দোলা ও পদাতিক সৈন্য কিল্লাঘাটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য। কিল্লাঘাটে পাঠানোর কারণ, এই ঘাটের পর গ্রীষ্মের তুঙ্গভদ্রা আরো শীর্ণা হইয়াছে, বড় নৌকা চলে কি না চলে। কিল্লাঘাট রাজপ্রাসাদ হইতে মাত্র ক্রোশেক পথ দূরে, সুতরাং রাজকুমারীরা কিল্লাঘাটে অবতরণ করিয়া দোলায় বা হস্তিপৃষ্ঠে রাজভবনে যাইতে পারিবেন, কোনোই অসুবিধা নাই। উপরন্তু নগরবাসীরা বধূ-সমাগমের শোভাযাত্রা দেখিয়া আনন্দিত হইবে।

রাজা স্বয়ং কিল্লাঘাটে আসেন নাই, নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পনদেবকে প্রতিভূ-স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। কুমার কম্পন রাজা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, সবেমাত্র যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অতি সুন্দরকান্তি নবযুবক। রাজা এই ভ্রাতাটিকে অত্যধিক স্নেহ করেন, তাই তিনি বধূ-সম্ভাষণের জন্য নিজে না আসিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন।

কিল্লাঘাটের উচ্চতম সোপানে কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া

..রি দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার পিছনে পাঁচটি চিত্রিতাঙ্গ হস্তী, হস্তীদের দুই পাশে ভল্লধারী অশ্বারোহীর সারি। তাহাদের পশ্চাতে নববেশপরিহিত ধনুর্ধর পদাতি সৈন্যের দল। সর্বশেষে ঘাটের প্রবেশমুখে নানা বর্ণাঢ্য বস্ত্রনির্মিত দ্বিভূমক তোরণ, তোরণের দুই স্তম্ভাগ্রে বসিয়া দুই দল যন্ত্রবাদক পালা করিয়া মুরজমুরলী বাজাইতেছে। বড় মিঠা মন-গলানো আগমনীর সুর।

ওদিকে, অগ্রসারী নৌকা তিনটিতেও প্রবল ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। আরোহীরা নৌকার কিনারায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল। ময়ূরপঙ্খী নৌকার ছাদের উপর বিদ্যুন্মালা মণিকঙ্কণা মন্দোদরী ও মাতুল চিপিটকমূর্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলের দৃষ্টি ঘাটের দিকে। তোরণশীর্ষে নানা বর্ণের কেতন উড়িতেছে; ঘাটের সম্মুখে জলের উপর কয়েকটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র নৌকা অকারণ আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। ঘাটের অস্ত্রধারী মানুষগুলো দাঁড়াইয়া আছে চিত্রার্পিতের ন্যায়। সর্বাগ্রে অশ্বারূঢ় পুরুষটি কে? দূর হইতে মুখাবয়ব ভাল দেখা যায় না। উনিই কি মহারাজ দেবরায়?

নৌকাগুলি যত কাছে যাইতেছে মুরজমুরলীর সুর ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দুই দলের দৃষ্টি পরস্পরের উপর। আকাশের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

নৌকা তিনটি ঘাটের দশ রজ্জুর মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখন মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালা ছাদ হইতে নামিয়া রইঘরে গেলেন। ঘাটে নামিবার পূর্বে বেশবাস পরিবর্তন, যথোপযুক্ত অলঙ্কার ধারণ ও প্রসাধন করিতে হইবে। মন্দোদরীকে ডাকিলে সে তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারিত; কিন্তু মন্দোদরী ঘাটের দৃশ্য দেখিতে মগ্ন, রাজকন্যারা তাহাকে ডাকিলেন না।

দুই ভগিনী গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে মহার্ঘ স্বর্ণতন্তুরচিত শাড়ি ও কঞ্চুলী পরিধান করিলেন, পরস্পরকে রত্নদ্যুতিখচিত অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। তারপর বিদ্যুন্মালা গমনোন্মুখী হইলেন। মণিকঙ্কণা জিজ্ঞাসা করিল —'আলতা কাজল পরবি না?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না, থাক।'

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। মণিকঙ্কণা ক্ষণেক ইতস্তত করিল, তারপর কাজললতা লাক্ষারসের করঙ্ক ও সোনার দর্পণ লইয়া বসিল।

বিদ্যুন্মালা পটপত্তনের উপর আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই অল্পক্ষণের মধ্যে আকাশের আলো অনেক কমিয়া গিয়াছে। তিনি চকিতে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দক্ষিণ্ হইতে একটা ধূম্রবর্ণ রাক্ষস ছুটিয়া আসিতেছিল, বিদ্যুন্মালার নেত্রাঘাতে যেন উন্মত্ত ক্রোধে বিবাট চীৎকার করিয়া নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নিমেষ-মধ্যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

দাক্ষিণাত্যেব শৈলবন্ধুর মালভূমিতে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে এমনি অতর্কিত ঝড় আসে। দিনের পর দিন তাপ সঞ্চিত হইতে হইতে একদিন হঠাৎ বিস্ফোবকের ন্যায় ফাটিয়া পড়ে। ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, বড় জোর দুই-তিন দণ্ড; কিন্তু তাহার যাত্রাপথে যাহা কিছু পায় সমস্ত ছারখার করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

এই ঝড়েব আবির্ভাব এতই আকস্মিক যে চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না, সতর্ক হইবার শক্তিও লুপ্ত হইয়া যায়। নৌকা তিনটি পরস্পরের কাছাকাছি চলিতেছিল, ঘাট হইতে তাহাদের দূরত্ব পাঁচ-ছয় রজ্জুর বেশি নয়, হঠাৎ ঝড়ের ধাক্কা খাইয়া তাহারা কাত হইয়া পড়িল। ময়ূরপঙ্খী নৌকার ছাদে মন্দোদরী ও চিপিটকমূর্তি ছিলেন, ছিট্‌কাইয়া নদীতে পড়িলেন। পাটাতনের উপর বিদ্যুন্মালা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মত্ত জলরাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মকরমুখী নৌকা হইতেও কয়েকজন নাবিক ও সৈনিক জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অর্জুনবর্মা একজন। যখন ঝড়ের ধাক্কা নৌকায় লাগিল তখন সে মকরমুখী নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকার দিকে চাহিয়া ছিল; নিজে জলে পড়িতে পড়িতে দেখিল রাজকুমারী ডুবিয়া গেলেন। সে জলে পড়িবামাত্র তীরবেগে সেইদিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

আকাশের আলো নিভিয়া গিয়াছে, নৌকাগুলি ঝড়ের ঝাপটে কে

কোথায় গিয়াছে কিছুই দেখা যায় না। কেবল নদীর উন্মত্ত তরঙ্গরাশি চারিদিকে উথল-পাথার হইতেছে। তারপর প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামিল। চরাচর আকাশ-পাতাল একাকার হইয়া গেল।

বিদ্যুন্মালা তলাইয়া গিয়াছিলেন, জলতলে তরঙ্গের আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবার ভাসিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ তরঙ্গশীর্ষে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইবার পর তাঁহার অর্ধচেতন দেহ আবার ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে ঝড়ের মাতন চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক, মেঘের হুঙ্কার; তারপর শোঁ শোঁ কল্‌কল্‌ শব্দ। জল ও বাতাসের মরণান্তক সংগ্রাম।

বিদ্যুন্মালা জলতলে নামিয়া যাইতে যাইতে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলেন, কে যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আবার উপর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; শরীর অবশ, বাঁচিয়া থাকার যে দুরন্ত প্রয়াস জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক তাহা আর নাই। জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাঁহার যেটুকু সংজ্ঞা অবশিষ্ট ছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল।

॥ দশ ॥

ঝড় থামিয়াছে।

মেঘের অন্ধকার অপসারিত হইবার পূর্বেই রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে। বর্ষণধৌত আকাশে তারাগুলি উজ্জ্বল; তুঙ্গভদ্রার স্রোত আবার শান্ত হইয়াছে। তীরবর্তী প্রাসাদগুলির দীপরশ্মি নদীর জলে প্রতিফলিত হইয়া কাঁপিতেছে। কেবল হেমকূট শিখরে এখনও অগ্নিস্তম্ভ জ্বলে নাই।

এই অবকাশে ঝঞ্ঝাহত মানুষগুলির হিসাব লওয়া যাইতে পারে।

কিল্লাঘাটে যাহারা অতিথি সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত ছিল তাহারাও ঝড়ের প্রকোপে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বস্ত্রতোরণ উড়িয়া গিয়া নদীর

জলে পড়িয়াছিল ; হাতীগুলা ভয় পাইয়া একটু দাপাদাপি করিয়াছিল, তাহার ফলে কয়েকজন সৈনিকের হাত-পা ভাঙ্গিয়াছিল ; আর বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয় নাই। ঝড় অপগত হইলে কুমার কম্পন নৌকা তিনটির নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু রাত্রি অন্ধকার, তীরস্থ গোল্লাকৃতি ছোট নৌকাগুলি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কুমার কম্পন কোনো সন্ধানই পাইলেন না। তখন তিনি সৈন্যদের ঘাটে রাখিয়া অশ্বপৃষ্ঠে রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন। রাজাকে সংবাদ দিয়া কাল প্রত্যূষে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন।

নৌকা তিনটি ঝড়ের আঘাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ডুবিয়া যায় নাই ; অগভীর জলে বা নদীমধ্যস্থ দীপের শিলাসৈকতে আটকাইয়া গিয়াছিল। নাবিক ও সৈন্যদের মধ্যে যাহারা ছিটকাইয়া জলে পড়িয়াছিল তাহারাও কেহ ডুবিয়া মরে নাই, জল ও বাতাসের তাড়নে কোথাও না কোথাও ডাঙ্গার আশ্রয় পাইয়াছিল। ময়ূরপঙ্খী নৌকায় মণিকঙ্কণা ও বৃদ্ধ রসরাজ আটক পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণের আশঙ্কা আর ছিল না বটে, কিন্তু বিদ্যুন্মালা, চিপিটক এবং মন্দোদরীর জন্য তাহাদের প্রাণে নিদারুণ ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। মণিকঙ্কণা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছিল—কোথায় গেল বিদ্যুন্মালা? মামা ও মন্দোদরীর কী হইল? তাহারা কি সকলেই ডুবিয়া গিয়াছে! রসরাজ পম্পাকে সান্ত্বনা দিবার ফাঁকে ফাঁকে প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন।

মামা ও মন্দোদরী ডুবিয়া যায় নাই। দুইজনে এক সঙ্গে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেহই সাঁতার জানে না ; মামার বকপক্ষীর ন্যায় শীর্ণ দেহটি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিল ; মন্দোদরীর কিন্তু ডুবিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তাহার বিপুল বপু তরঙ্গশীর্ষে শূন্য কলসের ন্যায় নাচিতে লাগিল। মামা ডুবিয়া যাইতে যাইতে মন্দোদরীর একটা পা নাগালের মধ্যে পাইলেন, তিনি মরীয়া হইয়া তাহা চাপিয়া ধরিলেন। ঝড়ের টানাটানি তাঁহার বজ্রমুষ্টিকে শিথিল করিতে পারিল না। কিন্তু চিপিটক ও মন্দোদরীর প্রসঙ্গ এখন থাক।

বিদ্যুন্মালা নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের সিক্ত সৈকতে শুইয়া ছিলেন, চেতনা ফিরিয়া পাইয়া অনুভব করিলেন তাঁহার বসন আর্দ্র। মনে পড়িয়া গেল তিনি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তারপর বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় পরিপূর্ণ স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুলিলেন।

চোখ খুলিয়া তিনি প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলেন না, ভিতরের অন্ধকার ও বাহিরের অন্ধকার প্রায় সমান। ক্রমে সূচির ন্যায় সূক্ষ্ম আলোকের রশ্মি তাঁহার চক্ষুকে বিদ্ধ করিল। আকাশের তারা কি? আশেপাশে আর কিছু দেখা যায় না। তখন তিনি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্তর্পণে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন।

কে যেন শিয়রে বসিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ছিল, হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'এখন বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে?'

বিদ্যুন্মালা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; অন্ধকারের মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকারের একটা পিণ্ড রহিয়াছে মনে হইল। তিনি স্খলিত স্বরে বলিলেন—'কে?'

শান্ত আশ্বাসভরা উত্তর হইল—'আমি—অর্জুনবর্মা।'

ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। তারপর বিদ্যুন্মালা ক্ষীণ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা—আমি ঝড়ের ধাক্কায় জলে পড়ে গিয়েছিলাম—কিছুক্ষণের জন্য নিশ্বাস রোধ হয়ে গিয়েছিল—তারপর কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলল—আর কিছু মনে নেই।—এ কোন স্থান?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'বোধ হয় নদীর একটা দ্বীপ। আপনি শরীরে কোনো ব্যথা অনুভব করছেন কি?'

বিদ্যুন্মালা নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। বলিলেন—'না। কিন্তু আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

অর্জুনবর্মা বলিল—'অন্ধকার রাত্রি, তাই কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আকাশের পানে চোখ তুলুন, তারা দেখতে পাবেন।'

বিদ্যুন্মালা ঊর্ধ্বে চাহিলেন। হাঁ, ওই তারার পুঞ্জ! প্রথম চক্ষু মেলিয়া তাহাদের দেখিয়াছিলেন, এখন যেন তাহারা আরো উজ্জ্বল হইয়াছে।

অর্জুনবর্মা বলিল—'পিছন দিকে ফিরে দেখুন, হেমকূট চূড়ায় ধুনী জ্বলছে।'

হেমকূট চূড়ায় প্রত্যহ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ধুনী জ্বলে; আজ বৃষ্টির জলে ইন্ধন সিক্ত হইয়াছিল তাই ধুনী জ্বলিতে বিলম্ব হইয়াছে। বিদ্যুন্মালা দেখিলেন, দূরে গিরিচূড়ায় ধূমজাল ভেদ করিয়া অগ্নির শিখা উত্থিত হইতেছে।

সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মার দিকে চাহিলেন, মনে হইল যেন সুদূর ধুনীর আলোকে অর্জুনবর্মার আকৃতি ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে। এতক্ষণ বিদ্যুন্মালার অন্তরের সমস্ত আবেগ যেন মূর্ছিত হইয়া ছিল, এখন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় একটু আনন্দ স্ফুরিত হইল—'অর্জুনবর্মা! আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি।' এই পর্যন্ত বলিয়াই তাঁহার আনন্দটুকু নিভিয়া গেল, তিনি উদ্বেগসংহত কণ্ঠে বলিলেন—'কিন্তু কঙ্কণা কোথায়? মন্দোদরী কোথায়?'

অর্জুন বলিল—'কে কোথায় আছে তা সূর্যোদয়ের আগে জানা যাবে না।'

'আজ কি চাঁদও উঠবে না?'

'উঠবে, মধ্যরাত্রির পর।'

'এখন রাত্রি কত?'

'বোধ হয় প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে।—রাজকুমারি, আপনার শরীর দুর্বল, আপনি শুয়ে থাকুন। বেশি চিন্তা করবেন না। দুর্বল শরীরে চিন্তা করলে দেহ আরো নিস্তেজ হয়ে পড়বে।'

'আর আপনি?'

'আমি পাহারায় থাকব।'

এই অসহায় অবস্থাতেও বিদ্যুন্মালা পরম আশ্বাস পাইলেন। দুই-চারিটি কথা বলিয়াই তাঁহার শরীরের অবশিষ্ট শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তিনি আবার বালুশয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া থাকিবার পর তাঁহার ক্লান্ত চেতনা আবার সুপ্তির অতলে ডুবিয়া গেল।

বিদ্যুন্মালার চেতনা সুষুপ্তির পাতাল স্পর্শ করিয়া আবার ধীরে ধীরে স্বপ্নলোকের অচ্ছাভ স্তরে উঠিয়া আসিল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, সেই স্বপ্ন যাহা পূর্বে একবার দেখিয়াছিলেন। স্বয়ংবর সভায় অর্জুন মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে নতজানু হইলেন। বলিলেন —'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।'

বিদ্যুন্মালা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন অর্জুনবর্মা তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিতেছে—'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।' স্বপ্নের অর্জুন ও প্রত্যক্ষের অর্জুনবর্মায় আকৃতিগত কোনো প্রভেদ নাই।

চাঁদ অবশ্য অনেক আগেই উঠিয়াছিল, দিকচক্র হইতে প্রায় এক রাশি ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র, কিন্তু পরশু ফলকের ন্যায় উজ্জ্বল। তাহারই আলোকে বিদ্যুন্মালার ঘুমন্ত মুখখানি পরস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তবেণী চুলগুলি বিস্রস্ত হইয়া মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, মহার্ঘ বস্ত্রটি বালুকালিপ্ত অবস্থায় নিদ্রাশীতল দেহটিকে অযত্নভরে আবৃত করিয়াছিল। সব মিলিয়া যেন একটি শৈবালবিদ্ধ কুমুদিনী, ঝড়ের আক্রোশে উন্মূলিত হইয়া তটপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

অর্জুনবর্মা মোহাচ্ছন্ন চোখে ওই মুখখানির পানে চাহিয়া ছিল। তাহার দৃষ্টিতে লুব্ধতা ছিল না, মনে কোনো চিন্তা ছিল না; রম্যাণি বীক্ষ্য মানুষের মন যেমন অজ্ঞাতপূর্ব স্মৃতির জালে জড়াইয়া যায়, অর্জুনবর্মার মনও তেমনি নিগূঢ় স্বপ্নজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আলোড়িত জলরাশির মধ্য হইতে রাজকন্যার অচেতন দেহ টানিয়া তোলার স্মৃতিও অসংলগ্নভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ বিদ্যুন্মালার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবার পর তাহার চমক ভাঙ্গিল। ঘুমন্ত রাজকন্যার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া থাকার রূঢ় ধৃষ্টতায় সন্ত্রস্ত হইয়া সে চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না কুহেলির ভিতর নিমগ্ন প্রকৃতি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টির ন্যায় অস্পষ্ট আবছা হইয়া আছে। অর্জুন চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, তারপর নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া দ্বীপের কিনারা ধরিয়া পরিক্রমণ আরম্ভ করিল।

চিরসঙ্গী লাঠি দুইটি আজ তাহার সঙ্গে নাই, নৌকা হইতে পতন কালে নৌকাতেই রহিয়া গিয়াছিল। বলরাম যদি বাঁচিয়া থাকে হয়তো লাঠি দু'টিকে যত্ন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বীপটি ক্ষুদ্র, প্রায় গোলাকৃতি; তীরে নুড়ি-ছড়ানো বালুবেলা, মধ্যস্থলে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় উঁচু হইয়া আছে। অর্জুনবর্মা তীর ধরিয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে নানা অসংলগ্ন কথা চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার উদ্বিগ্ন জল্পনার মধ্যে মনের নিভৃত একটা অংশ রাজকন্যার কাছে পড়িয়া রহিল। রাজকুমারী একাকিনী ঘুমাইতেছেন। যদি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভয় পান! যদি দ্বীপের মধ্যে শৃগাল বা বনবিড়াল জাতীয় হিংস্র জন্তু লুকাইয়া থাকে—।

দ্বীপে কিন্তু হিংস্র জন্তু ছিল না। অর্জুনবর্মা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল কয়েকটি তীবচর ক্ষুদ্র পাখী জলের ধাবে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পদশব্দে টিটিহি টিটিহি শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। টিট্টিভ পাখী।

বিদ্যুন্মালার কাছে ফিরিয়া আসিয়া অর্জুনবর্মা দেখিল তিনি যেমন শুইয়া ছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন, একটুও নড়েন নাই। অহেতুক উদ্বেগে অর্জুনের মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সে তাঁহার শিয়রে নতজানু হইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া দেখিল।

না, আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। ক্লান্তির বিবশ জড়তা কাটিয়া গিয়াছে, রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্নের ঘোরে তাঁহার ভ্রূ কখনো কুঞ্চিত হইতেছে, কখনো অধরে একটু হাসির আভাস দেখা দিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে।

স্বপ্নলোকে কোন্ বিচিত্র দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে কে জানে। অর্জুনবর্মা মনে মনে একটু ঔৎসুক্য অনুভব করিল; সে একবার চাঁদের দিকে চাহিল, একবার বিদ্যুন্মালার স্বপ্নমুগ্ধ মুখখানি দেখিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল—'রাজকুমারি, দেখুন, চাঁদ উঠেছে।'

॥ এগারো ॥

বিদ্যুন্মালা জাগ্রতলোকে ফিরিয়া আসিয়া সিধা উঠিয়া বসিলেন, অর্জুনবর্মার পানে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। স্বপ্ন ও জাগরের জট ছাড়াইতে একটু সময় লাগিল। তারপর তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—'আপনি কথা বললেন?'

অর্জুন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিল—'আপনি বোধহয় খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন। আমি ভেঙে দিলাম।'

বিদ্যুন্মালা চাঁদের পানে চাহিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, স্বপ্ন এখনও ভাঙে নাই।

অর্জুনবর্মা সঙ্কুচিতভাবে একটু দূরে বসিল, বলিল—'রাজকুমারি, আপনার শরীরের সব গ্লানি দূর হয়েছে?'

চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'হাঁ, এখন বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে।—রাত কত?'

হেমকূট শিখরে অগ্নিস্তম্ভ নির্ধূম শিখায় জ্বলিতেছে, নদীতীরস্থ গৃহগুলিতে দীপ নিভিয়া গিয়াছে। অর্জুন বলিল—'তৃতীয় প্রহর।'

এখনো রাত্রি শেষ হইতে বিলম্ব আছে। যতক্ষণ সূর্যোদয় না হয় ততক্ষণ স্বপ্নকে বিদায় দিবার প্রয়োজন নাই।

রাজকুমারী মনে মনে যেন কিছু জল্পনা করিতেছেন। তারপর মন স্থির করিয়া তিনি অর্জুনবর্মার পানে ফিরিলেন, বলিলেন—'ভদ্র, আজ আপনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন।'

অর্জুন গলার মধ্যে একটু শব্দ করিল, উত্তর দিল না। বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আপনার পরিচয় আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমার প্রাণদাতার পরিচয় আমি জানতে চাই। আপনি সবিস্তারে আপনার জীবনকথা আমাকে বলুন, আমি শুনব।'

অর্জুন বিহ্বল হইয়া বলিল—'দেবি, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার পরিচয় কিছু নেই।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আছে বৈকি। আপনি নিজের কার্যের

দ্বারা খানিকটা আত্মপরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নয়। আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় আমি জানতে চাই।'

অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া বিদ্যুন্মালা একটু হাসিলেন, বলিলেন—'অবশ্য আপনি ক্লান্ত, ওই দুর্যোগের পর ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম করেননি। আপনি যদি ক্লান্তিবশত কাহিনী বলতে না পারেন, তাহলে থাক, আপনি বরং নিদ্রা যান। আমি তো এখন সুস্থ হয়েছি, আমি জেগে থেকে পাহারা দেব।'

অর্জুন বলিল—'না না, আমার নিদ্রার প্রয়োজন নেই। আপনি যখন শুনতে চান, আমার জীবনকথা বলছি। রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর তো কিছুই করবার নেই।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তাহলে আরম্ভ করুন।'

অর্জুন কিছুক্ষণ হেঁট মুখে নীরব রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমার পিতার নাম রামবর্মা। আমরা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়। আমার পূর্বপুরুষেরা বহু শতাব্দী আগে উত্তর দেশ থেকে এসে কৃষ্ণানদীর তীরে বসতি করেছিলেন। উত্তর দেশে তখন যবনের আবির্ভাব হয়েছে, মানুষের প্রাণে সুখ-শান্তি নেই। দাক্ষিণাত্যে এসেও আমার পূর্বপুরুষেরা বেশি দিন সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারলেন না, পিছন পিছন যবনেরা এসে উপস্থিত হল। উত্তরাপথের যে দুরবস্থা হয়েছিল দক্ষিণ পথেরও সেই দুরবস্থা হল। তারপর আজ থেকে শত বর্ষ পূর্বে বিজয়নগরে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হল, যবনেরা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিক থেকে বিতাড়িত হল। আমার পূর্বপুরুষেরা কৃষ্ণার উত্তর তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা যবনের অধীনেই রইলেন। দাক্ষিণাত্যের যবনেরা দিল্লীর শাসন ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার নাম বহমনী রাজ্য; গুলবর্গা তার রাজধানী।

আমার পূর্বপুরুষেরা যোদ্ধা ছিলেন, গুলবর্গার উপকণ্ঠে জমিজমা বাসগৃহ করেছিলেন। যখন যবন এসে গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করল তখন তাঁরা যুদ্ধ-ব্যবসায় ত্যাগ করলেন; কারণ যুদ্ধ করতে

হলে যবনের পক্ষে স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করে শাস্ত্রচর্চায় নিযুক্ত হলেন।

এসব কথা আমি আমার পিতার মুখে শুনেছি।

সেই থেকে আমাদের বংশে বিদ্যার চর্চা প্রচলিত হয়েছে, কেবল আমি তার ব্যতিক্রম। কিন্তু নিজের কথা পরে বলব, আগে আমার পিতার কথা বলি।

আমার পিতা জীবিত আছেন আমি দেখে এসেছি, কিন্তু এতদিনে তিনি বোধহয় আর জীবিত নেই। তিনি যুদ্ধবৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি যোদ্ধা ছিলেন। কোনো দিন যবনের কাছে মাথা নত করেননি। গৃহে বসে তিনি বিদ্যাচর্চা করতেন, জ্যোতিষ ও গণিত বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বিশেষত হিসাব-নিকাশের কাজের জন্য তিনি গুলবর্গায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, গুলবর্গার বড় বড় ব্যবসায়ী তাঁর কাছে আসে নিজের ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বুঝে নেবার জন্য। এ থেকে পিতার যথেষ্ট আয় ছিল।

আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। পিতা আর বিবাহ করেননি। আমি এবং পিতা ছাড়া আমাদের গৃহে আর কেউ ছিল না।

আমার কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার দিকে মন ছিল না। বংশের সহজাত সংস্কার আমার রক্তে বেশি আছে; ছেলেবেলা থেকে আমি খেলাধুলা অস্ত্রবিদ্যা সাঁতার মল্লযুদ্ধ এইসব নিয়ে মত্ত থাকতাম। একদল বেদিয়ার কাছে একটি গুপ্তবিদ্যা শিখেছিলাম, যার বলে এক দণ্ডে তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে পারি। পিতা আমার মনের প্রবণতা দেখে মাঝে মাঝে বলতেন—'অর্জুন, তোমার ধাতু-প্রকৃতিতে গোত্রপ্রভাব বড় প্রবল, তোমাব কোষ্ঠিও যোদ্ধার কোষ্ঠি। তুমি বিজয়নগরে গিয়ে হিন্দুরাজাব অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন কর।' আমি বলতাম—'পিতা, আপনিও চলুন।' তিনি বলতেন—'সাত পুরুষের ভিটা ছেড়ে আমি যাই কী করে? গৃহে দীপ জ্বলবে না, যবনেরা সব লুটেপুটে নিয়ে যাবে। তুমি যাও, হিন্দু রাজ্যে নিঃশঙ্কে বাস করতে পারবে।' কিন্তু

আমি যেতে পারতাম না, পিতাকে ছেড়ে একা চলে যেতে মন চাইত না।

এইভাবে জীবন কাটছিল ; জীবনে নিবিড় সুখও ছিল না, গভীর দুঃখও ছিল না। তারপর আজ থেকে দশ-বারো দিন আগে রাত্রি দ্বিপ্রহরে পিতার এক বন্ধু এলেন। মহাধনী বণিক, সুলতান আহমদ শাহের সভায় যাতায়াত আছে, তিনি চুপি চুপি এসে বলে গেলেন—'আহমদ শাহ স্থির করেছে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে গরু খাইয়ে মুসলমান করবে, তারপর তোমাকে নিজের দপ্তরে বসাবে। কাল সকালেই সুলতানের সিপাহীরা আসবে তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে।'

পিতার মাথায় বজ্রাঘাত। সংবাদদাতা যেমন গোপনে এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। আমরা দুই পিতা-পুত্র সারারাত পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে বসে রইলাম।

মুসলমানেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তাদের প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু তারা দস্যুরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, সেই দস্যুবৃত্তি এখনো ত্যাগ করতে পারেনি। তারা লুঠ করতে জানে, কিন্তু রাজ্য চালাতে জানে না ; আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে জানে না। তাই তারা কর্মদক্ষ বুদ্ধিমান হিন্দু দেখলেই জোর করে তাদের মুসলমান বানিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেয়। পিতাকেও তারা গরু খাইয়ে নিজের দলে টেনে নিতে চায়। সেই সঙ্গে আমাকেও।

রাত্রি যখন শেষ হয়ে আসছে তখন পিতা বললেন—'অর্জুন, আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে, কোষ্ঠি গণনা করে দেখেছি আমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। ম্লেচ্ছরা যদি জোর করে আমার ধর্মনাশ করে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করব। কিন্তু তুমি পালিয়ে যাও, তোমার জীবনে এখনো সবই বাকি। নদী পার হয়ে তুমি হিন্দু রাজ্যে চলে যাও।'

আমি পিতার পা ধরে কাঁদতে লাগলাম। পিতা বললেন—'কেঁদো না। আমরা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁকেও একদিন জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে

যেতে হয়েছিল। তুমি বিজয়নগরে যাও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করবেন।'

বাইরে তখন কাক কোকিল ডাকতে আরম্ভ করেছে। আমি গৃহ ছেড়ে যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে শুধু এক জোড়া লাঠি। বেদিয়ারা আমাকে যে লাঠিতে চড়ে হাঁটতে শিখিয়েছিল সেই লাঠি। এ লাঠি একাধারে অস্ত্র এবং যানবাহন।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই শুনতে পেলাম—অশ্বক্ষুরধ্বনি। চারজন অশ্বারোহী আমাদের ধরে নিয়ে যেতে আসছে। আমি আর বিলম্ব করলাম না, লাঠিতে চড়ে নদীর দিকে ছুটলাম। সওয়ারেরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, তারা আমাকে তাড়া করল। কিন্তু ধরতে পারল না। আমাদের গৃহ থেকে নদী প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে, আমি গিয়ে লাঠি-সুদ্ধ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অশ্বারোহীরা আর আমাকে অনুসরণ করতে পারল না।

সারাদিন নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমে এসে পৌঁছুলাম। তারপর—তারপর যা হল সবই আপনি জানেন।'

অর্জুন নীরব হইল। বিদ্যুন্মালা নত মুখে শুনিতেছিলেন, চোখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। চন্দ্রের প্রভা ম্লান হইয়া গিয়াছে, পূর্বাকাশে শুকতারা দপদপ করিতেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

দিনের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিল্লাঘাটে মহা হৈ-চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কুমার কম্পন ফিরিয়া আসিয়াছেন। গোলাকৃতি খেয়ার তরীগুলি ঝড়ের তাড়নে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ডুবিয়া যায় নাই; তাহারা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই বিচিত্র গঠনের ডিঙাগুলি তুঙ্গভদ্রার নিজস্ব নৌকা, ভারতের অন্য কোথাও দেখা যাইত না। বেতের চ্যাঙ্গারির গায়ে চামড়ার আবরণ পরাইয়া এই ডিঙাগুলি নির্মিত; তবে আয়তনে চ্যাঙ্গারির তুলনায় অনেক বড়, দশ-বারো জন মানুষ তল্পিতল্পা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। এই জাতীয় জলযান প্রাচীন কাল হইতে আরব দেশে প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ ভারতে কেমন করিয়া উপনীত হইল বলা সহজ নয়। হয়তো মোপলারা যখন আরব দেশ হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহারাই এই জাতীয় নৌকার প্রবর্তন করিয়াছিল।

কুমার কম্পনদেব ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, কলিঙ্গের তিনটি বহিত্র নদীমধ্যস্থ বিভিন্ন চরে আটকাইয়া বেসামাল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে; যদিও মানুষগুলোকে দেখা যাইতেছে না, তবু আশা করা যায় তাহারা বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের উদ্ধার করা প্রয়োজন; সর্বাগ্রে কলিঙ্গের দুই রাজকন্যার সন্ধান লওয়া কর্তব্য। কম্পনদেব আদেশ দিলেন; চক্রাকৃতি ডিঙাগুলি লইয়া মাঝিরা অর্ধ-মজ্জিত বহিত্রগুলির দিকে চলিল। সর্বশেষ ডিঙাতে স্বয়ং কম্পনদেব উঠিলেন।

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই, কিন্তু পূর্বদিগন্ত আসন্ন সূর্যের ছটায় স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে। ডিঙাগুলি ভাটির দিকে চলিল, কারণ বানচাল

বহিত্র তিনটি ঐদিকেই পরস্পর হইতে দুই তিন রজ্জু দূরে আটকাইয়া আছে।

সকলের পশ্চাতে কম্পনদেবের ডিঙা যাইতেছিল। তিনি ডিঙার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিলেন ; সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, পাশের দিকে দ্বীপাকৃতি একটি চরের উপর দুইটি মনুষ্য-মূর্তি পড়িয়া আছে। তিনি আরো ভাল করিয়া দেখিলেন : হাঁ, সৈকতলীন মনুষ্যদেহই বটে। কিন্তু জীবিত কি মৃত বলা যায় না। একটির দেহে বালুকর্দমাক্ত রক্তাংশুক দেখিয়া মনে হয় সে নারী। কম্পনদেব মাঝিকে সেইদিকে ডিঙা ফিরাইতে বলিলেন।

দ্বীপে নামিয়া কম্পনদেব নিঃশব্দে ভূমিশয়ান মূর্তি দুইটির নিকটবর্তী হইলেন। একটি নারী, অন্যটি পুরুষ ; পরস্পর হইতে তিন চারি হস্ত অন্তরে শুইয়া আছে। কিন্তু মৃত নয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে দেহের সঞ্চালন লক্ষ্য করা যায়। হয় মূর্ছিত, নয় নিদ্রিত।

কম্পনদেবের চক্ষু যুবতীর মুখ হইতে পুরুষের মুখের দিকে কয়েকবার দ্রুত যাতায়াত করিল, তারপর যুবতীর মুখের উপর স্থির হইল। এই সময় সূর্যবিম্ব দিকচক্রের উপর মাথা তুলিয়া চারিদিকে অরুণচ্ছটা ছড়াইয়া দিল। যুবতীর মুখে বালার্ক-কুঙ্কুমের স্পর্শ লাগিল।

কম্পনদেব নিষ্পলক নেত্রে যুবতীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি রাজপুত্র, সুন্দরী যুবতী তাঁহার কাছে নূতন নয়। কিন্তু এই ভূমিশয়ান যুবতীর মুখে এমন একটি দুর্নিবার চৌম্বকশক্তি আছে যে বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। কম্পনদেব যুবতীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন—এ নিশ্চয় কলিঙ্গের প্রধানা রাজকন্যা, বিজয়নগরের ভাবী রাজবধূ। কম্পনদেব বোধকরি কলিঙ্গদেশীয়া বরাঙ্গনাদের কুহকভরা রূপলাবণ্যের সহিত ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলেন না, তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঈর্ষামিশ্রিত অভীপ্সার শিহরণ বহিয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ নিদ্রিতাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি গলার মধ্যে

শব্দ করিলেন, অমনি বিদ্যুন্মালার চক্ষু দুটি খুলিয়া গেল ; অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া তিনি বসন সংবরণপূর্বক উঠিয়া বসিলেন। উষাকালে তিনি আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্জুনও ঘুমাইয়াছিল। অর্জুনের ঘুম কিন্তু ভাঙ্গিল না ; সারা রাত্রি জাগরণের পর সে গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যুন্মালা একবার কুমার কম্পনদেবের দিকে চক্ষু তুলিয়াই আবার চক্ষু নত করিলেন। এই পরম কান্তিমান যুবকের চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। বিদ্যুন্মালা ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে ?'

কম্পনদেব বলিলেন—'আমি রাজভ্রাতা কুমার কম্পনদেব। ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্তদের খোঁজ নিতে বেরিয়েছি। আপনি—?'

'আমি কলিঙ্গের রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।'

কম্পনদেব অর্জুনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'এ ব্যক্তি কে ?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি ঝড়ের আঘাতে নৌকা থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ডুবে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওর নাম অর্জুনবর্মা।'

নিদ্রার মধ্যেও নিজের নাম অর্জুনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল ; কম্পনদেবকে দেখিয়া বলিল—'কে ?'

কম্পনদেব কুঞ্চিতচক্ষে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন, উত্তর দিলেন না ; তারপর বিদ্যুন্মালার দিকে ফিরিলেন—'সারা রাত্রি আপনি এবং এই ব্যক্তি দ্বীপেই ছিলেন ?'

'হাঁ।'

'ভাল। চলুন, এবার ডিঙায় উঠুন।'

বিদ্যুন্মালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষে সহসা ব্যাকুলতার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন—'কিন্তু—কঙ্কণা ? আমাদের নৌকা কি ডুবে গিয়েছে ?'

কম্পনদেব বলিলেন—'না, একটি নৌকাও ডোবেনি।—কঙ্কণা কে?'

'আমার ভগিনী—মণিকঙ্কণা।'

'তিনি নিশ্চয় ময়ূরপঙ্খী নৌকাতেই আছেন। আসুন প্রথমে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই।'

বিদ্যুন্মালা ডিঙায় উঠিলেন। কুমার কম্পন একটু চিন্তা করিয়া অর্জুনের দিকে শিরঃসঞ্চালন করিলেন। অর্জুন ডিঙায় উঠিল। তখন কম্পনদেব স্বয়ং ডিঙায় আরোহণ করিয়া স্রোতের মুখে নৌকা চালাইবার আদেশ দিলেন।

সূর্য আরো উপরে উঠিয়াছে। নদীর বুকে যে সামান্য বাষ্পাবরণ জমিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে, নৌকা তিনটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রথমেই ময়ূরপঙ্খী নৌকা নিমজ্জিত চরে অবরুদ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠ ময়ূরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে; চারিদিকে জল। ইতিমধ্যে একটি ডিঙা তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে মানুষ দেখা যাইতেছে না।

কুমার কম্পনের ডিঙা ময়ূরপঙ্খীর গায়ে গিয়া ভিড়িল। কুমারী বিদ্যুন্মালা শীর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন—'কঙ্কণা!'

খোলের ভিতর হইতে আলুথালু বেশে মণিকঙ্কণা বাহির হইয়া আসিল। বিদ্যুন্মালাকে দেখিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—'মালা! তুই বেঁচে আছিস্!'

বিদ্যুন্মালা টলিতে টলিতে ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে উঠিলেন, দুই ভগিনী পরস্পর কণ্ঠলগ্না হইলেন। তারপর গলদশ্রু নেত্রে রইঘরে নামিয়া গেলেন। রাজপুরীতে যাইতে হইবে, আবার বেশবাস পরিবর্তন করিয়া রাজকন্যার উপযোগী সাজসজ্জা করা প্রয়োজন।

ডিঙাতে দাঁড়াইয়া কুমার কম্পন অঙ্গুলি দিয়া সূক্ষ্ম গুম্ফের প্রান্ত আমর্শন করিতে লাগিলেন। অর্জুন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছিল, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হইল না। রাজপুত্র রূপ দেখিয়া মজিয়াছেন।

শোভাযাত্রা করিয়া রাজকন্যারা কিল্লাঘাট হইতে রাজভবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজকন্যাদের হাতির পিঠে উঠিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাঁহারা ওঠেন নাই। দুই বোন পাশাপাশি চতুর্দোলায় বসিয়াছেন। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠে চতুর্দোলার পাশে চলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি মুহুর্মুহু রাজকন্যাদের দিকে ফিরিতেছে; রহস্যময় দৃষ্টি, তাঁহার অন্তর্গূঢ় জল্পনা কেহ অনুমান করিতে পারে না।

চতুর্দোলার পশ্চাতে একটি দোলায় রাজবৈদ্য বৃদ্ধ রসরাজ ঔষধের পেটরা লইয়া উঠিয়াছেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার দেহ অনাহত আছে, কিন্তু অবস্থাগতিকে তিনি যেন একটু দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

রসরাজের পিছনে নৌকার নাবিক ও সৈনিকের দল পদব্রজে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অর্জুনবর্মাও আছে। সে চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া এদিক-ওদিক দেখিতেছে; সবগুলি মুখই পরিচিত, কিন্তু বলরামকে দেখা যাইতেছে না। অর্জুনের পাশের লোকটি হাসিয়া বলিল—'বলরাম কর্মকারকে খুঁজছ? সে আসেনি। নৌকা জখম হয়েছে, তাই মেরামতির জন্য বলরাম আর কয়েকজন ছুতার নৌকাতেই আছে।' অর্জুন নিশ্চিন্ত হইল, বিচিত্র নগরশোভা দেখিতে দেখিতে চলিল।

শোভাযাত্রার গতি দ্রুত নয়; সম্মুখে পাঁচটি হাতী ও পশ্চাতে অশ্বারোহীর দল তাহার বেগমর্যাদা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। আজ আর মুরজ-মুরলী বাজিতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া বিপুল শব্দে তূরী ও পটহ ধ্বনিত হইতেছে; যেন বিজয়ী সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

এই বিশাল নগরের আকৃতি প্রকৃতি সত্যই বিচিত্র। সাতটি প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে ছয়টি পিছনে পড়িয়া আছে, তবু নগর এখনো তাদৃশ জনাকীর্ণ নয়। ভূমি কোথাও সমতল নয়, কঙ্করাবৃত পথ কখনো উঠিতেছে কখনো নামিতেছে, কখনো মকরাকৃতি অনুচ্চ গিরিশ্রেণীকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। কোথাও অগভীর সংকীর্ণ

পয়োনালক পথকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, হাঁটু পর্যন্ত জল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যেখানে জমি একটু সমতল সেখানেই পথের পাশে পাথরের গৃহ, ফুলের বাগান, আম্রবাটিকা, ইক্ষুক্ষেত্র। শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বহু নরনারী পথের ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাস্যমুখী যুবতীরা চতুর্দোলা লক্ষ্য করিয়া লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতেছে।

তারপর আবার অসমতল শিলাবন্ধুর ভূমি, স্বল্পসেচনতুষ্ট জোয়ার-বাজরার শূলকণ্টকিত ক্ষেত্র। উর্ধ্বে চাহিলে দেখা যায়, দূরে দূরে তিনটি স্তম্ভাকার গিরিশৃঙ্গ—হেমকূট মতঙ্গ ও মালয়বন্ত আকাশে মাথা তুলিয়া যেন দূরাগত শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে।

দিবা দ্বিতীয় প্রহরের আরম্ভে মিছিল এক উত্তুঙ্গ সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহাই শেষ তোরণ, তোরণের দুই পাশ হইতে উচ্চ পাষাণ-প্রাকার নির্গত হইয়া অন্তর্ভুক্ত ভূমিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। বিস্তীর্ণ নগরচক্রের ইহা কেন্দ্রস্থিত নাভি।

তোরণের প্রহরীরা পথ ছাড়িয়া দিল, মিছিল সপ্তম পুরীতে প্রবেশ করিল। সাত কৌটার মধ্যে এক কৌটা। ইহার ব্যাস চারি ক্রোশ; ইহার মধ্যে চৌত্রিশটি প্রশস্ত রাজপথ আছে, তন্মধ্যে প্রধান রাজপথের নাম পান-সুপারি রাস্তা। নাম পান-সুপারি রাস্তা হইলেও আসলে ইহা সোনা রূপা হীরা-জহরতের বাজার। এই মণিমাণিক্যের হাটের মাঝখানে রাজভবনের অসংখ্য হর্ম্যরাজি।

মিছিল সেইদিকে চলিল। গভীর শব্দে ডঙ্কা ও তূরী বাজিতেছে। পথে লোকারণ্য; পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাগুলির অলিন্দে বাতায়নে চাঁদের হাট; দুই সুন্দরী রাজকন্যাদের দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিতেছে। মণিকঙ্কণা ও বিদ্যুন্মালা চতুর্দোলায় পাশাপাশি বসিয়া আছেন। মণিকঙ্কণা সাহসিনী মেয়ে, কিন্তু তাহার বুকও মাঝে মাঝে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে। বিদ্যুন্মালার আয়ত চক্ষু সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কিন্তু তাঁহার মন আপন অতল গভীরতায় ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন—জীবন এত জটিল কেন?

বেলা দ্বিপ্রহরে মধ্যদিনের সূর্যকে মাথায় লইয়া শোভাযাত্রা রাজভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

॥ দুই ॥

রাজপুরীর সাত শত প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। সকলেই দৃঢ়াঙ্গী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারী যুবতী আছে, পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে, সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, এই নারীবাহিনী পুরী রক্ষণ করে ও পৌরজনের সেবা করে।

চতুর্দোলা রাজসভার স্তম্ভশোভিত দ্বারের সম্মুখে থামিয়াছিল। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। বাদ্যোদ্যম তুমুল হইয়া উঠিল। তারপর সভাগৃহ হইতে মহারাজ দেবরায় বাহির হইয়া আসিলেন। তপ্তকাঞ্চন দেহ, মুখে সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য; পরিধানে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়; কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ। যৌবনের মধ্যাহ্নে মহারাজ দেবরায়ের দেহ যেন লাবণ্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

তিনি একটি হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিলেন, অমনি বাদ্যোদ্যম নীরব হইল। কুমার কম্পন বলিলেন—'মহারাজ, এই নিন, কলিঙ্গের দুই দেবীকে নদী থেকে উদ্ধার করে এনেছি।'

দুই রাজকন্যা চতুর্দোলা হইতে নামিয়া রাজার সম্মুখে যুক্তহস্তা হইলেন। রাজাকে দেখিয়া মণিকঙ্কণার সমস্ত ভয় দূর হইয়াছিল, সে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে চাহিল; বিদ্যুন্মালার মুখ দেখিয়া কিন্তু মনের কথা বোঝা গেল না। রাজা পূর্বে কলিঙ্গ-কন্যাদের দেখেন নাই, ভাটের মুখে বিবাহ স্থির হইয়াছিল। তিনি একে একে দুই কন্যাকে দেখিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা আরো গভীর হইল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে করতল তুলিয়া তিনি বলিলেন—'স্বস্তি।'

রসরাজও নিজের দোলা হইতে নামিয়াছিলেন, এই সময় তিনি

আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'জয়োস্তু মহারাজ। আমি কলিঙ্গের রাজবৈদ্য রসরাজ, কুমারীদের সঙ্গে এসেছি। কুমারীদের মাতুল অভিভাবকরূপে ওদের সঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমিই আপনাকে কন্যাদের পরিচয় দিচ্ছি। ইনি কুমার ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা, ভাবী রাজবধূ; আর ইনি রাজকুমারী মণিকঙ্কণা, ভাবী রাজবধূর সঙ্গিনীরূপে এসেছেন।'

রাজা বলিলেন—'ধন্য। মাতুল মহাশয়কে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। আপাতত—'

রাজা পাশের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন। ইতিমধ্যে, ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার পাশে একটু পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইনি একাধারে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও মহাসচিব। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক দৃঢ়শরীর পুরুষ; অত্যন্ত সাদাসিধা বেশবাস, মুখ দেখিয়া বিদ্যাবুদ্ধি বা পদমর্যাদার কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, মান্য অতিথিদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করুন। এঁরা আমাদের কুটুম্ব, অতিথি-ভবনে নিয়ে গিয়ে এঁদের সমুচিত পানাহার বিশ্রামের আয়োজন করুন।'

'যথা আজ্ঞা আর্য।' লক্ষ্মণ মল্লপ করজোড়ে অতিথিদের সম্বোধন করিলেন—'আমার সঙ্গে আসতে আজ্ঞা হোক। অতিথি-ভবন নিকটেই, সেখানে আপনাদের স্নান পান আহার বিশ্রামের আয়োজন করে রেখেছি।'

লক্ষ্মণ মল্লপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে রসরাজ চোখে ভাল দেখেন না, তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া আগে লইয়া চলিলেন, অতিথিবর্গ তাঁহাদের পিছনে চলিল। রাজসভা হইতে শত হস্ত দূরে রাজকীয় টঙ্কশালার পাশে প্রকাণ্ড দ্বিভূমক অতিথি-ভবন। সেখানে পাঁচ শত অতিথি এককালে বাস করিতে পারে।

ইত্যবসরে রাজপুরী হইতে একটি শক্তসমর্থা দাসী স্বর্ণকলসে জল আনিয়া রাজকুমারীদের পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়াছিল। এই দাসী বিপুল রাজপরিবারের গৃহিণী, সাত শত প্রতিহারিণীর প্রধানা নায়িকা;

নাম পিঙ্গলা। রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'পিঙ্গলে, কলিঙ্গ-কুমারীদের জন্য নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত হচ্ছে, এখনো বাসের উপযোগী হয়নি। তুমি আপাতত এঁদের রাজ-সভাগৃহের দ্বিতলে নিয়ে যাও, উপস্থিত সেখানেই এঁরা থাকবেন।'

পিঙ্গলা একটু হাসিয়া বলিল—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

পিঙ্গলাকে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইতিপূর্বে রাজার আদেশে সে সভাগৃহের দ্বিতলে রাজকুমারীদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিল; রাজা বোধ করি কুমারীদের শুনাইবার জন্য একথা বলিয়াছিলেন। রাজকীয় সভাগৃহটি দ্বিভূমক; নিম্নতলে সভা বসে, দ্বিতীয় তলে তিনটি মহল। একটিতে মহারাজ দিবাকালে বিশ্রাম করেন, দ্বিতীয়টি রাজার পাকশালা, সেখানে দশটি পাচিকা রাজার জন্য রন্ধন করে, নপুংসক কঞ্চুকী পাকশালার দ্বারের পাশে বসিয়া পাহারা দেয়। তৃতীয় মহলটি এতদিন শূন্য পড়িয়া ছিল। এখন সাময়িকভাবে নবাগতাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজা পুনশ্চ বলিলেন—'এঁদের নিয়ে যাও, যথোচিত সেবা কর। দেখো যেন সেবার ত্রুটি না হয়।'

পিঙ্গলা বলিল—'ত্রুটি হবে না মহারাজ। আমি নিজে এঁদের সেবা করব।'

'ভাল।'

পিঙ্গলা রাজকুমারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া লইয়া গেল। মহারাজ ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিলেন—'কম্পন, কাল থেকে তোমার অনেক পরিশ্রম হয়েছে। যাও, নিজ গৃহে বিশ্রাম কর গিয়ে।'

কম্পনদেব হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন—'আমার কিছু নিবেদন আছে আর্য।'

রাজা সপ্রশ্ন নেত্রে ভ্রাতার পানে চাহিলেন; তারপর বলিলেন—'এস।'

দুই ভ্রাতা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

বহু স্তম্ভযুক্ত রাজসভার আকৃতি নাট্যমণ্ডপের ন্যায়; তিন ভাগে সভাসদ্‌গণের আসন, চতুর্থ ভাগে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মঞ্চের উপর সিংহাসন। পাথরে গঠিত হর্ম্য, কিন্তু পাথর দেখা যায় না; কুড্য ও স্তম্ভের গাত্র সোনার তবকে মোড়া। মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ-সিংহাসনটি আয়তনে বৃহৎ, তিন চারি জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বসিতে পারে। সিংহাসনের পাশে সোনার দীপদণ্ড, সোনার পর্ণসম্পুট, সোনার ভৃঙ্গার। চারিদিকে সোনার ছড়াছড়ি। সেকালে এত সোনা বোধ করি ভারতের অন্যত্র কোথাও ছিল না।

দ্বিপ্রহরে সভাগৃহ শূন্য, সভাসদেরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা দেবরায় আসিয়া সিংহাসনের উপর কিংখাবের আসনে বসিলেন; তাঁহার ইঙ্গিতে কুমার কম্পন তাঁহার পাশে বসিলেন। দুইজনে পাশাপাশি বসিলে দেখা গেল তাঁহাদের আকৃতি প্রায় সমান; দশ বছর বয়সের পার্থক্যে যতটুকু প্রভেদ থাকে ততটুকুই আছে। এই সাদৃশ্যের সুযোগ লইয়া মহারাজ দেবরায় একটু কৌতুক করিতেন; বিদেশ হইতে কোনো নবাগত রাষ্ট্রদূত আসিলে তিনি নিজে সভায় না আসিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। রাষ্ট্রদূতেরা চোখে না দেখিলেও রাজার কীর্তিকলাপের কথা জানিতেন। তাঁহারা কুমার কম্পনকে রাজা মনে করিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেন—এত অল্প বয়সে রাজা এমন কীর্তিমান! রাজা এই তুচ্ছ কাপট্যে আমোদ অনুভব করিতেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট হইতেছিল; কুমার কম্পনের মনে সিংহাসনের প্রতি লোভ জন্মিয়াছিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রাজা ভ্রূ তুলিয়া ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিলেন। কুমার কম্পন তখন ধীরে ধীরে বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুনবর্মা নদী হইতে বিদ্যুন্মালাকে উদ্ধার করিয়াছিল, দুইজনে নির্জন দ্বীপে রাত্রি কাটাইয়াছে, পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইয়াছে। কুমার কম্পন একটু শ্লেষ দিয়া একটু রঙ চড়াইয়া সব কথা বলিতে লাগিলেন; শুনিতে শুনিতে রাজার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল।

বিবৃতির মাঝখানে লক্ষ্মণ মল্লপ এক সময় আসিয়া সিংহাসনের

পদমূলে পারসীক গালিচার উপর বসিলেন এবং কোনো কথা না বলিয়া নতমস্তকে কুমার কম্পনের কথা শুনিতে লাগিলেন। কুমার কম্পন তাঁহার আবির্ভাবে একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিয়া চলিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ ও কুমার কম্পনের মধ্যে ভালবাসা নাই, দু'জনেই দু'জনকে আড়-চক্ষে দেখেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মল্লপ রাজ্যের মহাসচিব, তাঁহার কাছে রাজকীয় কোনো কথাই গোপনীয় নয়।

কুমার কম্পন বিবৃতি শেষ করিয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমার বার্তা নিবেদন করলাম, এখন আপনার অভিরুচি।' তারপর লক্ষ্মণ মল্লপের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'আমার বিবেচনায় এ কন্যা বিজয়নগরের রাজবধূ হবার যোগ্যা নয়।'

রাজা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'তুমি যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে।'

কুমার কম্পন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিজের মনোগত অভিপ্রায় না জানাইয়া যতটা বলা যায় তাহা বলা হইয়াছে। আপাতত এই পর্যন্ত থাক।

রাজা ও মন্ত্রী পরস্পরের চোখে চোখ রাখিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর রাজা বলিলেন—'আপনি বোধ হয় কম্পনের কথা সবটা শোনেননি—'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'না শুনলেও অনুমান করতে পেরেছি।'

'আপনার কি মনে হয়?'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'ঘটনা সত্য বলেই মনে হয়, কিন্তু ইঙ্গিতটা অমূলক। আমি রাজকন্যাকে দেখেছি, আমার মনে কোনো সংশয় নেই।'

'কিন্তু—' রাজা থামিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'অর্জুনবর্মা নিশ্চয় দলের সঙ্গে এসেছে। তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'সেই ভাল। তাকে ডেকে পাঠান। আমি তাকে প্রশ্ন করব। আপনি তার মুখ লক্ষ্য করবেন।'

লক্ষ্মণ মল্লপ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, তারপর বাম হস্ত দিয়া দক্ষিণ করতলে তালি বাজাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পাশের দিক হইতে একজন চোবদার রক্ষী আসিয়া সিংহাসনের সম্মুখে রূপার ভল্ল নামাইয়া নতজানু হইল।

মন্ত্রী বলিলেন—'রাজকন্যাদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের নাম অর্জুনবর্মা। অতিথিশালা থেকে তাকে এখানে নিয়ে এস।'

রক্ষী ভল্ল হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী পুনশ্চ বলিলেন—'বেঁধে আনতে হবে না। সমাদর করে নিয়ে আসবে।'

রক্ষী বলিল—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

রাজা বলিলেন—'আমি বিরাম-গৃহে যাচ্ছি, সেখানে তাকে পাঠিয়ে দিও।'

রক্ষী বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

॥ তিন ॥

অতিথি-ভবনে বহুসংখ্যক পরিচারক নবাগতদের সেবার ভার লইয়াছিল। প্রথমে অতিথিরা শীতল তক্র পান করিয়া পথশ্রম দূর করিলেন; তারপর স্নান ও আহার। অতিথিরা অধিকাংশই আমিষাশী, বহুবিধ মৎস্য মাংসাদি সহযোগে জবারের রোটিকা ও ঘৃতপক্ক তণ্ডুল গ্রহণ করিলেন। বসরাজ নিরামিষ খাইলেন। তাঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, দধিমণ্ড ক্ষীর ফলমূল ও মিষ্টান্নের ভাগই অধিক।

প্রচুর আহার করিয়া সুবাসিত তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে সকলে অতিথি-ভবনের দ্বিতলে উপনীত হইলেন। দ্বিতলে সারি সারি অসংখ্য প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠগুলিতে শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। অতিথিগণ পরম আরামে সুকোমল শয্যায় লম্বমান হইলেন।

অর্জুনবর্মা একটি প্রকোষ্ঠে উপাধান মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিল। উপাধান হইতে স্নিগ্ধ-শীতল উশীরের গন্ধ নাকে আসিতেছে। উদর

তৃপ্তিদায়ক খাদ্যপানীয়ে পূর্ণ, মস্তিষ্কে নূতন কোনো চিন্তা নাই; অর্জুনবর্মা চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল। ক্রমে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

সহসা তন্দ্রার মধ্যে নিজের নাম শুনিয়া অর্জুনবর্মার ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, প্রকোষ্ঠের দ্বারমুখে এক ভল্লধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। অর্জুনবর্মা ত্বরিতে উঠিয়া বসিল।

রক্ষী দোপাট্টা দাড়ির মধ্যে হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'মহাশয়ের নাম কি অর্জুনবর্মা?'

অর্জুন বলিল—'হাঁ, কী প্রয়োজন?'

রক্ষী বলিল—'শ্রীমন্মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

অর্জুন বিস্মিত হইল; মহারাজ তাহার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে কেন স্মরণ করিলেন ভাবিয়া পাইল না। সে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—'চল।'

অতিথিশালা হইতে নামিয়া অর্জুন রক্ষীর সঙ্গে রাজসভার দিকে চলিল। আকাশে এখন সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে; কিন্তু এখনো বাতাস উত্তপ্ত, পৌরজন গৃহচ্ছায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। জনশূন্য পুরভূমি দিয়া যাইতে যাইতে রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল—'রাজাকে কীভাবে অভিবাদন করতে হয় আপনি জানেন তো?'

অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। সে কখনো রাজদরবারে যায় নাই, মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, জানি না।'

রক্ষী বলিল—'চিন্তা নেই, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সে মাটিতে ভল্ল রাখিয়া রাজ-বন্দনার প্রক্রিয়া দেখাইল। দুই হাত জোড় করিয়া মাথার ঊর্ধ্বে তুলিল, কটি হইতে ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্মুখে অবনত করিল, তারপর খাড়া হইয়া হাত নামাইল। বলিল—'রাজাকে এইভাবে অভিবাদন করতে হয়। পারবেন?'

অর্জুন অনুরূপ প্রক্রিয়া করিয়া দেখাইল। নূতনত্ব থাকিলেও এমন কিছু শক্ত নয়। রক্ষী তুষ্ট হইয়া বলিল—'ওতেই হবে।'

সভাগৃহের দ্বিতলে উঠিবার সোপান-মুখে শস্ত্র-হস্তা দুইটি তরুণী

প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। পুরুষ প্রহরীর অধিকার শেষ হইয়া এখান হইতে স্ত্রী-প্রহরীর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রহরিণীদ্বয় অর্জুনবর্মাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, রক্ষীকে প্রশ্ন করিল, তারপর পথ ছাড়িয়া দিল। রক্ষী নীচেই রহিল, অর্জুনবর্মা সঙ্কীর্ণ সোপান দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সোপান মধ্যপথে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে, মোড়ের কোণে অন্য একজন প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া অর্জুনবর্মা দ্বিতলে উঠিল। এখানে আরো দুইজন প্রহরিণী। তাহারা জানিত, অর্জুনবর্মা নামক এক ব্যক্তিকে রাজা আহ্বান করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে একজন অর্জুনকে রাজ-সমীপে উপনীত করিল।

রাজকক্ষটি আকারে যেমন বৃহৎ, উচ্চ দিকে তেমনি গোলাকৃতি ছাদযুক্ত; মুসলমান স্থাপত্যের প্রভাবে ভবনশীর্ষে গম্বুজ রচনার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। দেয়ালগুলি পুরু রেশমের কানাৎ দিয়া আবৃত; তাহার ফলে কক্ষটি দ্বিপ্রহরেও ঈষৎ ছায়াচ্ছন্ন ও নিরুত্তাপ হইয়া আছে। কক্ষের মধ্যস্থলে মণিমুক্তাজড়িত মর্মর-পালঙ্কে মহারাজ দেবরায় অর্ধশয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার মাথার দিকে মসৃণ শিলাকুট্টিমের উপর বসিয়া মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ কোনো দুরূহ চিন্তায় মগ্ন আছেন। পায়ের কাছে মেঝেয় বসিয়া পিঙ্গলা পান সাজিতেছে এবং মৃদুকণ্ঠে রাজাকে নবাগতা কলিঙ্গ-কুমারীদের কথা শুনাইতেছে।...রাজকুমারীরা স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন...কন্যা দুটি যেমন সুন্দরী তেমনি শীলবতী...প্রথমটি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, দ্বিতীয়টি সরলা হাস্যময়ী...

পিঙ্গলা সোনার তাম্বুলকরঙ্ক দুই হাতে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একটি পান তুলিয়া মুখে দিলেন, বলিলেন—'তুমি পান নাও, আর্য লক্ষ্মণকে দাও।'

রাজার সম্মুখে তাম্বুল চর্বণ পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তবে রাজা অনুমতি দিলে খাওয়া চলিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনো নিষেধ ছিল না, এমন কি নর্তকীরাও রাজার সম্মুখে পান খাইত।

লক্ষ্মণ মল্লপ পানের বাটা লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিলেন, তারপর শঙ্কুলা লইয়া নিপুণ হস্তে সুপারি কাটিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা বাটা হইতে একটি পান লইয়া মুখে পুরিল।

এই সময় অর্জুনবর্মা দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং শিক্ষানুযায়ী যুগ্মবাহু তুলিয়া রাজাকে বন্দনা করিল। রাজা তাহাকে কক্ষের মধ্যে আহ্বান করিলেন, সে আসিয়া পালঙ্কের সমীপে ভূমির উপর পা মুড়িয়া বসিল। তাহার মেরুদণ্ড ঋজু হইয়া রহিল; দেহভঙ্গিতে দীনতা নাই, আবার ঔদ্ধত্যও নাই।

রাজা পিঙ্গলাকে ইঙ্গিত করিলেন, সে পাশের একটি কানাৎ-ঢাকা দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কক্ষে রহিলেন রাজা, লক্ষ্মণ মল্লপ এবং অর্জুনবর্মা।

লক্ষ্মণ মল্লপ শঙ্কুলায় কুচকুচ শব্দ করিয়া সুপারি কাটিতেছেন, যেন অন্য কিছুতেই তাঁহার মন নাই। রাজা নিবিষ্ট চক্ষে অর্জুনকে দেখিলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'তোমার নাম অর্জুনবর্মা?'

অর্জুন ইতিপূর্বে দূর হইতে মহারাজ দেবরায়কে একবার দেখিয়াছিল, এখন মুখোমুখি বসিয়া সে তাঁহার পরিপূর্ণ অনুভাব উপলব্ধি করিল। রাজা দেখিতে শান্তশিষ্ট, কিন্তু তাঁহার একটি বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব আছে যাহার সম্মুখীন হইলে অভিভূত হইতে হয়। অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'আজ্ঞা, মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'তুমি ক্ষত্রিয়। রাজকন্যাদের নৌকায় যোদ্ধা রূপে এসেছ?'

অর্জুন বলিল—'আমি রাজকন্যাদের সঙ্গে কলিঙ্গ থেকে আসিনি মহারাজ।'

রাজা ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলেন—'সে কি রকম?'

অর্জুন তখন গুলবর্গা ত্যাগের বিবরণ বলিল। রাজা শুনিলেন; লক্ষ্মণ মল্লপ শঙ্কুলা থামাইয়া অর্জুনের মুখের উপর সন্ধানী চক্ষু স্থাপন করিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে রাজা বলিলেন—'চমকপ্রদ কাহিনী! তোমার পিতার নাম কি?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'আমার পিতার নাম রামবর্মা।'

রাজা একবার মন্ত্রীর দিকে অলসভাবে চক্ষু ফিরাইলেন, লক্ষ্মণ মল্লপের শঙ্কুলা আবার সচল হইল।

রাজা বলিলেন—'ভাল।—সংবাদ পেয়েছি কাল ঝড়ের সময় তুমি রাজকন্যাকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলে। তুমি উত্তম সন্তরক, কিভাবে রাজকুমারীকে উদ্ধার করলে আমাকে শোনাও।'

রাজার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে অর্জুন কোনো কূট উদ্দেশ্য দেখিতে পাইল না, সে সরলভাবে রাজকন্যা উদ্ধারের বৃত্তান্ত বলিল। তাহার মনে পাপ ছিল না, তাই কোনো কথা গোপন করিল না; নিজের কৃতিত্ব যথাসম্ভব লঘু করিয়া বলিল। রাজা ও মন্ত্রী তাহার মুখের উপর নিশ্চল চক্ষু স্থাপন করিয়া শুনিলেন।

বৃত্তান্ত শেষ হইলে রাজা কিছুক্ষণ প্রীতমুখে নিজ কর্ণের মণিকুণ্ডল লইয়া নাড়াচাড়া করিলেন, তারপর বলিলেন—'তোমার কাহিনী শুনে পরিতুষ্ট হয়েছি। তোমার সৎসাহস আছে, বিপদের সম্মুখীন হয়ে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয় না। তুমি বিজয়নগরে বাস করতে চাও, ভাল কথা। কোন্ কাজ করতে চাও?'

অর্জুন জোড়হস্তে বলিল—'মহারাজ, আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে আপনার বিপুল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিন।'

রাজা বলিলেন—'সৈন্যদলে যোগ দিতে চাও? ভাল ভাল।—কিন্তু বর্তমানে তুমি কলিঙ্গ-সমাগত অতিথিদের অন্যতম। আপাতত বিজয়নগরের রাজ-আতিথ্যে থেকে আহার-বিহার কর। তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে। এই স্বর্ণমুদ্রা নাও। তুমি রাজকুমারীর প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি।'

রাজার পালঙ্কের উপর উপাধানের পাশে এক মুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা রাখা ছিল; ছোট বড় অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা। রাজা একটি বড় মুদ্রা লইয়া অর্জুনকে দিলেন, অর্জুন কপোতহস্তে গ্রহণ করিল।

রাজা বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, অর্জুনবর্মাকে পান দিন।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বাটা হইতে অর্জুনকে পান দিলেন। অর্জুন জানে

না যে পান দেওয়ার অর্থ বিদায় দেওয়া, সে পান মুখে দিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজসকাশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। লক্ষ্মণ মল্লপ তাহা বুঝিয়া হাতে তালি বাজাইলেন। প্রহরিণী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন্ত্রী বলিলেন—'অর্জুনবর্মাকে পথ দেখাও।'

অর্জুন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্বের ন্যায় উদ্বাহু প্রণাম করিয়া প্রহরিণীর সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাজা ও মন্ত্রী কিছুক্ষণ আত্মস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন; কেবল মন্ত্রীর হাতের যন্ত্রিকা কুচকুচ শব্দ কবিয়া চলিল।

অবশেষে রাজা লক্ষ্মণ মল্লপের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'কুমার কম্পন তিলকে তাল করেছেন। অর্জুনবর্মার মন নিষ্পাপ, সুতরাং রাজকন্যাও নিষ্পাপ।'

রাজা কহিলেন—'আপনি যথার্থ বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়। কম্পন ছেলেমানুষ, রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছে। কিন্তু তবু—বিবাহোন্মুখী কন্যাকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান যদি কিছু থাকে—'

মন্ত্রী বলিলেন—'উত্তম কথা। গুরুদেবের উপদেশ নেওয়া যাক।'

অতএব রাজগুরু আর্য কূর্মদেবকে রাজার প্রণাম পাঠানো হইল। কূর্মদেব একটি তৃণাসন হস্তে উপস্থিত হইলেন। শীর্ণকায় পলিতশীর্ষ ব্রাহ্মণ, রাজা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইলেন। কূর্মদেব স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া শিলাকুট্টিমের উপর তৃণাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজাও ভূমিতে বসিলেন।

সমস্যার কথা শুনিয়া কূর্মদেব কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া মৌনভাবে রহিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি হইলেও তিনি শাস্ত্রকে শস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন না, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন না। তিনি চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—'দোষ হয়েছে, কিন্তু গুরুতর নয়। বিবাহোন্মুখী কন্যাকে সাধু উদ্দেশ্যে পরপুরুষ স্পর্শ করলে তাদৃশ দোষ হয় না। তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বিবাহ তিন ঋতুকাল বন্ধ থাকবে।

এই তিন মাস কন্যা প্রত্যহ প্রাতে অবগাহন স্নান করে পম্পাপাতির মন্দিরে স্বহস্তে পূজা দেবেন। তাহলেই তাঁর পাপ-মুক্তি হবে। তখন বিবাহ হতে পারবে। শ্রাবণ মাসে আমি বিবাহের তিথি নক্ষত্র দেখে রাখব।'

গুরুর ব্যবস্থা রাজার মনঃপূত হইল। বিবাহ তিন মাস পরে হইলে ক্ষতি কি? বরং এই অবকাশে ভাবী বধূর সহিত মানসিক পরিচয়ের সুযোগ হইবে। ইতিমধ্যে কন্যার পিতা গজপতি ভানুদেবকে সংবাদটা জানাইয়া দিলেই চলিবে।

রাজা বলিলেন—'যথা আজ্ঞা গুরুদেব।'

দুই দণ্ড পরে গুরুদেব বিদায় লইলেন। তখন রাজা ও মন্ত্রী নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে বসিলেন।

॥ চার ॥

অর্জুনবর্মা সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া অতিথি-ভবনে ফিরিয়া আসিল। রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ; সে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আবার শয্যায় শয়ন করিল। রাজদত্ত পানটি মুখে মিলাইয়া গিয়াছে, কেবল একটি অপূর্ব স্বাদ মুখে রাখিয়া গিয়াছে। মন নিরুদ্বেগ, রাজা তাহাকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিবেন; বিদেশে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা থাকিবে না। শুইয়া শুইয়া অর্জুনের দেহমন মধুর জড়িমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

দুই দণ্ড পরে তন্দ্রা-জড়িমা কাটিলে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া আলস্য ত্যাগ করিল। দেখিল, পরিচারক কখন তাহার শয্যাপাশে এক প্রস্থ নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে দিনের তাপও অনেকটা কমিয়াছে, অপরাহ্ণ সমাগত। অর্জুন নববস্ত্র পরিধান করিয়া, রাজার উপহার স্বর্ণমুদ্রাটি উত্তরীয়প্রান্তে বাঁধিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইল।

রাজ-পুরভূমির উত্তর অংশে রাজকীয় টঙ্কশালার পাশ দিয়া পান-

সুপারি রাস্তা আরম্ভ হইয়া সিধা পূর্বদিকে গিয়াছে; এই পথ প্রস্থে চল্লিশ হস্ত, দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ শত হস্ত। ইহাই বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ। পান-সুপারি রাস্তা নাম হইলেও পান-সুপারির দোকান এখানে অল্পই আছে। এই রাস্তার দুই পাশ জুড়িয়া আছে সোনা-রূপা হীরা-জহরতের দোকান। প্রধান রাজপুরুষদের অট্টালিকা, নগর-বিলাসিনীদের রঙ্গ-ভবন। ছোটখাটোর মধ্যে আছে মিঠাই অঙ্গদি, ফুলের দোকান, শরবতের দোকান।

সায়ংকালে পান-সুপারি রাস্তায় উচ্চকোটির নাগরিক নাগরিকার সমাগম হইয়াছে। যানবাহন বেশী নাই, পদচারীই অধিক। সকলের পরিধানে বিচিত্র সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার। তাহাদের ত্বরা নাই, সকলে মন্থর চরণে চলিয়াছে। কেহ পানের দোকানে পান কিনিয়া খাইতেছে, কেহ পানশালায় শীতল শরবত পান করিতেছে; মেয়েরা ফুল কিনিয়া কণ্ঠে কবরীতে পরিতেছে। বিলাসিনীদের গৃহের সম্মুখে যুবকদের যাতায়াত একটু বেশি। বিলাসিনীরা গৃহসম্মুখে উচ্চ চত্বরের উপর কাষ্ঠাসনে বসিয়াছে, তাহাদের দেহের উচ্ছলিত যৌবন সূক্ষ্ম অচ্ছাভ মল্লবস্ত্রে ঈষদাবৃত। কাহারো কবরীতে দাসী চাঁপা ফুলের মালা জড়াইয়া দিতেছে; কেহ তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া পরিচারিকাদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিতেছে। তাহাদের বিদ্যুৎবিলাসের ন্যায় হাস্য-কটাক্ষ মুগ্ধ পথিকজনের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে।

অর্জুনবর্মা অলসপদে চলিয়াছিল। চলিতে চলিতে সে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিল। বিজয়নগরের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বড় কেহ নাই, সকলেরই গায়ের রঙ অরুণাভ গৌর হইতে কচি কলাপাতার মত কোমল হরিৎ পাণ্ডু, মেয়েরা সুগঠনা ও লাবণ্যবতী। এদেশের স্ত্রীপুরুষ কেহই পাদুকা পরিধান করে না; এমন কি রাজা যতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে থাকেন তিনিও পাদুকা ধারণ করেন না। গুলবর্গায় মুসলমানেরা চামড়ার শুঁড়-তোলা নাগরা পরে; দেখাদেখি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও নাগরা পরে। এদেশে কেবল তুরাণী তীরন্দাজেরা স্থূল বৃষচর্মের কোঁজী জুতা পরে। এখানে মাথায় টুপী বা পাগড়ী

পরার রেওয়াজ নাই, তুরাণীরা ছাড়া সকলেই নগ্নশির। এখানে নারীদের পর্দা বা অবগুণ্ঠন নাই; তাহারা সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত পথে বাহির হয়, তাহাদের চোখের দৃষ্টি নম্র অথচ নিঃসঙ্কোচ; তাহারা পরপুরুষ দেখিয়া ভয় পায় না। অর্জুনের বড় ভাল লাগিল।

ফুলের মিশ্র সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অর্জুন এক ফুলের দোকানে উপস্থিত হইল। মালিনী একটি গৃহের সম্মুখভাগে প্রশস্ত বাতায়নের ন্যায় স্থানে বসিয়া ফুল বিক্রয় করিতেছে। গ্রীষ্মকালে বকমারি ফুলের অভাব। বিজয়নগর গোলাপ ফুলের জন্য বিখ্যাত; সেই গোলাপ ফুলের মরশুম শেষ হইয়াছে; তবু দুই-চারিটা রক্তবর্ণ গোলাপ দোকানে আছে। স্তূপীকৃত সোনার বরণ চাঁপা ফুল আছে; আর আছে জাতী যূথী কাঞ্চন অশোক। বাতায়নের তোরণ হইতে সারি সারি নবমল্লিকার মালা ঝুলিতেছে। মালিনী বসিয়া মাল্যরচনা করিতেছিল, অর্জুন বাতায়নের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই মালিনী চোখ তুলিয়া চাহিল। অর্জুন বলিল—'মালা চাই।'

মালিনী একটু প্রগল্‌ভা, মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—'কার জন্যে মালা চাই? নিজের জন্যে, না নাগরীর জন্যে।'

অর্জুনও হাসিল। বলিল—'আমি বিদেশী, নাগরী কোথায় পাব। নিজের জন্যে মালা।'

মালিনী ঘাড় কাৎ করিয়া অর্জুনকে দেখিল—'বিজয়নগরে নাগরীর অভাব নেই। তোমার কোমরে টঙ্কা আছে তো?'

উত্তরীয়ের খুঁট হইতে সোনার টঙ্কা খুলিয়া অর্জুন দেখাইল—'এই আছে।'

দেখিয়া মালিনীর চক্ষু একটু বিস্ফারিত হইল, সে বলিল—'তবে আর তোমার ভাবনা কি, ও দিয়ে সব কিনতে পার। কি চাই বল।'

অর্জুন বলিল—'আপাতত একটা মালা হলেই চলবে।'

মালিনী তখন দোদুল্যমান মাল্যশ্রেণী হইতে একটি মালা লইয়া অর্জুনকে দেখাইল। যূথী ও অশোক ফুলে গ্রথিত মালা; মালিনী

বলিল—'এটা হলে চলবে? এর মূল্য তিন দ্রম্ম। এর চেয়ে ভাল মালা আমার দোকানে নেই।'

অর্জুন বলিল—'ওতেই হবে।'

মালিনী দীর্ঘ মালাটির দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া বলিল—'এস, গলায় পরিয়ে দিই।'

অর্জুন মালিনীর কাছে গিয়া গলা বাড়াইয়া দাঁড়াইল, মালিনী মালা গোল করিয়া তাহার গ্রীবার পিছনে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিল। তারপর পিছনে সরিয়া গিয়া অর্জুনকে পরিদর্শনপূর্বক বলিল—'বেশ দেখাচ্ছে।'

অপরিচিতা যুবতীর সহিত এরূপ লঘু হাস্যালাপ অর্জুনের জীবনে এই প্রথম। সে হাসিমুখে মালিনীকে স্বর্ণমুদ্রা দিল। মালিনী তাহার আসনের তলদেশ হইতে এক মুঠি রূপা ও তামার মুদ্রা লইয়া হিসাব করিয়া অর্জুনকে ফেরৎ দিল, বলিল—'গুনে নাও।'

অর্জুন মাথা নাড়িল। এ দেশের মুদ্রামান সম্বন্ধে তাহার কোনোই ধারণা নাই। সে ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি চাদরের খুঁটে বাঁধিল। মালিনী মিষ্ট হাসিয়া বলিল—'আবার এসো।'

অর্জুন পিছু ফিবিতেই একটি লোকের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি হইয়া গেল। শীর্ণ আকৃতি, বৈশিষ্ট্যহীন মুখ; বোধহয় ফুল কিনিতে আসিয়াছে। অর্জুন তাহাকে পাশ কাটাইয়া রাস্তায় উপনীত হইল এবং পূর্বমুখে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অর্জুন দেখিল, রাস্তার ধারে একদল লোক জমা হইয়াছে, তাহাদের মাঝখানে কিরাতবেশী একজন লোক। কিরাতের মাথায় কড়ির টুপী, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটি উগ্রমূর্তি বাজপাখী বসিয়া আছে, ডান হাতে খাঁচার মধ্যে একটি ধূম্রবর্ণ পারাবত। লোকটি সুর করিয়া বলিতেছে—'আমার বাজপাখী আমার পায়রাকে খুব ভালবাসে, পায়রা বাজপাখীর বৌ। কিন্তু বৌ-এর স্বভাব ভাল নয়, সে মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাজপাখী তখন বৌকে খুঁজতে বেরোয়। দেখবে? ছাখো ছাখো, মজার খেলা দেখ।'

ইতিমধ্যে আরো দু'চারজন দর্শক আসিয়া জুটিয়াছিল। কিরাত খাঁচা খুলিয়া পারাবতকে উড়াইয়া দিল, পারাবত ফট্‌ফট্‌ শব্দে আকাশে উঠিয়া পশ্চিমদিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন কিরাত বাজপাখীর পায়ের শিকল খুলিয়া তাহাকেও ছাড়িয়া দিল। বাজপাখী আতসবাজির ন্যায় সিধা শূন্যে উঠিয়া গেল, রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া দূরে পলায়মান পারাবতকে দেখিল, তারপর ঝটিকার বেগে তাহার অনুসরণ করিল।

দর্শকেরা ঘাড় তুলিয়া এই আকাশ-যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। পারাবত পলাইতেছে, কিন্তু বাজপাখীর গতিবেগ তাহার চতুর্গুণ; অচিরাৎ বাজপাখী পারাবতের নিকট উপস্থিত হইল। পারাবত আঁকিয়া বাঁকিয়া নানাভাবে উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বাজপাখী তাহার উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে দুই পা বাড়াইয়া তাহাকে নখে চাপিয়া ধরিল, তারপর আপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে নির্জীব পারাবতকে কিরাতের কাছে ফিরাইয়া আনিল। কিরাত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'দেখলে? দেখলে? আমার বাজপাখী নষ্ট-দুষ্ট বৌকে কত ভালবাসে! ছাখো, বৌ-এর গায়ে নখের আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি!'

সকলে হাসিয়া উঠিল। অর্জুন খেলা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিল, সে কিরাতের সামনে একটা তাম্রমুদ্রা ফেলিয়া দিয়া পিছন ফিরিল।

এই সময় সেই শীর্ণ লোকটার সঙ্গে তাহার আবার মুখোমুখি হইয়া গেল। লোকটা অলক্ষিতে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্জুন মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। ফুলের দোকানে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল, আবার এখানে দেখা। লোকটা কি তাহার মতই নিরুদ্দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

অর্জুন আবার পূর্বদিকে চলিল। তাহার ইচ্ছা কিল্লাঘাটে গিয়া দেখিয়া আসে বলরাম কর্মকার ভাঙ্গা বহিত্র লইয়া কী করিতেছে। কিন্তু এদিকে দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, কিল্লাঘাটে পৌঁছিতেই রাত্রি হইয়া যাইবে। তখন আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। আহা,

যদি লাঠি ছ'টো থাকিত! যা হোক কাল প্রভাতেই সে বলরামকে দেখিতে যাইবে।

ক্রমে অর্জুন পান-সুপাবি রাস্তাব পূর্ব সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে সাধারণ লোকালয়েব আবম্ভ; গৃহগুলি উত্তম বটে, কিন্তু পান-সুপারি রাস্তার মত নয়, পথও অপেক্ষাকৃত অপ্রসর। দক্ষিণ দিক হইতে অন্য একটি পথ আসিয়া এইখানে তেমাথা রচনা কবিয়াছে। তাবপব কিল্লাঘাটেব দিকে চলিয়া গিযাছে।

অর্জুন এই পথে কিছুদূব অগ্রসব হইল। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনীভূত হইতেছে, সে আব বেশি দূব না গিযা সেখান হইতেই ফিরিল। অন্ধকাব হইবাব পূর্বেই অতিথি-ভবনে ফিবিতে হইবে।

এইখানে তৃতীয় বাব সেই শীর্ণ লোকটিব সঙ্গে তাহার দেখা হইল। লোকটি অর্জুনেব পশ্চাতে কিয়দ্দূবে আসিতেছিল, অর্জুন ফিরিতেই সেও ফিবিয়া আগে আগে চলিতে আবম্ভ কবিল। অর্জুন আশ্চর্য হইয়া ভাবিল, কী ব্যাপার! এই লোকটিকেই বাব বাব দেখিতেছি কেন! তবে কি লোকটি আমাবই পিছনে লাগিয়াছে? কিন্তু কেন?

তেমাথাব কাছাকাছি ফিবিয়া আসিয়া অর্জুন দেখিল, ইতিমধ্যে সেখানে প্রকাণ্ড একটা হাতীকে ঘিবিয়া ভিড় জমিয়াছে; হাতীর কাঁধে মাহুত বসিয়া আছে। লোকটি ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। অর্জুনও জনতার কিনারায় উপস্থিত হইয়াছে এমন সময় ভিতর হইতে চড়চড় শব্দে কাড়া বাজিয়া উঠিল। তাবপব পরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'বিজয়নগরে শত্রুব গুপ্তচর ধবা পড়েছে—রাজাদেশে তার প্রাণদণ্ড হবে—বিজয়নগবে শত্রুর গুপ্তচরের কী দুর্দশা হয় তোমরা প্রত্যক্ষ কর।'

অর্জুন গলা বাড়াইয়া দেখিল। চক্রব্যূহের মাঝখানে হাত-পা বাঁধা একটা মানুষ চিৎ হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। বাদ্যকর ঘোষক হাতীর মাহুতকে ইশারা করিল, মাহুত হাতী চালাইল। হাতী আসিয়া ভূপতিত লোকটার বুকের উপর পা চাপাইয়া দিল।

অর্জুন আর সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিল।

এরূপ দৃশ্য গুলবর্গায় সে অনেক দেখিয়াছে। বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে শান্তি চলিতেছে বটে, কিন্তু উভয় পক্ষই শত্রু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে তৎপর। গুপ্তচর যখন ধরা পড়ে তখন এই বিকট শাস্তিই তাহার প্রাপ্য।

রাজপুরীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া অর্জুন একটু পিপাসা অনুভব করিল। পাশেই একটি পানশালা। সে সত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পালিকাকে বলিল—'শীতল তাক্ দাও, ক্ষার তক্র।'

সত্রপালিকাটি যুবতী। এখানে পানেব দোকানে, ফুলের দোকানে, পানশালা ইত্যাদি ছোট ছোট দোকানে যুবতীরাই বেসাতি করে। এই যুবতীটি অর্জুনকে একটু ভাল করিয়া দেখিল, তারপর মৃৎপাত্রে লবণাক্ত কপিত্থ-সুরভিত তক্র পান কবিতে দিল।

তক্র পান করিয়া অর্জুনের শবীব ও মন দুই-ই স্নিগ্ধ হইল। সে নিঃশোষিত মৃৎপাত্র ফেলিয়া দিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—'মূল্য কত?'

যুবতী অর্জুনকে লক্ষ্য করিতেছিল। বোধহয় তাহার বেশবাসে কিছু বিশেষত্ব দেখিয়া থাকিবে। সে বলিল—'তুমি বিদেশী, আজ কি তুমি কলিঙ্গ-রাজকন্যাদের সঙ্গে এসেছ?'

অর্জুন বলিল—'হ্যাঁ।'

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল—'তাহলে দাম নেব না। তুমি আজ আমাদের অতিথি।'

অর্জুন কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাবপর স্মিতমুখে 'ধন্য' বলিয়া বাহির হইল।

আকাশে রাত্রিব পক্ষচ্ছায়া পড়িয়াছে। পথের দুই পাশে ভবন-গুলিতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চলিতে চলিতে অর্জুন চক্ষু তুলিয়া দেখিল, দূরে পশ্চিম দিকে হেমকূট পর্বতের মাথায় অগ্নি-স্তম্ভ জ্বলিয়া উঠিল।

আরো কিছুদূর গিয়া সে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার দেহ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এমন অনুভূতি সে পূর্বে কখনো পায় নাই।

তাহার মনে হইল এতদিনে সে নিজের দেশ খুঁজিয়া পাইয়াছে। এই বিজয়নগরই তাহার স্বদেশ, তাহার স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতৃভূমি। অগ্নিশীর্ষ হেমকূটের পানে চাহিয়া তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

অর্জুন জানিত না যে, মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।

॥ পাঁচ ॥

রাজপুরীতে বেলাশেষের প্রহর বাজিলে মহারাজ দেবরায় আপরাহ্ণিক সভা ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সভায় পাত্র অমাত্য সভাসদ্ ছাড়াও ইরাণ দেশের রাজদূত আবদর রজ্জাক ছিলেন। আরো কয়েকটি রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাজের কথা কিছু হইতেছিল না। রাজসভায় কেবল রাজনীতির আলোচনাই হয় না, হাস্য-পরিহাস গল্প-গুজবও হয়। সকলে রাজাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন।

দ্বিতলের বিরাম মন্দিরে গিয়া রাজা প্রথমে কেতকী-সুরভিত জলে স্নান করিলেন। তারপর আহারে বসিলেন। কিঙ্করীরা কক্ষে অসংখ্য ঘৃত-দীপ ও অগুরুবর্তি জ্বালিয়া দিল। দুই-হস্ত পরিমাণ চতুষ্কোণ একটি কাষ্ঠ-পীঠিকা তিনজন কিঙ্করী ধরাধরি করিয়া মহারাজের পালঙ্কের পাশে রাখিল। অনুচ্চ পীঠিকার উপর বৃহৎ স্বর্ণ থালী, থালীর উপর অগণিত সোনার পাত্রে বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন। মহারাজ আচমন করিয়া আহারে মন দিলেন। পিঙ্গলা ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কঞ্চুকী হেমবেত্র হস্তে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পরিদর্শন করিতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে দেবরায় পিঙ্গলার দিকে চক্ষু তুলিলেন—'কলিঙ্গ-কুমারীদের খাওয়া হয়েছে?'

পিঙ্গলা বীজন করিতে করিতে বলিল—'না, আর্য। তাঁরা অন্য রানীদের মত মহারাজের আহার শেষ হলে আহারে বসবেন।'

মহারাজ আর কিছু বলিলেন না।

আহারান্তে একটি দাসী জলের ভৃঙ্গার হইতে মহারাজের হাতে জল ঢালিয়া দিল, মহারাজ হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন।

অতঃপর কঞ্চুকী ও দাসী কিঙ্করীরা রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। কেবল পিঙ্গলা রহিল।

পিঙ্গলার হাত হইতে পান লইয়া দেবরায় শয্যায় অর্ধশয়ান হইলেন, বলিলেন—'পিঙ্গলে, তুমি দেবীদের সংবাদ পাঠিয়ে দাও যে, আমার নৈশাহার শেষ হয়েছে—'

'আজ্ঞা মহারাজ।'

—'আর দেবী পদ্মালয়াকে জানিয়ে দিও যে, আজ রাত্রে আমি তাঁর অতিথি হব।'

পিঙ্গলা অস্ফুট কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাইল, তারপর মহারাজকে পদস্পর্শ প্রণাম করিয়া রাত্রির মত বিদায় লইল।

রাজা কবে কোন রানীর মহলে রাত্রিবাস করিবেন তাহা অতিশয় গোপনীয় কথা, পূর্বাহ্নে কেহ জানিতে পারিত না। শেষ মুহূর্তে রাজা অন্তরঙ্গকে জানাইয়া দিতেন। রাজাদের জীবন সর্বদাই বিপদসঙ্কুল, বিশেষত রাত্রিকালে গুপ্তঘাতকের আশঙ্কা অধিক; তাই রাজা কোথায় রাত্রি যাপন করিবেন তাহা যথাসম্ভব গোপন রাখিতে হয়।

রাজার মহল হইতে বাহির হইয়া পিঙ্গলা পাকশালা অতিক্রমপূর্বক কলিঙ্গ-কুমারীদের মহলে উপস্থিত হইল। এই মহলে গম্বুজশীর্ষ বৃহৎ একটি কক্ষ ঘিরিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। একটি প্রকোষ্ঠে রাজকন্যাদের নৈশাহারের আয়োজন হইয়াছে। কয়েকজন দাসী কাষ্ঠপীঠিকায় অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। রাজকুমারীরা বড় ঘরে আছেন। পিঙ্গলা সেখানে গিয়া যুক্তকরে বলিল—'মহারাজের নৈশাহার সম্পন্ন হয়েছে, এবার আপনারা বসুন।'

দুই রাজকন্যা ভোজনকক্ষে গমন করিলেন। কাষ্ঠপীঠিকার দুই

পাশে রেশমের আসন পাতা। রাজকন্যারা তাহাতে বসিলেন। চারজন পরিচারিকা তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিল। পিঙ্গলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর বলিল—'অনুমতি করুন, আমি অন্য রানীদের সংবাদ দিতে যাই। সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা আহারে বসবেন না।'

বিদ্যুন্মালা উদাসমুখে নীরব রহিলেন, মণিকঙ্কণা মৃদু হাসিয়া বলিল—'এস।'

'এই দাসীরা আপনাদের সেবা করবে; কাল প্রাতে আমি আবার আসব।' পিঙ্গলা যুক্তকরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দুই ভগিনী নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। বিদ্যুন্মালা নামমাত্র আহার করিলেন, মণিকঙ্কণা প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনের স্বাদ লইয়া খাইল। দুইজনের মনের গতি ভিন্নমুখী। বিদ্যুন্মালার মনে সুখ নাই; মহারাজ দেবরায়ের সুন্দর কান্তি এবং সদয় ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মন আরো বিকল হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যবিধাতা যেন এক হাতে সব দিয়া অন্য হাতে সব হরণ করিয়া লইতেছেন। মণিকঙ্কণার মনে কিন্তু বসন্তের বাতাস বহিতেছে। আশঙ্কার ঝড়-বাদল অপগত হইয়া হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে।

দাসীদের সম্মুখে কোনো কথা হইল না, আহার সমাপন করিয়া রাজকন্যারা শয়নকক্ষে গেলেন। কক্ষের দুই পাশে প্রকাণ্ড দু'টি পালঙ্কের উপর শয্যা, শয্যার উপর জাতীপুষ্প বিকীর্ণ। মৃগমদ গন্ধে কক্ষ আমোদিত। মণিকঙ্কণা দাসীদের বলিল—'তোমরা যাও, আর তোমাদের প্রয়োজন হবে না।'

একটি দাসী বলিল—'যে আজ্ঞা, রাজকুমারী। দ্বারের বাইরে প্রতিহারিণীরা [illegible] রহিল, যদি প্রয়োজন হয়, হাততালি দেবেন।'

দাসীরা প্রস্থান করিলে মণিকঙ্কণা [illegible] পালঙ্কে শুবি?'

পাশেই অতিথি-ভবন। একটি যুবক অতিথি-ভবন হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে যুবতী-প্রবাহ দেখিয়া পথপার্শ্বে থামিয়া গেল। তারপর সে যুবতীদের মধ্যে রাজকন্যাদের দেখিতে পাইল।

রাজকন্যারাও যুবককে দেখিয়াছিলেন এবং চিনিতে পারিয়াছিলেন। অর্জুনবর্মা। সে সসম্ভ্রমে দুই কর যুক্ত করিল। রাজকন্যাদের গতি স্থগিত হইল না, কিন্তু মণিকঙ্কণা চকিত হাস্যে দশনপ্রান্ত ঈষৎ উন্মোচিত করিল। বিদ্যুন্মালা হাসিলেন না, তাঁহার মুখখানি রক্ত সঞ্চারে একটু উত্তপ্ত হইল মাত্র। কেহ জানিল না যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ক্ষণিকের জন্য দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে।

অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল, স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেলেন। অর্জুন একটু ইতস্তত করিল; একবার তাহার ইচ্ছা হইল রাজকুমারীর অনুসরণ করে, তিনি প্রতিহারিণী পরিবৃত হইয়া কোথায় যাইতেছেন দেখিয়া আসে। কিন্তু না, তাহা শোভন হইবে না। সে দৃঢ়পদে অন্য পথে চলিল।

আজ সকালে সে বলরামকে দেখিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল। পথে নামিয়াই রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাহার মন ক্ষণেকের জন্য বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এখন সে আবার মন সংযত করিয়া কিল্লাঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রভাতকালে নগরীর রূপ অন্য প্রকার; যেন সদ্য ঘুম-ভাঙা আলস্য-নিমীল রূপ। পান-সুপারি রাস্তায় লোক চলাচল বেশি নাই। দোকানপাট ধীরমন্থর চালে খুলিতেছে।

কিছুদূর চলিবার পর অর্জুন অকারণেই একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল। সেই শীর্ণ লোকটা তাহার পিছনে আসিতেছে; নিজের মুখাবয়ব ঢাকা দিবার জন্যই বোধ হয় মাথায় একটা [illegible] পরিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাহার স্বরূপ ঢাকা পড়ে নাই।

[illegible] কি চায় লোকটা?' তাহার [illegible] কোনও উদ্দেশ্য? একবার

অর্জুনের ইচ্ছা হইল ফিরিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে—কী চাও তুমি? কিন্তু তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে; অর্জুন এ দেশে নবাগত, কাহারো সহিত কলহ করিতে চায় না। সে লোকটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্য কথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল।

ভাবনার বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না। পিতা সুদূর গুলবর্গায় কি করিতেছেন; সত্যই কি সুলতান তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; পিতা কি অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন?...এই দেশটি তাহার ভাল লাগিয়াছে; এই দেশকে নিজের দেশ ভাবিয়া সে সুখী হইয়াছে; সে কি দেশের সেবা করিতে পারিবে? রাজা কি তাহাকে সৈনিকের কার্য দিবেন?—এই সকল চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার স্নিগ্ধগম্ভীর মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাজকুমারীর মনে গর্ব-অভিমান নাই, অর্জুনের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির জীবনকথা শুনিতেও তাঁহার আগ্রহ। ঈশ্বর কৃপায় তিনি রাজেন্দ্রাণী হইয়া সুখে থাকুন—

অর্জুন যখন কিল্লাঘাটে পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহরের বিলম্ব নাই। ঘাটে দুই তিনটি গোলাকৃতি খেয়া-তরী ছিল, সে একটি ভাড়া লইয়া বানচাল বহিত্রগুলির দিকে চলিল। বহিত্র যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমটির নিকট গিয়া অর্জুন তাহার ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ পাইল না। তখন সে দ্বিতীয়টির নিকটে গেল। এই বহিত্রটির খোলের ভিতর হইতে ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ আসিতেছে। সে বহিত্রের গায়ে নৌকা ভিড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—'বলরাম!'

ঠুক্‌ঠাক্‌ বন্ধ হইল। মুহূর্ত পরে খোলের ভিতর হইতে বলরাম কর্মকার পাটাতনে উঠিয়া আসিল, অর্জুনকে দেখিয়া একগাল হাসিল—'এস এস, বন্ধু, এস। রাজভোগ ছেড়ে পালিয়ে এলে যে!'

'তোমাকে দেখতে এলাম'—অর্জুন বহিত্রের [illegible] পাটাতনে উঠিল—'আমার [illegible]

'আছে। আমি যত্ন করে রেখেছি। চল, ছায়ায় যাই, এখানে বড় রৌদ্র।'

দুইজনে চিপিটক মামার রইঘরে গিয়া বসিল। মামার তৈজসপত্র পড়িয়া আছে, কেবল মামা নাই। দু'জনে কিছুক্ষণ ঝড়ের সন্ধ্যার সংবাদ বিনিময় করিল, শেষে অর্জুন বলিল—'বহিত্র কি বেশি জখম হয়েছে?'

বলরাম বলিল—'জখম বেশি হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা সূত্রধরেরা মেরামত করতে পারবে। কিন্তু তিনটি বহিত্রই চড়ায় আটকে গিয়েছে, যতদিন না বর্ষায় নদীর জল বাড়ছে ততদিন ওরা ভাসবে না।'

'তোমার কাজ শেষ হয়েছে?'

'আমার কাজ বেশি ছিল না। গোটা কয়েক লোহার কীলক তৈরি করে দিয়েছি, বাকি কাজ সূত্রধরেরা করবে।'

'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে বিজয়নগরে চল-না।'

'বেশ, চল। কিন্তু এখানে আহার তৈরি, খেয়ে নিয়ে বেরুনো যাবে। রান্না অবশ্য বেশি নয়, ভাত আর মাছের বাই-ঝোল।'

'মাছ কোথায় পেলে?'

'তুঙ্গভদ্রায় মাছের অভাব! বঁড়শি দিয়ে ধরেছি। মাছের স্বাদ কিন্তু ভাল নয়, বাংলা দেশের মত নয়। কাল খেয়েছিলাম।'

দু'জনে নৌকার খোলের মধ্যে গিয়া আহারে বসিল। খাইতে খাইতে কথা হইতে লাগিল—'রাজাকে দেখেছ? কেমন রাজা?'

'রাজা আমাকে ডেকেছিলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। রাজার মতন রাজা। আমাকে তার সৈন্যদলে নেবেন বলেছেন।'

অর্জুন রাজদর্শনের আখ্যান বিস্তারিত করিয়া বলিল। শুনিয়া বলরাম বলিল—'তাই নাকি! তোমার কপাল ভাল। আমিও রাজার শ্রীচরণ দর্শন করতে চাই, বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি ভাই একটু চেষ্টা কোরো।'

'নিশ্চয় করব। আমার যথাসাধ্য করব।'

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দুই বন্ধু গাত্রোত্থান করিল।

বলরাম একটি পাটের থলিতে কিছু লোহা-লক্কড় লইয়া থলি কাঁধে ফেলিল। অর্জুন নিজের লাঠি দু'টি হাতে লইল।

গোল নৌকায় চড়িয়া তাহারা ঘাটে নামিল। অর্জুন দেখিল, নির্জন ঘাটের এক কোণে শীর্ণকায় লোকটি বসিয়া আছে। মাথায় পাগড়ী থাকা সত্ত্বেও রৌদ্রতাপে তাহার অবস্থা করুণ। অর্জুন ও বলরাম পথ চলিতে আরম্ভ করিলে সেও পিছে চলিল।

অর্জুন চলিতে চলিতে বলরামকে নিম্নস্বরে শীর্ণ লোকটির কথা বলিল। বলরাম একবার ঘাড় ফিরাইয়া পঞ্চাশ হস্ত দূরস্থ লোকটাকে দেখিল, তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—'রাজার গুপ্তচর হতে পারে।'

অর্জুন আশ্চর্য হইয়া বলিল—'রাজার গুপ্তচর—!'

বলরাম বলিল—'রাজারা কাউকে বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করলে তাঁদের চলে না। তুমি নূতন লোক, গুলবর্গা থেকে এসেছ, তাই তোমার পিছনে গুপ্তচর লেগেছে। ভাল রাজা, বিচক্ষণ রাজা! কিন্তু তোমার মনে পাপ নেই, তোমার কিসের ভয়?'

অর্জুন অনেকক্ষণ হতবাক্ হইয়া রহিল। রাজনীতির সহিত তাহার পরিচয় নাই; যে-মানুষ প্রসন্ন মুখে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা দান করে, সে-ই আবার তাহার পিছনে গুপ্তচর লাগাইতে পারে ইহা যেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বলরামের কথাই সত্য, রাজাদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়।

পান-সুপারি রাস্তা দেখিয়া বলরামের চক্ষু গোল হইল। দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া তাহারা পিপাসার্ত হইয়াছিল, তক্রবতীর দোকানে গিয়া আকণ্ঠ শীতল তক্র পান করিল। আজ আর তক্রবতী যুবতী মূল্য লইতে অস্বীকার করিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে অতিথি-ভবনে উপনীত হইল। [illegible] পরিচয় শুনিয়া পরিচারকেরা তাহাকে অর্জুনের পাশের [illegible] থাকিতে দিল।

গুপ্তচর অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অর্জুন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, বোকাটে আধ-পাগলা গোছের মুখ করিয়া সে বলিল—'আমার নাম বেঙ্কটাপ্পা।'

বলরাম বলিল—'বাঃ! খাসা নাম! তুমি কী কাজ কর?'

'কাজ!' বেঙ্কটাপ্পা ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া বলিল—'আমি কাজ করি না, কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াই।'

'বটে! কিন্তু পেট চলে কি করে?'

'পেট! পেট তো চলে না, আমি চলি।'

'বলি খাও কি?'

'যা পাই তাই খাই।'

'পথে পথে ঘুরে বেড়াও, রোজগার কর না, তোমার খাবার ব্যবস্থা করে কে?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বেঙ্কটাপ্পা আকাশের দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিল—'ঐখানে ভগবান আছেন, তিনি খাবার ব্যবস্থা করেন।'

'বৎস বেঙ্কটাপ্পা, তুমি তো ভারি চতুর লোক, ভগবানের ঘাড়ে খাবারের ভার তুলে দিয়েছ। কিন্তু আমাদের পিছনে লেগেছ কেন?'

বেঙ্কটাপ্পা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'পিছনে লাগা কাকে বলে?'

'তাও জান না? ভারি নেকা তুমি!' বলরাম তাহার বাহু ধরিয়া বলিল—'চল তুমি আমাদের সঙ্গে, পিছনে লাগা কাকে বলে বুঝিয়ে দেব।'

বেঙ্কটাপ্পা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—'না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।'

বলরাম বলিল—'বেশ, পিছনে থাকো ক্ষতি নেই, কিন্তু বেশী কাছে এস না। আমার বন্ধুর হাতে লাঠি দেখতে পাচ্ছ?'

বেঙ্কটাপ্পা ইতিউতি চাহিয়া হঠাৎ পিছন দিকে ছুট মারিল। বলরাম উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বেঙ্কটাপ্পাকে আজ আর দেখা যাবে না। চল, অতিথি-ভবনে ফেরা যাক।'

অর্জুন বলিল—'এখনো বেলা আছে। পম্পা সরোবর দেখতে যাবে ?"

'হাঁ হাঁ, তাই চল।'

সূর্যাস্তের সময় তাহারা পম্পার সন্নিধানে পৌঁছিল। স্থানটি শান্ত রসাস্পদ, পর্বত সরোবর ও মন্দির মিলিয়া তপোবনের পরিবেশ সৃজন করিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে বহুবিস্তৃত পাষাণ-চত্বর। পিছনে ও পাশে দেবদাসীদের বাসস্থান। চত্বরের উপর তিনজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। পূজার্থীর ভিড় নাই।

অর্জুন ও বলরাম দূর হইতে মন্দিরস্থ বিগ্রহকে প্রণাম করিল, তারপর সরোবরের দিকে চলিল।

মন্দির-সংলগ্ন ঘাট হইতে পম্পার দৃশ্য অতি মনোহর। দূর-প্রসারিত গোলাকৃতি হ্রদের তীর ঘন সন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত। তাহার ফাঁকে জলের উপর সন্ধ্যাভ্র বর্ণমালা প্রতিফলিত হইয়াছে। নীলাভ জলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কমল ও কুমুদের গুচ্ছ। কমল মুদিত হইতেছে, কুমুদ ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইতেছে। এমনিভাবে যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহারা পালা করিয়া দিবারাত্র জনক-তনয়ার স্নানপুণ্য সরোবর পাহারা দিতেছে।

দুই বন্ধু ঘাটের পৈঠায় বসিয়া পম্পার জল মাথায় ছিটাইল, তারপর মুগ্ধনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। মৃদুমন্দ বায়ুভরে সরোবরের জল ঊর্মিল হইয়া উঠিতেছে, শুদ্ধ স্নিগ্ধ কমলগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে। তীরের জলরেখা ধরিয়া বকপক্ষীরা সঞ্চরণ করিতেছে; কয়েকটি বক উড়িয়া গিয়া রাত্রির জন্য বৃক্ষশাখায় বসিল। রামচন্দ্র যে বকপক্ষী দেখিয়াছিলেন ইহারা কি তাহারই বংশধর ?

অর্জুন ও বলরাম শান্ত তৃপ্ত মন লইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; তখন সহসা মন্দিরের চত্বরে মৃদঙ্গের রোল উত্থিত হইল। অর্জুন ও বলরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে বহু দীপ জ্বলিয়াছে। [illegible]

দেবদাসী অপূর্ব বেশে সজ্জিত হইয়া যুক্তকরে মন্দিরদ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তিনজন প্রৌঢ়ের মধ্যে একজন মন্দিরের পূজারী তিনি মন্দিরের অভ্যন্তরে বিগ্রহের পুরোভাগে পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়াছেন। অন্য দুইজন প্রৌঢ় চত্বরে দাঁড়াইয়া মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছেন। দর্শকের সংখ্যা বেশী নয়; অর্জুন ও বলরাম তাহাদের মধ্যে গিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে দণ্ডায়মান হইল।

আরতি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসিগণের সুঠাম দেহ নৃত্যের তালে ছন্দিত হইয়া উঠিল। মৃদঙ্গ মঞ্জীরার ধ্বনির সহিত নূপুর ও কঙ্কণকিঙ্কিণীর নিক্কণ মিশিল। দশটি দেহ এক সঙ্গে লীলায়িত হইতেছে, দশজোড়া নূপুর এক সঙ্গে ঝংকৃত হইতেছে, বিলোল বাহু-মৃণাল এক সঙ্গে বিসর্পিত হইতেছে। নর্তকীদের মুখের ভাব তদ্‌গত, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত; তাহাদের অন্তশ্চেতনা যেন ঊর্ধ্বলোকে সাক্ষাৎ নটরাজের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছে।

তারপর নৃত্যের সহিত একটি উদাত্ত কণ্ঠস্বর মিশিল। যিনি মঞ্জীরা বাজাইতেছিলেন, তিনি জয়মঙ্গল রাগে গান ধরিলেন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কিন্তু তাল দ্রুত। এই গানের সুরে নর্তকীরা যেন মাতিয়া উঠিল। তাহাদের দেহ আলোড়িত করিয়া নৃত্যের ঘূর্ণাবর্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। দর্শকের ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর দিয়া যেন হর্ষের একটা ঝড় বহিয়া গেল।

চিরদিনই দাক্ষিণাত্য দেশ নৃত্যগীতাদি কলার পারদর্শী। সেকালে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সহিত কর্ণাট রাগ দেশ রাগ গুর্জর রাগ এবং জয়মঙ্গল রাগের বিশেষ সমাদর ছিল।

দুই দণ্ড পরে আরতি শেষ হইল। দেবদাসীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া স্বপ্নদৃষ্টা অপ্সরার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। পূজারী ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

রাত্রি হইয়াছে। অর্জুন ও বলরাম ফিরিয়া চলিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; তবু অদূরে হেমকূট চূড়ায় অগ্নিস্তম্ভ হইতে আলোকের প্রভা রাত্রির অন্ধকারকে ঈষৎ স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। দুইজনে নীরবে পথ চলিয়াছে। তাহাদের মনে যে গভীর অনুভূতি জাগিয়াছে তাহা

প্রকাশ করিবার ভাষা তাহাদের নাই। ইহা একদিকে যেমন নূতন, অন্য দিকে তেমনি চিরপুরাতন; তাহাদের রক্তের সহিত মিশিয়া আছে। তাহারা জানে না যে আজ তাহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিল তাহা তাহাদের অপৌরুষেয় সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

॥ আট ॥

তারপর একটি একটি করিয়া গ্রীষ্মের অলস মন্থর দিনগুলি কাটিতে লাগিল। কলিঙ্গ-সমাগত অতিথিবৃন্দ মনের আনন্দে আছে, তাহারা খায়-দায়, নগরে ঘুরিয়া বেড়ায়, গলায় ফুলের মালা পরিয়া, গোঁফে আতর মাখিয়া নগরবাসিনী যুবতীদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করে। কাহারো কোনো চিন্তা নাই, এইভাবে যতদিন চলে।

রাজবৈদ্য রসরাজ অতিথি-ভবনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমটা একটু সঙ্গিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তারপর দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যাকালে বিজয়নগরের রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী আসিলেন, প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সাদর সম্ভাষণের ভঙ্গিতে দুই বাহু তুলিয়া প্রচণ্ড একটি সংস্কৃত বচন ছাড়িলেন। রসরাজ নিঃঝুমভাবে একাকী বসিয়া ছিলেন, পুলকিত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ততোধিক প্রচণ্ড একটি শ্লোক ঝাড়িলেন। বয়সে এবং পাণ্ডিত্যে উভয়ে সমকক্ষ, সুতরাং অবিলম্বে ভাব হইয়া গেল। দুইজনে নিদান শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া পরমানন্দে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর প্রত্যহ দুই রাজবৈদ্যের সভা বসিতে লাগিল। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হয়; রাজ পরিবারের বিচিত্র রোগ চুপি-চুপি আলোচনা হয়। একজন বলেন, রাজাদের আসল রোগ মাথায়; মাথাটা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকে না। অন্যজন বলেন, রাজাদের সব রোগের উৎপত্তি উদরে, যদি পরিপাকযন্ত্র সুচারুরূপে সচল থাকে তাহা হইলে মস্তিষ্ক আপনি ঠাণ্ডা হইয়া যায়,

কোনো গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। পরন্তু রানীদের সমস্যা অন্য প্রকার—

একদিন কথা প্রসঙ্গে রসরাজ বলিলেন—'আমার কাছে যে কোহল আছে তার তুল্য কোহল ভূ-ভারতে নেই।'

দামোদর স্বামীও হটিবার পাত্র নন, তিনি বলিলেন—'আমার কাছে যে কোহল আছে তা এক চুম্ব পান করলে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতের পৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়বেন।'

কিছুক্ষণ দুই পক্ষ নিজ নিজ কোহলের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন। কিন্তু কেবল আত্মশ্লাঘায় তর্কের নিষ্পত্তি হয় না। রসরাজ বলিলেন—'আসুন, পরীক্ষা করে দেখা যাক। আপনি আমার কোহল দশ বিন্দু পান করুন, আমি আপনার কোহল দশ বিন্দু পান করি। ফলেন পরিচীয়তে।'

'উত্তম কথা।' দামোদর স্বামী গৃহে গিয়া নিজের কোহল লইয়া আসিলেন। দুই বৃদ্ধ পরস্পরের কোহল পান করিলেন। তারপর দণ্ডার্ধ অতীত হইতে না হইতে তাঁহারা শয্যার উপর হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রে দামোদর স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি উঠিয়া টলিতে টলিতে গৃহে গেলেন। রসরাজের ঘুম সে রাত্রে ভাঙ্গিল না।

বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা সভাগৃহের দ্বিতলে আছেন। তাঁহাদের জীবনধারা আবার স্বাভাবিক ছন্দে প্রবাহিত হইতেছে। পিত্রালয়ে তাঁহারা যেমন ছিলেন, এখানকার জীবনযাত্রা তাহা হইতে বিশেষ পৃথক নয়।

কিন্তু একই সরোবরে বাস করিলে দুইটি মীনের মতিগতি এক প্রকার হয় না। দুই রাজকুমারীর প্রকৃতি মূলতঃ ভিন্ন, নূতন সংস্থিতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের মন ভিন্ন পথে চলিয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মণিকঙ্কণার মন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সেখানে জটিলতা কুটিলতা

নাই, সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ নাই। সে মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া পলকের মধ্যে হৃদয় হারাইয়াছে এবং হৃদয় হারানোর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আছে। মহারাজের কয়টি মহিষী, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন কিনা, এই সকল প্রশ্ন তাহার কাছে নিতান্তই অবান্তর। মহারাজ যদি তাহাকে বিবাহ না করেন, সে চিরজীবন কুমারী থাকিয়া তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিবে, তাঁহার সেবা করিবে; ইহার অধিক আর কিছু সে চাহে না। তাহার মনের এইরূপ আত্মভোলা অবস্থা।

বিদ্যুন্মালার মন কিন্তু শান্ত নয়, পাষাণ বন্ধনে প্রতিহত জল-প্রবাহের ন্যায় সর্বদাই আলোড়িত হইতেছে। যাহার কাছে শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র আদর্শ স্বামী, বহুপত্নীক দেবরায়ের সহিত বিবাহ তাহার প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। আদৌ তাহার মন এই বিবাহের প্রতি বিমুখ হইয়া ছিল। কিন্তু রাজকন্যাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর রাজনৈতিক কার্যকলাপ নির্ভর করে না; বিদ্যুন্মালা বিরূপ মন লইয়া বিবাহ করিতে চলিয়াছিলেন।

তারপর নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিল এক অজ্ঞাত অখ্যাতনামা যুবক। রাজকুমারীর মন স্বপ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। হয়তো স্বপ্ন একদিন অলীক কল্পনাবিলাসের মত মিলাইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ ঝড় আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল; নদী হইতে উদ্ধার এবং দ্বীপের উপর সেই নিভৃত রাত্রিটি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। বিদ্যুন্মালা নিজ হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কথাটি জানিতে পারিলেন। রাজার মেয়ে এক অতি সামান্য যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন।

মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া বিদ্যুন্মালার হৃদয় বিচলিত হইল না; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, বুঝিলেন রাজা নারীলোলুপ অগ্নিবর্ণ নয়, তিনি স্থিরবুদ্ধি অচলপ্রতিষ্ঠ রাজা। তাঁহার চিত্তলোকে নারীর স্থান অতি অল্প।

বিবাহ স্থগিত হইল, পম্পাপতিস্বামীর পূজা আরম্ভ হইল। প্রথম দিনই বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মাকে পথের ধারে দেখিলেন, তারপর

প্রায় প্রত্যহ দেখা হইতে লাগিল। মাঝে একদিন ফাঁক পড়িলে বিদ্যুন্মালা সারাদিন উৎকণ্ঠায় ছটফট করেন। ভুলিয়া যাইবার পথ রহিল না।

একদিন পূর্বাহ্নে পম্পাপতির মন্দির হইতে ফিরিবার পর মণিকঙ্কণা বলল—'চল মালা, অন্য রানীদের সঙ্গে ভাব করে আসি।'

বিদ্যুন্মালার মন আজ বিক্ষিপ্ত, তিনি পথের ধারে অর্জুনকে দেখিতে পান নাই। উদাসভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া বলিলেন—'তুই যা কঙ্কা, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি একটু শুয়ে থাকি।'

মণিকঙ্কণা ইদানীং নিজের মন লইয়াই মাতিয়া ছিল, বিদ্যুন্মালার মনের গতি কোন্ দিকে তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে বলিল—'তা বেশ। তোকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি একাই যাই। মানুষগুলো কেমন, জানা দরকার।'

মণিকঙ্কণা পিঙ্গলাকে ডাকিয়া প্রয়োজন ব্যক্ত করিল। পিঙ্গলা বলিল—'যথা আজ্ঞা। মহারাজের আদেশ আছে, যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাব। মধ্যমা দেবী শঙ্কটা কিন্তু কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, তাঁর মহলে মহারাজ ছাড়া আর কারুর প্রবেশ-অধিকার নেই।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তাই নাকি! দেখতে কুৎসিত বুঝি?'

পিঙ্গলা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'মধ্যমা দেবীকে আমরা কেউ দেখিনি। তাঁর পিত্রালয় থেকে যেসব দাসী এসেছিল তারাই তাঁকে অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকে। চলুন, আগে কনিষ্ঠা রানী বিলোলা দেবীর কাছে নিয়ে যাই; তারপর পাটরানী পদ্মালয়াম্বিকার ভবনে নিয়ে যাব।'

মণিকঙ্কণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'পাটরানীর কী নাম বললে? প-দ্মা-ল-য়া-ম্বি-কা!'

পিঙ্গলা বলিল—'তাঁর নাম পদ্মালয়া। কিন্তু তিনি যুবরাজ মল্লিকার্জুনকে গর্ভে ধারণ করেছেন। রাজবংশের নিয়ম যে-রানী

পুত্রবতী হবেন তাঁর নামের সঙ্গে 'অম্বিকা' শব্দ জুড়ে দেওয়া হবে।'

অতঃপর পিঙ্গলা ও আরো কয়েকজন রক্ষিণীকে সঙ্গে লইয়া মণিকঙ্কণা বাহির হইল।

সমুদ্রের বন্দরে যেমন অসংখ্য তরণী বাঁধা থাকে, রাজ পৌরভূমির বেষ্টনীর মধ্যে তেমনি অগণিত পৃথক প্রাসাদ। দ্বিভূমক ত্রিভূমক পঞ্চভূমক প্রাসাদ, অধিকাংশই আকারে বৃহৎ, দুই-একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাসাদও আছে। দুইটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ হইতেছে; একটি বিদ্যুন্মালার জন্য, অন্যটি কুমার কম্পনদেব নিজের জন্য প্রস্তুত করাইতেছেন। তিনি বর্তমানে তাঁহার দুই ভার্যা লইয়া যে-প্রাসাদে আছেন তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি তাহার মর্যাদার উপযোগী মনে করেন না, তাই উচ্চতর এবং বৃহত্তর প্রাসাদ নির্মাণ করাইতেছেন। রাজসভা হইতে অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদে রাজ-পিতা বিজয়দেব বাস করেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

মণিকঙ্কণা কনিষ্ঠা রানীর তোরণ মুখে পৌঁছিবার পূর্বেই সেখানে সংবাদ গিয়াছিল। মণিকঙ্কণা দেহলিতে পদার্পণ করিয়া দেখিল, দ্বিতল হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া জল-প্রপাতের মত এক ঝাঁক যুবতী নামিয়া আসিতেছে। সর্বাগ্রে দেবী বিলোলা, পিছনে সখীবৃন্দ।

ছোট রানী বিলোলাকে দেখিলে মনে হয় পনেরো বছরের কিশোরী মেয়ে। ছোটখাটো নিটোল পরিপুষ্ট গড়ন, সদ্য ফোটা মল্লীকুলের মত হাসিভরা মুখ; সে আসিয়া মণিকঙ্কণার সম্মুখে দাঁড়াইল, খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—'তুমি বুঝি নতুন ছোট রানী হবে?'

বিলোলাকে মণিকঙ্কণার ভাল লাগিল। সে বুঝিল, বিলোলা তাহাকে বিদ্যুন্মালা বলিয়া ভুল করিয়াছে। সে ভ্রম সংশোধন করিল না, একটু ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল—'তা কি জানি!'

বিলোলা বলিল—'শুনেছি বিয়ের দেরি আছে। তা সে থাক।

আজ আমার পুতুলের বিয়ে, তোমাকে নিমন্ত্রণ করলাম। চল, বিয়ে দেখবে।'

মণিকঙ্কণার হাত ধরিয়া বিলোলা উপরে লইয়া চলিল। ত্রিতলের বিশাল কক্ষে বিবাহ-বাসর। সোনার বর ও রূপার বধূ পাশাপাশি সিংহাসনে বসিয়াছে, দুইটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকা চামর ঢুলাইতেছে। বর-বধূর সম্মুখে শত শত সুসজ্জিত পুত্তলিকা নানা প্রকার উপঢৌকন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারি দিকে বিচিত্র কর্মরত বিতস্তি প্রমাণ পুতুলের ভিড়।

বিলোলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—'কই, বাজনা বাজছে না কেন?'

অমনি কক্ষের এক কোণ হইতে বেণু বীণা ও করতাল বাজিয়া উঠিল। কক্ষের মণ্ডপিত কোণে কয়েকটি যন্ত্র-বাদিকা বসিয়া ছিল, তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের মধুর স্বননে কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিলোলা প্রশ্ন করিল—'কেমন বর-বধূ?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'চমৎকার। যেমন বর তেমনি বধূ। কিন্তু আমি তো জানতাম না, ওদের জন্য যৌতুক আনিনি।'

বিলোলা বলিল—'পরে পাঠিয়ে দিও। এখন বোসো, মিষ্টিমুখ করতে হবে।—ওরে, অতিথির জন্যে মিষ্টান্ন নিয়ে আয়।'

দুই দণ্ড পরে মণিকঙ্কণা আনন্দিত মনে বিলোলার নিকট হইতে বিদায় লইল। বিলোলা বলিল—'আবার এসো।'

অতঃপর মহাদেবী পদ্মালয়াম্বিকার ভবন।

ইনিই পট্টমহিষী, একমাত্র রাজপুত্র মল্লিকার্জুনের জননী। পদ্মালয়া প্রগাঢ়যৌবনা, বয়স পঁচিশ বছর; রূপ দেখিয়া কালসর্পও মাথা নীচু করে। তাহার প্রকৃতিতে কিন্তু চপলতা বা ছেলেমানুষী নাই; সকল অবস্থাতেই একটি অবিচল স্থৈর্য বিরাজ করিতেছে। চোখ দুটিতে শান্ত মনস্বিতার প্রভা; গম্ভীর মুখমণ্ডলে সুদূর একটি প্রসন্নতার আভাস লাগিয়া আছে।

তাঁহাকে দেখিয়া মণিকঙ্কণার চক্ষু সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল, সে নত

হইয়া তাঁহাকে পদস্পর্শ প্রণাম করিল। পদ্মালয়া হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন, স্মিতমুখে বলিলেন—'এস ভগিনী।'

পালঙ্কের পাশে বসিয়া দুই-চারিটি কথা হইল ; প্রীতি-কোমল প্রশ্ন, শ্রদ্ধাবিগলিত উত্তর। পদ্মালয়া মণিকঙ্কণার প্রকৃতি বুঝিয়া লইলেন, চেটিকে ডাকিয়া বলিলেন—'মধুরা, মল্লিকার্জুনকে নিয়ে আয়।'

অদূরে উন্মুক্ত অলিন্দে কয়েকটি চেটির মাঝখানে চার বছরের একটি বালক তীর-ধনুক লইয়া খেলা করিতেছিল : বেত্রনির্মিত ক্ষুদ্র ধনু দিয়া ফলহীন তুক বাণ এদিক-ওদিক নিক্ষেপ করিতেছিল। বনচারী রামচন্দ্রের ন্যায় বেশ, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। মাতার আহ্বান শুনিয়া মল্লিকার্জুন ধনুক স্কন্ধে লইল, তারপর সৈনিকের মত দৃঢ়পদে মাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পদ্মালয়া বলিলেন—'ইনি আমার ভগিনী, এঁকে নমস্কার কর।'

মল্লিকার্জুন অমনি করতল যুক্ত করিয়া মস্তক অবনত করিল।

বালক মল্লিকার্জুনের শিরীষ-কোমল কান্তি ও মধুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া মণিকঙ্কণা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে মল্লিকার্জুনের সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহাকে দুই বাহু দিয়া আবেষ্টন করিয়া লইল, স্নেহ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—'কী সুন্দর আমাদের পুত্র! দেবি, আমি যদি মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাই তাহলে আপনি রাগ করবেন কি?'

পদ্মালয়া দেখিলেন, মণিকঙ্কণার মন বাৎসল্য রসে আর্দ্র হইয়াছে। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন—'যখন ইচ্ছা এসো।'

মহারাজ দেবরায়ের হৃদয়ে প্রচুর স্নেহরস ছিল। তাঁহার কর্মবহুল ভাবনাবহুল জীবনের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত ছিল এই স্নেহবস্তুটি।

তাঁহার সর্বপ্রধান প্রেমাস্পদ ছিল বিজয়নগর রাজ্য। তিনি যুদ্ধ করিতেও ভালবাসিতেন ; কিন্তু কেবল যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ ভালবাসিতেন না, রাজ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রজাদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি যাহার নাই সে কখনো আদর্শ রাজা হইতে পারে না। দেবরায় প্রজাদের প্রাণাধিক ভালবাসিতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার স্নেহের পাত্র-পাত্রী ছিল অসংখ্য। যে সকল নরনারী তাঁহার সেবা করিত তাহাদের তিনি সর্বদা স্নেহরসে সিঞ্চিত করিয়া রাখিতেন। লক্ষ্মণ মল্লপ প্রমুখ মন্ত্রিগণ একবার তাঁহার বিশ্বাস লাভ করিতে পারিলে আর কখনো তাঁহার স্নেহাশ্রয় হইতে চ্যুত হইতেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকটতম পারিবারিক চক্রের মধ্যে ছিলেন তাঁহার পিতা বীরবিজয় রায়, দুই ভ্রাতা বিজয়রায় ও কম্পনরায়, তিনটি রানী এবং পুত্র মল্লিকার্জুন।

পিতার সহিত মহারাজ দেবরায়ের সম্বন্ধ ছিল বিচিত্র। বীর-বিজয় নির্লিপ্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন; তিনি নানা প্রকার অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বিপত্নীক; ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র বিলাস। ছয়মাস রাজত্ব করিবার পর তিনি দেখিলেন, রন্ধনকার্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে; তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরায়কে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রন্ধনকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। দেবরায়কে তিনি ভালবাসিতেন; দ্বিতীয় পুত্র বিজয়ের প্রতি তাঁহার মন ছিল নিরপেক্ষ, এবং কনিষ্ঠ পুত্র কম্পনকে তিনি গভীরভাবে বিদ্বেষ করিতেন। পৌরজন আড়ালে তাঁহাকে পাগলাপ্পা বা পাগলা-বাবা বলিত। মহারাজ দেবরায় পিতৃদেবকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন না বটে, কিন্তু ভালবাসিতেন। বীরবিজয় মাঝে মাঝে পুত্রের ভবনে আবির্ভূত হইয়া পুত্রকে স্বহস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন, কিছু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নানা দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেন। রাজা তদ্গতভাবে পিতৃবাক্য শ্রবণ করিতেন এবং মনে মনে হাসিতেন।

রাজার মধ্যম ভ্রাতা বিজয়রায় ছিলেন অবিমিশ্র যোদ্ধা। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিজয়নগরের রাজপরিবারে নামের বৈচিত্র্য ছিল না; একই নাম—হরিহর বুক্ক কম্পন বিজয় দেবরায়—বার বার ফিরিয়া আসিত। প্রভেদ দেখাইবার জন্য ঐতিহাসিকেরা 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' প্রভৃতি উপসর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজভ্রাতা বিজয় যুদ্ধ করিতে ভালবাসিতেন এবং নিপুণ সেনাপতি

ছিলেন। তাঁহার অবশ্য একটি পত্নী ছিলেন, কিন্তু পত্নীকে রাজ অবরোধে রাখিয়া তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে সৈন্যদল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কদাচিৎ রাজধানীতে ফিরিয়া দু'চার দিন পত্নীর সহিত যাপন করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িতেন। মহারাজ দেবরায় এই ভ্রাতাটিকে কেবল ভালই বাসিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন। এমন অনন্যমনা একনিষ্ঠ যোদ্ধাকে শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় নাই।

বিজয়রায় বর্তমানে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকজন বিদ্রোহী হিন্দু সামন্ত রাজাকে দমন করিতে ব্যস্ত আছেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই-তিন বার অশ্বারোহী বার্তাবহ আসিয়া রাজাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া যায়। রাজাও বার্তা প্রেরণ করেন। রাজধানী হইতে যুদ্ধক্ষেত্র অশ্বপৃষ্ঠে দুই দিনের পথ। যাইতে একদিন ও ফিরিতে একদিন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা কম্পনদেবের প্রতি মহারাজের প্রীতি সর্বজনবিদিত। তাহার স্নেহ প্রায় বাৎসল্য রসের পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। পিতার নিয়মিত সতর্কবাণী এবং মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপের নীরব অসমর্থন তাঁহার মোহভঙ্গ করিতে পারে নাই।

তিনটি রানীর প্রতি তাহার প্রেম সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য, হৃদয়াবেগের আধিক্য নাই। পুত্র মল্লিকার্জুন তাহার নয়নমণি।

এই স্নেহসর্বস্ব অপিচ বজ্রাদপি কঠোর রাজাটিকে প্রজারা যেমন ভালবাসিত, শত্রুরা তেমনি ভয় করিত।

বিজয়নগর রাজ্যে কেবল একজন মহারাজ দেবরায়কে ভালবাসিতেন না, তাঁহার নাম কুমার কম্পনদেব। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। দেবরায় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসিতেন বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে ভালবাসিবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। বিশেষত স্নেহ স্বভাবতই নিম্নগামী, তাহাকে ঊর্ধ্বগামী হইতে বড় একটা দেখা যায় না।

কম্পনদেবের প্রকৃতি ছিল লোভী কুটিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী; তদুপরি রাজার কাছে অত্যধিক আদর পাইয়া তিনি অতিমাত্রায় অহঙ্কারী হইয়া

উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অহঙ্কার বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইত না; রাজার প্রতি মিষ্ট ও সহৃদয় ব্যবহারে তিনি তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। মনে মনে সিংহাসনের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল, কিন্তু সে লোভ তিনি ইঙ্গিতেও প্রকাশ করিতেন না; রাজ-সভাসদ্‌গণের মধ্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ কেহ ছিল না। বয়সে তরুণ হইলে কী হয়, মনোগত অভীপ্সা গোপন করিবার দক্ষতা তাঁহার ছিল।

কম্পনদেবের দুইটি পত্নী—কৃষ্ণাদেবী ও গিরিজাদেবী; দুটিই সুন্দরী ও রাজকুলোদ্ভবা। কম্পনদেব ইচ্ছা করিলে আরো দশটা বিবাহ করিতে পারেন, কেহ বাধা দিবে না। রাজার অজস্র প্রসাদ তাঁহার মাথায় সর্বদা বর্ষিত হইতেছে। তবু তাঁহার মনে তৃপ্তি নাই। তাঁহার উচ্চাশা কোনো দিকে পথ না পাইয়া শেষে তাঁহাকে এক নূতন কার্যে প্রবৃত্ত করিল; তিনি এমন এক গৃহ প্রস্তুত করিবেন যাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় শিল্পগৌরবে রাজভবন অপেক্ষাও গরীয়ান হইবে। রাজার অনুমতি পাইয়া কুমার কম্পন নূতন অট্টালিকা নির্মাণে মনঃসংযোগ করিলেন।

নূতন অট্টালিকায় গৃহপ্রবেশের দিন আসন্ন হইয়াছে, এমন সময় একটি ব্যাপার ঘটিল। কম্পনদেব বিদ্যুন্মালাকে দেখিলেন। তারপর মণিকঙ্কণাকে দেখিলেন। কলিঙ্গের রাজকন্যা দুটি শুধু অনিন্দ্য রূপসী নয়, তাঁহাদের আকৃতিতে অপূর্ব সম্মোহন, দুর্নিবার অনঙ্গশ্রী। লোভে কম্পনদেবের অন্তর লালায়িত হইয়া উঠিল। বাহিরে তাঁহার বিবেকহীন লালসা অল্পই প্রকাশ পাইল, কিন্তু তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়া হোক ওই যুবতী দুটিকে অঙ্কশায়িনী করিবেন। কিন্তু বলপ্রয়োগ চলিবে না, কূটকৌশল অবলম্বন আবশ্যক।

কম্পনদেবের কলাকৌশল কিন্তু সফল হইল না। বিদ্যুন্মালার চরিত্রে সন্দেহ আরোপের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কম্পনদেবের সহায়ক মিত্র কেহ ছিল না; কেবল ছিল কয়েকটি অনুগত ভৃত্য এবং মুষ্টিমেয় চাটুকার বয়স্য; তাই তাঁহার মাথায় বহু প্রকার কুবুদ্ধি খেলিলেও সেগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী লোক কেহ ছিল না।

তিনি সংবাদ পাইলেন রাজা বিদ্যুন্মালাকেই রাজবধূ করিবেন ; সুতরাং সেদিকে কোনো আশা নাই। মণিকঙ্কণার জন্য রাজা উপযুক্ত পাত্রের চিন্তা করিতেছেন, মধ্যম ভ্রাতা বিজয়রায়ের কেবল একটি বধূ, মণিকঙ্কণা সম্ভবত তাঁহার ভাগেই পড়িবে। কম্পনদেবের অসন্তোষ এতদিন তুষানলের ন্যায় ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল, এখন দাবানলের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাজা হইয়া বসিতে না পারিলে জীবনে সুখ নাই।

॥ নয় ॥

একে একে দশ দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু মহারাজের নিকট হইতে অর্জুনের আহ্বান আসিল না। যত দিন যাইতেছে অর্জুন ততই হতাশ হইয়া পড়িতেছে। রাজা কি তাহাকে মনে রাখিয়াছেন! রাজার সহস্র কাজ, সহস্র ভাবনা ; তাহার মধ্যে সামান্য একজন সৈনিক পদপ্রার্থীর কথা তাহার মনে থাকিবে এরূপ আশা করাও অন্যায়। রাজাকে এই তুচ্ছ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা।

তবে এখন সে কী করিবে? এই দেশ, এই দেশের মানুষ তাহার চোখে ভাল লাগিয়াছে ; এই দেশকে সে মাতৃভূমি রূপে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখন সে কোথায় যাইবে? কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিবে?

গত দশ দিন সে বলরামকে সঙ্গে লইয়া বিজয়নগরের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এদেশের মানুষের স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার যে চিত্র দেখিয়াছে তাহাতে আনন্দ পাইয়াছে। কিন্তু যতই দিন কাটিতেছে, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ততই সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। স্বর্গে যদি স্থায়ীভাবে থাকিতে না পারিলাম, তবে দুদিনের অতিথি হইয়া লাভ কি!

সেদিন তাহারা নগর ভ্রমণে বাহির হয় নাই, অতিথি-ভবনেই বিরস মন লইয়া বসিয়া ছিল। বাক্যালাপের স্রোতে মন্দা পড়িয়াছে ;

বলরাম খুব কথা বলিতে পারে, কিন্তু আজ তাহার বাক্-যন্ত্র নিস্তেজ। মাঝে মাঝে দু'একটা অসংলগ্ন কথা বলিয়া সে চুপ করিয়া যাইতেছে।

আজ বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা কখন পম্পাপতির মন্দিরে গিয়াছেন, দেখা হয় নাই।

দ্বিপ্রহরে তাহারা স্নানাহার করিতে গেল। অন্য সহযাত্রী অতিথিদের মধ্যে বসিয়া আহার করিল। সকলেই নিজেদের মধ্যে নানা জল্পনা করিতে করিতে আহার করিতেছে; কেহ ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড ছাগল দেখিয়াছে, তাহারই উত্তেজিত বর্ণনা দিতেছে; কেহ তুরাণী সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, তাহাদের বিচিত্র ভাষা ও ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিয়া দেখাইতেছে। সকলের মনই ভাবনাহীন, এদিকে রাজকীয় দাক্ষিণ্যের জোয়ার পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতেছে, ভাটার কোনো লক্ষণ নাই। অর্জুন ও বলরাম নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আসিল।

কক্ষে ফিরিয়া বলরাম শয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিল, অর্জুন দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দণ্ড দুই এইভাবে কাটিবার পর বলরাম প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বলিল—'ঘুম পাচ্ছে। দিবানিদ্রা ভাল নয়। চল, নৌকাগুলা দেখে আসি।'

গত দশ দিনের মধ্যে তাহারা একবার কিল্লাঘাটে গিয়া নৌকা-গুলিকে পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছে। অর্জুন স্তিমিত স্বরে বলিল—'চল।'

বলরাম উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে দ্বারের কাছে একটি মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বলরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল—'একি, বেঙ্কটাপ্পা যে! তারপর, খবর কি? অনেকদিন তোমাকে দেখিনি!'

দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বেঙ্কটাপ্পা সলজ্জ হাসিল। তাহার মুখের বোকাটে ভাব আর নাই, সে বলিল—'আমি আপনাদের পিছনেই

ছিলাম, আপনারা দেখতে পাননি।' তারপর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'আপনাকে মহারাজ স্মরণ করেছেন।'

অর্জুন বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—'মহারাজ আমাকে স্মরণ করেছেন!'

বেঙ্কটাপ্পা বলিল—'হ্যাঁ, মহারাজ বিরামকক্ষে আপনাকে দর্শন দেবেন। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

অতর্কিত পরিস্থিতিতে পড়িয়া অর্জুন হঠাৎ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, বলরাম বেঙ্কটাপ্পাকে বলিল—'ভাল ভাল। আমরা যা অনুমান করেছিলাম তা মিথ্যা নয়। ভাই বেঙ্কটাপ্পা, তুমি সত্যিই একজন রাজপুরুষ, ভবঘুরে নয়।'

বেঙ্কটাপ্পা আবার সলজ্জ হাসিল। অর্জুন বলিল—'তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

বেঙ্কটাপ্পা দ্বারের পাশে সরিয়া গেল। অর্জুন ত্বরিতে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে লইল। ঘরের কোণে লাঠি দুটি দাঁড় করানো ছিল, সে-দুটি হাতে লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে বলরাম তাহার কাছে আসিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'লাঠি নিয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু রাজার কাছে বোধহয় লাঠি নিয়ে যেতে দেবে না।—সে যা হোক, রাজার প্রসন্নতা যদি পাও, আমার কথাটা ভুলো না ভাই।'

অর্জুন বলিল—'ভুলব না। আগে দেখি রাজা কী জন্য ডেকেছেন।'

সভাগৃহের দ্বিতলে মহারাজ দেবরায় পালঙ্কে অর্ধশয়ান হইয়া মন্থর ভাবে তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন। পালঙ্কের পাশে ভূমিতলে আসন পাতিয়া বসিয়া লক্ষ্মণ মল্লপ নির্বিকার মুখে সুপারি কাটিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এক টুকরা সুপারি মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিলেন। কক্ষটি শীতল ও ছায়াচ্ছন্ন, অন্য কেহ উপস্থিত নাই। তবে দ্বারের বাহিরে প্রতিহারিণী আছে।

রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ হইতেছিল।

রাজা বলিলেন—'আহমদ শা অনেকদিন চুপ করে আছে!

আমার মন বলছে তার মতলব ভাল নয়। এতদিন চুপ করে বসে থাকার ছেলে সে নয়।'

লক্ষ্মণ মল্লপ পানের বাটা হইতে এক খণ্ড হরীতকী বাছিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন—'তা বটে। কিন্তু বহমনী রাজ্যে আমাদের যে গুপ্তচর আছে তারা জানাচ্ছে, ওখানে যুদ্ধের কোনো আয়োজন নেই। সিপাহীরা ছাউনিতে বসে গোস্ত-রুটি খাচ্ছে আর হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে।'

দেবরায় বলিলেন—'ওরা ধূর্ত এবং শঠ; কপটতাই ওদের প্রধান অস্ত্র। ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদেরও কপট এবং শঠ হতে হবে। ধর্মযুদ্ধ চলবে না। যুদ্ধে আবার ধর্ম কী? যুদ্ধ কর্মটাই তো অধর্ম। ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়েই ভারতবর্ষ উৎসন্ন গেল।'

মন্ত্রী বলিলেন—'সত্য কথা। ছলে বলে কৌশলে বিজয় লাভ করাই যুদ্ধের ধর্ম, অন্য ধর্ম এখানে অচল। মুসলমানেরা এই মূল কথাটা জানে বলেই বার বার হিন্দুদের যুদ্ধে পরাজিত করেছে।'

রাজা বলিলেন—'আমার বিশ্বাস আহমদ শা আমাদের গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে চুপি চুপি গুপ্ত-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'আমরা প্রস্তুত আছি। আমাদের এগারো লক্ষ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য কুমার বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণে আছে, বাকি সব তুঙ্গভদ্রার শতক্রোশব্যাপী তীর সীমান্তে থানা দিয়ে বসে আছে। যবনের সাধ্য নেই তাদের ভেদ করে রাজ্য আক্রমণ করে।'

রাজা ঈষৎ হাসিলেন—'আমি জানি আমরা প্রস্তুত আছি। তবু সতর্কতা শিথিল করা চলবে না। প্রস্তুত থাকা অবস্থাতেও নিশ্চিন্ততা আসে। দু' এক দিনের মধ্যে আমি উত্তর সীমান্তে সেনা পরিদর্শনে যাব।'

এই সময় কক্ষদ্বারের প্রহরিণী দ্বারমুখে দাঁড়াইয়া জানাইল যে, অর্জুনবর্মা আসিয়াছে।

রাজা বলিলেন—'পাঠিয়ে দাও।'

অর্জুন প্রবেশ করিয়া যথারীতি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া প্রণাম করিল। বলা বাহুল্য, লাঠি দুটি তাহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। রাজার সকাশে অস্ত্র লইয়া গমন নিষিদ্ধ।

দেবরায় অর্জুনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, সে পালঙ্কের পায়ের দিকে ভূমিতে বসিল। রাজা স্নিগ্ধ হাসিয়া বলিলেন—'অতিথিশালায় সুখে আছ?'

অর্জুন বলিল—'আছি মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'নগর পরিভ্রমণ করেছ শুনলাম। কেমন দেখলে?'

অর্জুন উচ্ছ্বসিত হইয়া নগরের প্রশংসা করিতে চাহিল, কিন্তু উচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে ক্ষীণস্বরে বলিল—'ভাল মহারাজ।'

'যে লোকটি তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সে কে?'

অর্জুন দেখিল বেঙ্কটাপ্পার কৃপায় তাহার গতিবিধি কিছুই রাজার অগোচর নয়, সে বলিল—'তার নাম বলরাম কর্মকার, বাংলা দেশের মানুষ। রাজকুমারীদের সঙ্গে নৌকায় এসেছে। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

রাজা তখন বলিলেন—'সে থাক। তুমি আমার সৈন্যদলে যোগ দিতে চাও। পূর্বে কখনো যুদ্ধ করেছ?'

'না আর্য। কার পক্ষে যুদ্ধ করব?'

'যবন সৈন্যদলে হিন্দু সৈনিকও আছে।—তুমি অবশ্য ভল্ল ও অসি চালনা জানো। আমার পদাতি এবং অশ্বারোহী দুই শ্রেণীর সৈন্যদল আছে। তুমি কোন দলে যোগ দিতে চাও?'

অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'মহারাজের যেরূপ ইচ্ছা। আমি অশ্ব চালাতে জানি, কিন্তু আমি আর একটি বিদ্যা জানি মহারাজ, যার বলে ঘোড়ার চেয়েও শীঘ্র যেতে পারি।'

লক্ষ্মণ মল্লপ মুখ তুলিলেন। রাজা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন—'সে কেমন?'

অর্জুন বলিল—'দুটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমি দ্রুততম অশ্বকে পিছনে ফেলে যেতে পারি।'

রাজা উঠিয়া বসিলেন—'লাঠির উপর ভর দিয়ে! এ কেমন বিদ্যা আমাকে দেখাতে পারো?'

অর্জুন বলিল—'আজ্ঞা এখনি দেখাতে পারি। আমার লাঠি দু'টি সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু প্রতিহারিণী কেড়ে নিয়েছে।'

রাজা করতালি বাজাইলেন, প্রহরিণী দ্বার সম্মুখে আবির্ভূতা হইল।

রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মার লাঠি নিয়ে এস।'

অবিলম্বে লাঠি লইয়া প্রহরিণী ফিরিয়া আসিল, অর্জুনের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

রাজা বলিলেন—'এবার দেখাও।'

অর্জুন উত্তরীয়টি স্কন্ধ হইতে লইয়া কোমরে জড়াইল; দৃঢ়বদ্ধ উন্নত বক্ষ অনাবৃত হইল। তারপর সে গ্রন্থিযুক্ত দীর্ঘ বংশযষ্টি দু'টি দুই হাতে ধরিয়া দুই পায়ের সম্মুখে দাঁড় করাইল। ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলি দিয়া বংশদণ্ডের একটি গ্রন্থি চাপিয়া ধরিয়া ক্ষিপ্র ভাবে বংশের উপর উঠিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য বংশদণ্ডটি বাঁ পায়ে সংযুক্ত করিল। এই ভাবে অর্জুন দুই বংশদণ্ড দ্বারা পদযুগলকে লম্বমান করিয়া দীর্ঘজঙ্ঘ সারস পক্ষীর ন্যায় বিশাল কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাজা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপও হাসিলেন। ব্যাপারটি যুগপৎ হাস্য ও বিস্ময় উৎপাদক। অর্জুন যষ্টিদণ্ড হইতে অবতরণ করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন—'তুমি এই লাঠিতে চড়ে ঘোড়ার চেয়ে জোরে ছুটতে পারো?'

অর্জুন সবিনয়ে বলিল—'পারি মহারাজ।'

'চমৎকার!' মহারাজের চোখে চিন্তার ছায়া পড়িল; তিনি কিয়ৎকাল অর্জুনের মুখের উপর চক্ষু রাখিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে

বলিলেন—'পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অর্জুনবর্মা, তুমি আজ যাও, কাল প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে এখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তোমাকে একটা বিশেষ কাজে পাঠাব।'

উল্লসিত মুখে অর্জুন বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

দুই পা গিয়ে আবার রাজার দিকে ফিরিল, কুণ্ঠিত মুখে বলিল—'আর্য, ক্ষমা করবেন। আমাকে যখন অনুগ্রহ করেছেন তখন আমার বন্ধু বলরামের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। বলরামের কথা আগে বলেছি; সে লৌহকর্মে নিপুণ। তারও কিছু গুপ্তবিদ্যা আছে, মহারাজকে নিবেদন করতে চায়।'

রাজা বলিলেন—'ভাল ভাল, তোমার বন্ধুর নিবেদন পরে শুনব। তুমি কাল প্রত্যুষে লাঠি নিয়ে আসবে।'

'আজ্ঞা আসব।'

অর্জুন প্রস্থান করিলে রাজা ও মন্ত্রী দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মা যদি লাঠিতে চড়ে ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত যেতে পারে তাহলে ওকে দিয়ে দৌত্যের কাজ আরো ভালো হবে। এমন কি ওর দেখাদেখি দণ্ডারোহী দূতের দল তৈরি করা যেতে পারে।'

'আজ্ঞা আমিও তাই ভাবছিলাম।' লক্ষ্মণ মল্লপ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'গুলবর্গার সংবাদ অর্জুনবর্মাকে বলা হল না।'

দেবরায়ের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন—'বলব স্থির করেই তাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না, মায়া হল। কাল ওকে দক্ষিণে বিজয়ের কাছে পাঠাব। সেখান থেকে ফিরে আসুক, তারপর গুলবর্গার খবর বলব।'

বলা বাহুল্য, এই দশ দিন দেবরায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, গুলবর্গায় গুপ্তচর পাঠাইয়া অর্জুন সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তারপর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অর্জুন যাহা বলিয়াছিল সমস্তই সত্য।

সেদিন সন্ধ্যাকালে দুই বন্ধু সাজসজ্জা করিয়া নগর পরিভ্রমণে বাহির হইল। একজন রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, অন্যজন শীঘ্রই করিবে। আহ্লাদে দু'জনের হৃদয়ই ডগমগ।

পান-সুপারি রাস্তা ছাড়াইয়া তাহারা নগর পট্টনে উপস্থিত হইল। এখানে ফুলের দোকানে মালা কিনিয়া গলায় পরিল, কপিত্থগন্ধী তক্র পান করিল, পানের দোকানে গিয়া পান চাহিল।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া তিনটি তরুণ যুবক নিজেদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস করিতেছিল। ইহারা বিলাসী নাগরিক নয়, মধ্যম শ্রেণীর গৃহস্থ পর্যায়ের লোক। অর্জুন ও বলরাম দোকানে উপস্থিত হইবার পর আর একটি যুবক আসিয়া পূর্বতন যুবকদের সঙ্গে যোগ দিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল—'শীঘ্র পান খাওয়াও। বড় বিপদে পড়েছি।'

তিনজনে সমস্বরে বলিল—'কি হয়েছে?'

নবাগত যুবক বলিল—'বামনদেব দৈবজ্ঞের কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিলাম। হাত দেখে কি বলল, জানো? বলল, আমার সাতটা বিয়ে হবে আর পঁয়ত্রিশটা মেয়ে হবে। ছেলে একটাও হবে না। আমি এখন কী করি?'

সকলে হাসিয়া উঠিল। তাম্বুল-পসারিণী বিপন্ন যুবককে পান দিয়া হাসিমুখে বলিল—'শিখিধ্বজের মন্দিরে পূজা দাও, তা হলেই ছেলে হবে।'

যুবক পান মুখে পুরিয়া বলিল—'বাজে কথা বোলো না। আমার এখনো একটাও বিয়ে হয়নি, ছেলে হবে কোত্থেকে!'

হাস্য-কৌতুকের মধ্যে বলরাম জিজ্ঞাসা করিল—'বামনদেব দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন?'

যুবক অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল—'ওই যে রামস্বামীর মন্দির, ওর পাশেই পণ্ডিতের বাসা। আপনিও কি জানতে চান ক'টা মেয়ে হবে?'

'আগে দেখি কটা বিয়ে হয়।' বলরাম পান লইয়া ; অর্জুনকে টানিয়া লইয়া চলিল।

অর্জুন বলিল—'সত্যিই কি হাত দেখাবে নাকি!'

বলরাম বলিল—'দোষ কি! একটা নতুন কিছু করা যাক।'

বামন পণ্ডিত নিজ গৃহের বহিঃচত্বরে অজিনাসন পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, স্কন্ধে উপবীত, মুণ্ডিত মুখে তীক্ষ্ণায়ত চক্ষু, মাথার চারিপাশ ক্ষৌরিত, মাঝখানে সমস্তটাই শিখা।

বলরাম ও অর্জুন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তপাণি হইল। পণ্ডিত একে একে তাহাদের পরিদর্শন করিয়া বলিলেন—'তোমরা দেখছি ভাগ্যান্বেষী বিদেশী। করকোষ্ঠি দেখাতে চাও?'

'আজ্ঞা।'

দৈবজ্ঞ প্রথমে অর্জুনের হাত টানিয়া লইয়া কররেখা পরীক্ষা করিলেন, বেশ কিছুক্ষণ দেখিলেন, বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'জলমজ্জন যোগ ছিল, কেটে গেছে। তোমার জীবন এখন এক সঙ্কটময় দশার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। পিছনে বিপদ, সামনে বিপদ, কি হয় বলা যায় না। তুমি আগামী শ্রাবণী অমাবস্যার পর আমার কাছে এসো, তখন আবার হাত দেখব।'

অর্জুন বিমর্ষ মুখে বলরামের পানে চাহিল। বলরাম তাড়াতাড়ি দৈবজ্ঞের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'আমার হাতটাও একবার দেখুন। আমরা দুই বন্ধু।'

বামনদেব হাত দেখিয়া বলিলেন—'তোমার হাত মন্দ নয়, দুঃখ কষ্ট অনেকটা কেটে এসেছে ; তবে স্বদেশে আর কখনো ফিরতে পারবে না, বিদেশে সুখ-সম্পদ দারা-পুত্র লাভ করবে। তোমরা দু'জনে বন্ধু? তাহলে একটা কথা বলে রাখি।—তোমরা দু'জন যদি এক সঙ্গে থাকো তাহলে তোমার বন্ধুর অনেক রিষ্টি কেটে যাবে। কিন্তু তোমার কিছু অনিষ্ট হতে পারে। এখন আর কিছু বলব না, শ্রাবণ মাসে আবার এসো।'

বলরাম প্রণামী দিতে গেল, কিন্তু বামনদেব লইলেন না, বলিলেন—'শ্রাবণ মাসে প্রণামী দিও।'

দুই বন্ধু বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া চলিল। বলরামের মনে অনুতাপ হইতে লাগিল, লঘুচিত্ত লইয়া দৈবজ্ঞের কাছে না যাইলেই ভাল হইত। কিন্তু তাই বা কেন? বিপদের কথা পূর্বাহ্ণে জানা থাকিলে সাবধান হওয়া যায়।

চলিতে চলিতে এক সময় অর্জুন বলিল—'আমার সঙ্গে থাকলে তোমার অনিষ্ট হতে পারে।'

বলরাম বলিল—'কিন্তু তোমার রিষ্টি কেটে যাবে। সুতরাং তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না।'

তৃতীয় পর্ব

॥ এক ॥

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অর্জুন ধরাচূড়া বাঁধিল, লাঠি হাতে লইয়া বলরামকে বলিল—'আমি চললাম। কোথায় যাচ্ছি, কবে ফিরব কিছুই জানি না।'

বলরাম বলিল—'দুর্গা দুর্গা। আমি সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হতো। যা হোক, সাবধানে থেকো। দুর্গা দুর্গা।'

বাহিরে তখনো রাত্রির ঘোর কাটে নাই। সভাগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অর্জুন দেখিল, সেখানে মানুষ কেহ উপস্থিত নাই, কেবল দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। রাজমন্দুরার তেজস্বী অশ্ব, পক্ক তিন্তিড়ী ফুলের ন্যায় বর্ণ, পিঠে কম্বলের আসন, মুখে বল্গা; ঘোড়া দু'টি নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে, কেবল তাহাদের কর্ণ সম্মুখে ও পিছনে নড়িতেছে। অর্জুনকে তাহারা চোখ বাঁকাইয়া দেখিল ও অল্প নাসাধ্বনি করিল।

অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল। সভাগৃহে সাড়াশব্দ নাই। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দিক হইতে এক মনুষ্যমূর্তি দেখা দিল। কৃশ খর্বাকৃতি মানুষটি, মাথায় বৃহৎ পাগড়ি, কোমরে তরবারি, বয়সে অর্জুন অপেক্ষা ছয়-সাত বছরের জ্যেষ্ঠ। সে কাছে আসিয়া অর্জুনকে সন্দিগ্ধ অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তারপর সভাগৃহের দ্বিতল হইতে পিঙ্গলা আসিয়া জানাইল, মহারাজ দু'জনকেই আহ্বান করিয়াছেন।

মহারাজ দেবরায় ইতিমধ্যে প্রাতঃস্নানপূর্বক দেবপূজা সমাপন করিয়াছেন; সূর্যোদয়ের পূর্বেই রাজকার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অর্জুন ও দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজার বিরামকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহারাজ পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট; তাঁহার সম্মুখে দুইটি কুণ্ডলিত

জতুমুদ্রাঙ্কিত পত্র। দুইজনে যথারীতি প্রণাম করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, অর্জুনের লাঠি ও দ্বিতীয় ব্যক্তির তরবারি প্রতিহারিণীর নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইয়াছিল।

রাজা বলিলেন—'স্বস্তি। তোমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দূত করে পাঠাচ্ছি কুমার বিজয়রায়ের কাছে। অনিরুদ্ধ, তুমি পথ চেনো, তুমি অর্জুনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পথে চটিতে ঘোড়া বদল করবে। এই নাও দু'জনে দুই পত্র, স্কন্ধাবারে পৌঁছে পত্র কুমার বিজয়ের হাতে দেবে। দুই পত্রের মর্ম যদিচ একই, তবু দু'জনেই কুমার বিজয়কে পত্র দেবে। উত্তরে তিনি তোমাদের পৃথক পত্র দেবেন। সেই পত্র নিয়ে তোমরা ফিরে আসবে। একত্র আসার প্রয়োজন নেই, যে যত শীঘ্র পারবে ফিরে আসবে। আশু কর্মে তোমাদের পাঠাচ্ছি। মনে রেখো বিলম্বে কর্মহানির সম্ভাবনা।'

অনিরুদ্ধ রাজার হাত হইতে লিপি লইয়া নিজের পাগড়িতে বাঁধিয়া লইল; তাহার দেখাদেখি অর্জুনও লিপি পাগড়িতে বাঁধিল।

রাজা বলিলেন—'এই নাও, কিছু স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে রাখ, প্রয়োজন হতে পারে। দক্ষিণ দিকের তোরণ-রক্ষিদের বলা আছে, কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। এখন যাত্রা কর। শুভমস্তু।'

রাজার নিকট বিদায় লইয়া দুইজনে অস্ত্রাদি উদ্ধার করিয়া নীচে নামিল। অশ্ব দু'টি পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্বক ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

তাহারা লক্ষ্য করিল না, এই সময়ে সভাগৃহের দ্বিতলে একটি গবাক্ষ দিয়া একজোড়া সদ্য-ঘুম-ভাঙা রমণীচক্ষু নীচের দিকে চাহিয়া ছিল। চোখ দু'টি বড় সুন্দর, মুখখানির তুলনা নাই। অশ্বারোহীরা অন্তর্হিত হইলে কুমারী বিদ্যুন্মালার দুই ভ্রূর মাঝখানে একটু ভ্রূকুটির চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অর্জুনবর্মাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। ভাবিলেন, অর্জুনবর্মা! কোথায় চলেছেন!

আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বিদ্যুন্মালা অলস অর্ধ-প্রমীল মনে মহলের বাতায়নগুলির পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটি বাতায়ন

দিয়া নীচের দৃশ্য চোখে পড়িল। তাঁহার সমগ্র চেতনা সজাগ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোনো প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, প্রশ্নগুলি মনের মধ্যেই রহিল। তারপর যথাসময় তিনি পম্পাপতির মন্দিরে গেলেন। সারা দিন মনটা উদাস বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

বেলা প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়। নগরের সপ্ত প্রাকার পার হইয়া অর্জুন ও অনিরুদ্ধ উন্মুক্ত পথ দিয়া চলিয়াছে। অশ্ব দু'টি যুগ্ম শরের ন্যায় পাশাপাশি ছুটিতেছে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না।

পথ অশ্মাচ্ছাদিত, শিলাবন্ধুর। নগর সীমানার বাহিরেও লোকালয় আছে, বিসর্পিল শৈলশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়। পথের দুই পাশে তাপ-কৃশ ঝোপঝাড় জঙ্গল; যেন পাথরের রাজ্যে উদ্ভিদ অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে।

আকাশে প্রখর সূর্য সত্ত্বেও অশ্বারোহীরা তাপে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে না। মাথায় পাগড়ি আছে, উপরন্তু অশ্বের ধাবনজনিত বায়ুপ্রবাহ তাহাদের দেহ শীতল রাখিয়াছে।

দুইজনে পাশাপাশি চলিয়াছে বটে, কিন্তু বাক্যালাপ বেশি হইতেছে না। অনিরুদ্ধের মন খুব সরল নয়, তাহার সন্দেহ হইয়াছে রাজা তাহাকে সরাইয়া অর্জুনকে নিয়োগ করিতে চান; তাই অর্জুনের প্রতি তাহার মন বিরূপ হইয়া বসিয়াছে। অর্জুন তাহা বুঝিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচ্ছন্ন বিরোধ দেখা দিয়াছে।

এক সময় অনিরুদ্ধ বলিল—'তোমার নাম অর্জুন! তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।'

অর্জুন আত্মপরিচয় দিয়া বলিল—'তোমাকেও আগে দেখিনি।'

অনিরুদ্ধ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—'তুমি নবাগত, তাই আমার নাম শোনোনি। আমি অনিরুদ্ধ, বিজয়নগরের প্রধান রাজদূত। দশ বছর

এই কাজ করছি। আশু দৌত্যকার্যে আমার তুল্য আর কেউ নেই।'

বিরসভাবে অর্জুন বলিল—'ভাল। আমার সৌভাগ্য যে রাজা তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়েছেন।'

কিন্তু বাক্যালাপে অর্জুনের মন নাই, তাহার মন ও চক্ষু পথের আশেপাশে চিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। ওখানে ওই গিরিচূড়া বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, এখানে পথের উপর দিয়া শীর্ণ জলধারা বহিয়া গিয়াছে। অদূরে ওই ভগ্নপ্রায় পাষাণ-মন্দিরের পাশ দিয়া পথ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অর্জুন মনে মনে স্থানগুলিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে লাগিল। এই পথেই তাহাকে ফিরিতে হইবে।

'তোমার হাতে লাঠি কেন?'

'যার যেমন অস্ত্র, তোমার তলোয়ার, আমার লাঠি।'

'কিন্তু দু'টো লাঠির কী দরকার?'

অর্জুন একটু হাসিল—'একটা লাঠি দিয়ে লড়ব, সেটা ভেঙ্গে গেলে অন্য লাঠি দিয়ে লড়ব।'

অনিরুদ্ধের মন সন্তুষ্ট হইল না। তাহার সন্দেহ হইল, লাঠি দুইটির অন্য কোনো তাৎপর্য আছে।

দ্বিপ্রহরে তাহারা এক পান্থশালায় পৌঁছিল। পথের কিনারে ক্ষুদ্র প্রস্তর-নির্মিত গৃহ, তাহার পাশে ছায়াশীতল একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ। বৃক্ষতলে দুইটি অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে।

একজন মধ্যবয়স্ক শিখাধারী লোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল, বলিল—'অশ্ব প্রস্তুত, আহার প্রস্তুত। এস, বসে যাও।' লোকটি অনিরুদ্ধকে চেনে।

দুইজনে অশ্ব হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে পীঠিকার সম্মুখে আহার্যের থালি, জলের ঘটি; ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত দুইজনে বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া গেল।

অর্ধ দণ্ডের মধ্যে আহার সমাপ্ত করিয়া তাহারা নূতন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিল—'সেনাদলের ছাউনি আরো পূব দিকে সরে গেছে। সন্ধ্যার আগে পৌঁছুলে দূর থেকে ধোঁয়া দেখতে

পাবে, রাত্রে পৌঁছুলে আগুন দেখতে পাবে। এখনো ত্রিশ ক্রোশ বাকি।'

আবার তাহারা বাহির হইয়া পড়িল।

দুই অশ্বারোহী যখন কুমার বিজয়ের স্কন্ধাবারে পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে। গোধূলির আলোয় সৈন্যাবাসটি দেখাইতেছে একটি বিরাট গো-গৃহের মত। অসংখ্য গরুর গাড়ী পাশাপাশি সাজাইয়া বিপুলায়তন একটি চক্র-ব্যূহ রচিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে তালপত্রের ছত্রাকৃতি অগণিত ছাউনী। মধ্যস্থলে সেনাপতির জন্য বস্ত্রনির্মিত উচ্চ শিবির।

শকট-চক্রের একস্থানে একটু ফাঁক আছে; এই প্রবেশদ্বারের মুখে সশস্ত্র রক্ষী পাহারা দিতেছে, উপরন্তু একদল রক্ষী শকটবেষ্টনের বাহিরে পরিক্রমণ করিতেছে। পাছে শত্রুসৈন্য রাত্রিকালে আক্রমণ করে তাই সতর্কতা।

অনিরুদ্ধ ও অর্জুন স্কন্ধাবারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির নিকট নীত হইল। বিজয়রায় তখন আহারে বসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজদূত যখনই আসুক তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে ইহাই রাজকীয় নিয়ম।

বস্ত্রাবাসের একটি বৃহৎ কক্ষে বিজয়রায় আহারে বসিয়াছিলেন। পীঠিকার সম্মুখে আট-দশটি থালিকা, থালিকাগুলিকে ঘিরিয়া দশ-বারোটি তৈলদীপ। ছয়জন পরিচারক পার্শ্বরক্ষী সম্মুখে ও পিছনে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে; তাহাদের কটিতে ছুরিকা।

বিজয়রায়ের আহার্যবস্তুর পরিমাণ যেমন প্রচুর, তেমনি অধিকাংশই আমিষ। সেই সঙ্গে কিছু ঘৃতপক্ক অন্ন ও এক ভৃঙ্গার দ্রাক্ষাসার। বিজয়রায় ম্লেচ্ছ রন্ধনপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁহার ভোজনপাত্রগুলিতে শোভা পাইতেছিল মেষমাংসের শূল্যপক্ক গুটিকা, কালিয়া সেক্‌চী দোল্‌মা সমোসা ইত্যাদি। একটি স্ফটিকের পাত্রে স্তূপীকৃত আঙ্গুর ফল।

বিজয়রায়ের আকৃতি মধ্যম পাণ্ডবের মত; ব্যূঢ়োরস্ক গজস্কন্ধ।

জ্যেষ্ঠ দেবরায় ও কনিষ্ঠ কম্পনের সহিত তাঁহার আকৃতির সাদৃশ্য অতি অল্প। সঙ্গম বংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুকরায় সকল বিষয়ে অভেদাত্মা ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভীমার্জুনের আকৃতির যে তফাত, হরিহর ও বুকরায়ের আকৃতিতে সেইরূপ পার্থক্য ছিল; একজন সিংহ, অন্যজন হস্তী। তারপর পুরুষানুক্রমে এই দ্বিবিধ আকৃতি বার বার এই বংশে দেখা দিয়াছে। দেশের লোক হরিহররায় ও বুকরায়কে স্নেহভরে হুক্ক-বুক্ক বলিয়া উল্লেখ করিত। দেবরায় ও বিজয়রায়কে দেখিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে সগর্বে বলাবলি করিত—হুক্ক-বুক্ক আবার ভ্রাতৃরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

অনিরুদ্ধ ও অর্জুন বিজয়রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বিশাল চক্ষু তুলিয়া তাহাদের পরিদর্শন করিলেন, তারপর বাঁ হাত বাড়াইয়া পত্র দু'টি গ্রহণ করিলেন, পত্রের জতুমুদ্রা অভগ্ন আছে পরীক্ষা করিয়া তিনি পত্র দু'টি মাথায় ঠেকাইলেন, তারপর একজন পরিচারকের দিকে চাহিলেন। পরিচারক আসিয়া একে একে পত্র দু'টির জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া বিজয়রায়ের চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। তিনি আহার করিতে করিতে পাঠ করিলেন।

পত্রে দূতদের সম্বন্ধে বোধহয় কিছু লেখা ছিল। পত্র পাঠান্তে বিজয়রায় উভয়ের প্রতি আবার নেত্রপাত করিলেন, বিশেষভাবে অর্জুনকে লক্ষ্য করিলেন। তারপর জীমূতমন্দ্র স্বরে বলিলেন—'তোমরা পানাহার কর গিয়ে, দু'দণ্ডের মধ্যে পত্রের উত্তর পাবে। মহারাজের আজ্ঞা, যত শীঘ্র সম্ভব বার্তা নিয়ে ফিরে যাবে।'

অনিরুদ্ধ বলিল—'আর্য, আমি আজ রাত্রেই ফিরে যেতে পারতাম, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ঘোড়া চলবে না। কাল প্রত্যূষে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করব।'

বিজয়রায় একটি সমোসা মুখে পুরিয়া ঘাড় নাড়িলেন। অনিরুদ্ধ ও অর্জুন শিবিরের বাহিরে আসিল।

বাহিরে তখন মশাল জ্বলিয়াছে। কোথাও সঞ্চরমান আলোক-

পিণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও স্থির হইয়া আছে। প্রান্তরে যেন ভৌতিক দীপোৎসব চলিতেছে।

রাজদূতেরা ছাউনিতে উত্তম পানাহার পাইল। একটি স্বতন্ত্র ছত্রতলে শুষ্ক তৃণশয্যায় শয়ন করিল। ছত্রাবাসগুলি রাত্রিবাসের জন্য নয়, অধিকাংশ সৈনিক মুক্ত আকাশের তলে খড় পাতিয়া শয়ন করে। দিবাকালে প্রচণ্ড সূর্যের দহন হইতে আত্মরক্ষাব জন্য ছত্রগুলির প্রয়োজন হয়।

দু'জনে শয্যাশ্রয় করিয়াছে, এমন সময় সেনাপতির এক পরিচারক আসিয়া দুইজনকে দুইটি পত্র দিয়া গেল। অর্জুন নিজের চিঠি কোমরে গুঁজিয়া লইল।

বাক্যালাপ বিশেষ হইল না। অনিরুদ্ধ একটি উদ্গার তুলিল, অর্জুন জৃম্ভণ ত্যাগ করিল। দু'জনেব মাথায় একই চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে—কি করিয়া অন্যকে পিছনে ফেলিয়া আগে রাজার সমীপে পৌঁছিবে।

উভয়ের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনিরুদ্ধ শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অর্জুন লাঠি দু'টিকে আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া রহিল এবং অধিক চিন্তা করিবার পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে স্কন্ধাবারে মশালগুলি একে একে নিভিয়া আসিতে লাগিল। তারপর রন্ধ্রহীন অন্ধকারে চরাচর ব্যাপ্ত হইল। এই অন্ধকারে কচিৎ প্রহরীদের হাঁকডাক ও অস্ত্রের ঝনৎকার শুনা যাইতে লাগিল।

রাত্রির মধ্য যামে দূরাগত শৃগালের সমবেত ডাক শুনিয়া অর্জুনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু না খুলিয়াই সে অনুভব করিল তাহার দেহের ক্লান্তি দূর হইয়াছে। সে চক্ষু খুলিল।

ছত্রের বাহিরে তরল অস্ফুট আলো দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তবে কি সকাল হইয়া গিয়াছে! সে চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অনিরুদ্ধ এখনো ঘুমাইতেছে।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সে আবার বাহিরের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিল। না, এ ভোরের আলো নয়, চাঁদের আলো। মধ্যরাত্রে

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। ছাউনী সুষুপ্ত। অর্জুন নিঃশব্দে উঠিয়া ব্যূহমুখে উপস্থিত হইল।

প্রধান প্রহরী হাঁকিল—'কে যায়?'

অর্জুন তাহার কাছে গিয়া বলিল—'চুপ চুপ। আমি রাজদূত। এখনি আমার রাজধানীতে ফিরতে হবে।'

প্রহরী বলিল—'তা ভাল। কিন্তু ঘোড়া চাই তো। তোমার ঘোড়া কোথায়?'

'ঘোড়ার দরকার নেই। এই আমার ঘোড়া—' বলিয়া অর্জুন লাফাইয়া লাঠিতে আরোহণ করিল, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে উত্তরাভিমুখে চলিল। হতবুদ্ধি প্রহরীরা মুখব্যাদান করিয়া রহিল।

স্কন্ধাবারের কাছে সুচিহ্নিত পথ নাই, মাঠের মাঝখানে অস্থায়ী ছাউনীর নিকট পথ কিজন্য থাকিবে! অর্জুন কৃষ্ণপক্ষের অর্ধভুক্ত চাঁদকে ডান দিকে রাখিয়া চলিল। ক্রোশেক দূর চলিবার পর পথ মিলিল। চন্দ্রালোকে অস্ফুট রেখা, তবু পথ বলিয়া চেনা যায়।

চেনা গেলেও সাবধানতার প্রয়োজন। পথ সিধা নয়, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঢিবি-ঢাবা বাঁচাইয়া চলিয়াছে, কোথাও দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে; এইসব স্থানে আসল পথটি চিনিয়া লইতে হইবে। পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চলিতে অর্জুনের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। স্কন্ধাবার কখন পিছন দিকে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কোথাও জনপ্রাণী নাই; ভাগ্যে এই সময় কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, দেখিলে ভাবিত, একটা দীর্ঘ শীর্ণ প্রেত চাঁদের আলোয় ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটা শৈলখণ্ডের মোড় ঘুরিয়া অর্জুনের পথ হারাইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল। সম্মুখে বহু দূরে একটি রক্তাভ আলোর বিন্দু দেখা দিয়াছে। হেমকূট পর্বতের আগুন! আর পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই, ওই আলোকবিন্দু সম্মুখে রাখিয়া চলিলেই বিজয়নগরে পৌঁছান যাইবে। অর্জুন সহর্ষে দীর্ঘ পদদ্বয় ক্ষিপ্রতর বেগে চালিত করিয়া দিল।

উষার আলো ফুটিয়াছে কি ফোটে নাই, পশ্চিম আকাশে চাঁদ

ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। রাজসভা-গৃহের অন্ধকার মূর্তি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। দাসী পিঙ্গলা অভিসারে গিয়াছিল, বহির্দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সভাগৃহের অগ্রপ্রাঙ্গণে হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে। পিঙ্গলা কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল—অর্জুনবর্মা! বিস্ময় বিহ্বলভাবে ছুটিতে ছুটিতে সে রাজাকে সংবাদ দিতে গেল।

॥ দুই ॥

রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, আজ থেকে তুমি আর আমার অতিথি নও, তুমি আমার ভৃত্য। তোমাকে আশুগতি দূতের কাজ দিলাম; এও সামরিক কাজ। তোমার গুপ্ত বিদ্যা রাজনীতির ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান বিদ্যা; এ বিদ্যা গুপ্ত রাখা প্রয়োজন। কেবল মুষ্টিমেয় লোককে তুমি এ বিদ্যা শেখাবে। কিন্তু সে পরের কথা।—আর্য লক্ষ্মণ, অর্জুনবর্মার বাসস্থান নিদেশ করুন; রাজপুরীর কাছে হবে অথচ গোপন স্থান হওয়া চাই। অর্জুনবর্মা রাজকাযে নিযুক্ত হয়েছে এ কথা অপ্রকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়।'

লক্ষ্মণ মল্লপ কেবল ঘাড় নাড়িলেন। অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'ধন্য মহারাজ। যেখানে আমার বাসস্থান নির্দেশ করবেন সেখানেই থাকব। যদি অনুমতি করেন, আমার বন্ধু বলরামও আমার সঙ্গে থাকবে। বলরামের কথা কি আপনার স্মরণ আছে মহারাজ?'

রাজা বলিলেন—'আছে। আজ আমার সভারোহণের সময় হল, তুমি যাও। সারাদিন অতিথিশালায় বিশ্রাম করবে। সন্ধ্যার পর তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসো। দেখবো কেমন তার গূঢ়বিদ্যা!'

সূর্যোদয় হইয়াছে। মন্ত্রণাগৃহ হইতে বাহির হইয়া অর্জুন অতিথিশালার দিকে চলিল। দেহের স্নায়ুপেশী ক্লান্ত কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ব উল্লাস উচ্ছলিত হইতেছে।

দাসী পিঙ্গলা এই কয়দিনে বিদ্যুন্মালা এবং মণিকঙ্কণার প্রতি

আকৃষ্ট হইয়াছে ; একটু অবকাশ পাইলেই তাঁহাদের কাছে আসিয়া বসে, রাজ্যের গল্প করে। রাজার ইঙ্গিতে রাজকুমারীদের মনোরঞ্জন করাও তাহার একটি কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সেদিন কুমারীরা পম্পাপতীর মন্দির হইতে ফিরিবার পর সে তাঁহাদের মহলে আসিয়া মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিল। প্রকাণ্ড একটা হাঁফ ছাড়িয়া বলিল— 'বাবাঃ! অর্জুনবর্মা মানুষ নয়, বাজপাখী।'

দুই রাজকন্যা চকিতে চোখ ফিরাইলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'কে বাজপাখী—অর্জুনবর্মা!'

পিঙ্গলা বলিল—'হাঁ গো, রাজকুমারি, যিনি তোমাদের সঙ্গে এসেছেন।'

বিদ্যুন্মালার হৃৎপিণ্ড দুলিয়া উঠিল। মণিকঙ্কণা বলিল—'ও মা, তিনি উড়তেও জানেন! আমরা তো জানি তিনি মাছের মত সাঁতার কাটতে পারেন। তা তিনি কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছেন?'

পিঙ্গলা গলা একটু হ্রস্ব করিয়া বলিল—'কি বলব রাজকুমারি, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! মহারাজ কাল সকালে তাঁকে দূতকর্মে পাঠিয়েছিলেন ষাট ক্রোশ দূরে। আজ সকালে তিনি কাজ সেরে ফিরে এসেছেন। বল দেখি রাজকন্যা, এ কি মানুষে পারে!'

মণিকঙ্কণা বলিল—'অমানুষিক কাজ বটে। তিনি কি একলা গিয়েছিলেন?'

পিঙ্গলা হাসিয়া উঠিল—'একলা কেন, সঙ্গে অনিরুদ্ধ ছিল, রাজ্যের চঙ্গ দূত! অনিরুদ্ধ এখনো ফেরেনি। হয়তো সন্ধ্যেবেলায় ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরবে।'

বিদ্যুন্মালার হৃদ্‌যন্ত্র যে অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতেছে, তিনি নিশ্বাস রোধ করিয়া আছেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না। পিঙ্গলা আরো খানিকক্ষণ অর্জুনবর্মার পরাক্রমের কথা আলোচনা করিয়া চলিয়া গেল।

মণিকঙ্কণাও কিয়ৎকাল পরে উঠিয়া গেল, রাজার বিরামকক্ষে উঁকি মারিয়া দেখিতে গেল রাজা সভা হইতে ফিরিয়াছেন কি না। সে

সুযোগ পাইলেই রাজার বিরামকক্ষের দিকে গিয়া আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি মারে। বিদ্যুন্মালা একাকিনী বসিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষার জটিল গ্রন্থিরচনা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর রাজার বিরামকক্ষে দীপাবলী জ্বলিয়াছিল। মহারাজ পালঙ্কে সমাসীন, সম্মুখে ভূমির উপর অর্জুন ও বলরাম। আজ লক্ষ্মণ মল্লপ উপস্থিত নাই, সম্ভবত অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত আছেন। পিঙ্গলা এতক্ষণ ঘরে ছিল, রাজার ইঙ্গিতে সরিয়া গিয়াছে।

রাজা বলিলেন—'বলরাম, তুমি বাঙ্গলা দেশের মানুষ?'

বলরাম করজোড়ে বলিল—'আজ্ঞা, রাঢ় বাঙ্গলা—বর্ধমান ভুক্তি, নগর বর্ধমান।'

রাজা কহিলেন—'বাঙ্গলা দেশে মুসলমান রাজা। তারা অত্যাচার করে?'

বলরাম বলিল—'করে মহারাজ। যারা দুষ্ট তারা স্বভাবের বশে অত্যাচার করে, আর যারা শিষ্ট তারা অত্যাচার করে ভয়ে।'

'ভয়ে অত্যাচার করে!'

'হাঁ মহারাজ। মুসলমানেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, হিন্দুরা সংখ্যায় শতগুণ। তাই তারা মনে মনে ভয় পায় এবং সেই ভয় চাপা দেবার জন্য অত্যাচার করে।'

'তুমি যথার্থ বলেছ। সকল অত্যাচারের মূলে আছে ষড়রিপু এবং ভয়। তুমি দেখছি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তোমার গুপ্তবিদ্যা কিরূপ, আমাকে শোনাও।'

'মহারাজ, আমি কর্মকার, লোহার কাজ করি। সকল রকম লোহার কাজ জানি, এমন কি কামান পর্যন্ত ঢালাই করতে পারি।'

'সে আর নূতন কি! বিজয়নগরে শত শত কর্মকার কামান নির্মাণে নিযুক্ত আছে।'

'যথার্থ মহারাজ। কামান সর্বত্র তৈরি হয়, তাতে নূতনত্ব কিছু

নেই। কিন্তু এমন কামান যদি তৈরি করা যায় যা একজন মানুষ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে বহন করে নিয়ে যেতে পারে?'

মহারাজ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—'তা কি করে সম্ভব?'

বলরাম বলিল—'আর্য, যুদ্ধের জন্য যে কামান তৈরি হয় তা অতি গুরুভার, তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার; পঞ্চাশজন লোক মিলে গো-শকটে তুলে তাকে নিয়ে যেতে হয়। বিজয়নগরের মত পার্বত্য দেশে কামান যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া আরো কষ্টসাধ্য কার্য। তাই এমন কামান দরকার যা প্রত্যেক সৈনিক ভল্লের মত হাতে করে নিয়ে যেতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'কিন্তু সেরূপ কামান কি তৈরি করা যায়! বড় কামান ঢালাই করা যায়, মাঝারি পিতলের কামানও ঢালাই হয়, কিন্তু একজন মানুষ বহন করে নিয়ে যেতে পারে এমন কামানের কথা শুনিনি'

বলরাম বলিল—'আর্য, কামানের রহস্য তার নালিকার মধ্যে। বড় নালিকা ঢালাই করা সহজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং লঘু নালিকা তৈরি করা কঠিন। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয় মহারাজ।'

'যদি সম্ভব হয় তাহলে আধুনিক যুদ্ধের ধারা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তীরন্দাজ সেনার আর প্রয়োজন হবে না।—তুমি দেখাতে পার?'

'পারি মহারাজ। দ্বারের প্রহরিণী আমার থলি কেড়ে নিয়েছে, আজ্ঞা দিন থলিটা নিয়ে আসুক।'

রাজার আদেশে প্রহরিণী বলরামের থলি দিয়া গেল। বলরাম থলি হইতে একটি লৌহযষ্টি বাহির করিয়া রাজার হাতে দিল। রাজা অভিনিবেশ সহকারে সেটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন; এক বিতস্তি দীর্ঘ, বেণুবংশের ন্যায় গোলাকৃতি লৌহযষ্টি। কিন্তু দণ্ড নয়, নালিকা; তাহার অন্তর্ভাগ শূন্য এবং মসৃণ। রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'এ তো দেখছি লৌহ নালিকা! এত সরু নালিকা তুমি নির্মাণ করলে কি করে?'

বলরাম স্মিতমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল—'আর্য, ওইখানেই আমার গুপ্তবিদ্যা। আমি সরু নল তৈরি করার কৌশল উদ্ভাবন করেছি।'

রাজা নালিকাটিকে আরো খানিকক্ষণ দেখিলেন, বলিলেন—'তারপর বল।'

বলরাম বলিল—'শ্রীমন্, কামান নির্মাণের মূল রহস্য নালিকা নির্মাণ; নালিকা তৈরি হলে বাকি সব উপসর্গ অতি সহজ। দেখুন, এই নালিকা দিয়ে অতি সহজেই ক্ষুদ্র কামান রচনা করা যায়। প্রথমে নলের এক প্রান্ত লোহার আবরণ দিয়ে বন্ধ করে দেব, তাতে কেবল একটি সূচিপ্রমাণ ছিদ্র থাকবে। তারপর নলের মধ্যে বারুদ ভরব, পিছনের ছিদ্রপথে বারুদ একটু বেরিয়ে আসবে। তখন সেই ছিদ্রের বেরিয়ে-আসা বারুদে আগুন দিলেই কামান ফুটবে। প্রক্রিয়া বোঝাতে পেরেছি কি মহারাজ?'

রাজা আরো কিছুক্ষণ নলটি নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলেন—'বুঝেছি। কিন্তু পরিপূর্ণ যন্ত্রটি কেমন হবে এখনো ধারণা করতে পারছি না। তুমি তৈরি করে আমাকে দেখাতে পার?'

'পারি মহারাজ। দু'চার দিন সময় লাগবে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। তুমি যন্ত্র প্রস্তুত কর। যদি সম্পূর্ণ যন্ত্রটি যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী হয়—'

এই সময় ধন্নায়ক লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, এদের বাসস্থান নির্দেশের কী ব্যবস্থা করলেন?'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'পুরভূমির মধ্যে বাড়ী হল না, ওদের গুহায় থাকার ব্যবস্থা করেছি।'

'গুহায়! কোন্ গুহায়?'

'রাজ-অবরোধের দক্ষিণ প্রান্তে কমল সরোবরের অদূরে সঙ্কেত-গুহা নামে যে গুহা আছে তাতেই ওদের বাসস্থান নির্দেশ করেছি। গুহাটি নির্জন, ওদিকে লোক-চলাচল নেই; ওরা আরামে থাকবে,

রাজার হাতের কাছে থাকবে, অথচ বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

রাজা বলিলেন—'ভাল, আজ থেকে ওরা গুহাবাসী হোক, কিন্তু গৃহের আরাম থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। বলরামের বোধহয় কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে—'

বলরাম বলিল—'আর সব যন্ত্রপাতি আমার আছে মহারাজ, কেবল একটি ভস্ত্রা হলেই চলবে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ সাম্প্রতিক ঘটনা জানেন না, তিনি বলরামের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'ভস্ত্রা পাবে।—এখন অনুমতি করুন, মহারাজ, এদের গুহায় পৌঁছে দিই।'

রাজা লৌহ নালিকাটি বলরামকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—'আপনি বলরামকে নিয়ে যান, অর্জুনবর্মার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

বলরামকে লইয়া মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। রাজা অর্জুনের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, একটা দুঃসংবাদ আছে। তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে।'

অর্জুন দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। সংবাদ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়, এই আশঙ্কাই সে দিনের পর দিন মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিল; তবু তাহার কণ্ঠের স্নায়ুপেশী সঙ্কুচিত হইয়া তাহার কণ্ঠরোধের উপক্রম করিল, হৃদ্‌যন্ত্র পঞ্জরের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ করিতে লাগিল। চিন্তা করিবার শক্তি ক্ষণকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল, কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে একটা আর্ত চীৎকার ধ্বনিত হইতে লাগিল—পিতা! পিতা!

রাজা তাহার অবস্থা দেখিয়া সদয়কণ্ঠে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তোমার পিতা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছেন, ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।'

এইবার অর্জুনের দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর ধারা নামিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে কেবল একটি শব্দ উচ্চারণ করিল—'কবে—?'

রাজা বলিলেন—'এগারো দিন আগে। ম্লেচ্ছরা তাঁকে গো-মাংস খাইয়ে ধর্মনাশের চেষ্টা করেছিল, তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেছেন। —তুমি এখন যাও, আজ রাত্রিটা অতিথিশালাতেই থেকো; রাত্রে পিতাকে প্রাণ ভরে স্মরণ কোরো। কাল তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন আমি করব। এস বৎস।'

অর্জুন যখন সভাগৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন চারিদিকে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছে, নগর প্রায় নিষ্প্রদীপ। বাষ্পাকুল চোখে আকাশের পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল জগতে সে একা, নিঃসঙ্গ; তাহার হৃদয়ও শূন্য হইয়া গিয়াছে।

॥ তিন ॥

দুই দিন পরে মহারাজ দেবরায় সীমান্ত-সেনা পরিদর্শনে বাহির হইলেন। সঙ্গে পিঙ্গলা এবং পাঁচজন পাচক। দেহরক্ষীরূপে চলিল এক সহস্র তুরাণী ধনুর্ধর। রাজা রাজ্যের উত্তর সীমান্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিদর্শন করিবেন, ন্যূনাধিক এক পক্ষকাল সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ একান্ত অনাড়ম্বরভাবে রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়াছেন।

কুমার কম্পনদেবের ইচ্ছা ছিল, রাজার অনুপস্থিতি কালে তিনিই রাজ-প্রতিভূ হইয়া রাজকার্য চালাইবেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ডাকিলেন না; এত অল্প সময়ের জন্য শূন্যপাল নিয়োগের প্রয়োজন হয় না, মন্ত্রীই কাজ চালাইয়া লইতে পারেন। কুমার কম্পনের বিষয়-জর্জরিত মন আরো বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

কুমার কম্পনের নূতন গৃহ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে নানা প্রকার মহার্ঘ সাজসজ্জা বসিয়াছে। কিন্তু এখনো তিনি গৃহপ্রবেশ করেন নাই। তাঁহার প্রকাশ্য অভিপ্রায়, রাজা প্রত্যাগমন করিলে রাজাকে এবং রাজ্যের গণ্যমান্য রাজপুরুষদের প্রকাণ্ড ভোজ দিয়া গৃহপ্রবেশ করিবেন। এই অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যে কুটিল এবং

দুঃসাহসিক অভিসন্ধি আছে তাহা তিনি হাস্যমুখে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

অর্জুন ও বলরাম গুহা মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অতিথিশালা হইতে গুহায় স্থানান্তরিত হইয়া কিন্তু তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তিল-মাত্র হানি হয় নাই।

বিজয়নগরের সর্বত্র, তথা রাজ পুরভূমির মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় আছে; পাহাড় না বলিয়া তাহাদের শিলাস্তূপ বলিলেই ভাল হয়। সর্বত্র দেখা যায় বলিয়া কেহ এগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে না। অনেক শিলাস্তূপের অভ্যন্তরে নৈসর্গিক কন্দর আছে। অর্জুন ও বলরাম যে গুহাতে আশ্রয় পাইয়াছিল তাহাও এইরূপ গুহা। ইতস্তত বিকীর্ণ বড় বড় শিলাখণ্ডের মাঝখানে ক্রমোচ্চ স্তনইব ভুবঃ একটি স্তূপ, এই শিলায়তনের মধ্যে গুহা। গুহাও বেশ বিস্তীর্ণ, কিন্তু অধিক উচ্চ নয়; এমন তাহার ত্রিভঙ্গ গঠন যে তাহাকে স্বচ্ছন্দে দুই ভাগ করিয়া দুইটি প্রকোষ্ঠে পরিণত করা যায়। পিছন দিকে ছাদের এক অংশে কিছু পাথর খসিয়া গিয়া একটি নাতিবৃহৎ ছিদ্র হইয়াছে, সেই পথে প্রচুর আলো ও বায়ুর প্রবাহ প্রবেশ করে।

মন্ত্রী মহাশয় যত্নের ত্রুটি রাখেন নাই। কোমল শয্যা, উপবেশনের জন্য পীঠিকা, জলের কুণ্ড, দীপদণ্ড ও অন্যান্য তৈজস দিয়া গুহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। রাজপুরীর রন্ধনশালা হইতে প্রত্যহ দুইবার একটি দাসী আসিয়া রাজভোগ্য খাদ্য পানীয় দিয়া যায়। বলরাম ও অর্জুন একদিন বহিত্রে গিয়া বলরামের লোহা-লক্কড় ও যন্ত্রপাতি লইয়া আসিয়াছে, তাহার মৃদঙ্গাদি বাদ্যও আনিতে ভোলে নাই। দুই বন্ধু নিভৃতে নিরালায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছে।

পিতার শ্রাদ্ধশান্তির পর অর্জুন ধীরে ধীরে আবার সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। তাহার অসহায় বিহ্বল ভাব কাটিয়া গিয়াছে; বর্তমানে যে বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতার ভাব তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তাহাও ক্রমে কাটিয়া যাইবে। যৌবনের মনঃপীড়া বড় তীব্র হয়,

কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ক্ষত শীঘ্র শুকায় এবং অচিরাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বলরাম হৃদয়ের প্রীতি ও সহানুভূতি দিয়া অর্জুনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সে নিজে জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, দুঃখের মূল্য বোঝে ; তাই তাড়াতাড়ি করিয়া অর্জুনের শোক ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করে না ; বরং শোকের ভাগ লইয়া শোক লাঘব করিবার চেষ্টা করে। কখনো নানা বিচিত্র কাহিনী বলে, কখনো সন্ধ্যার পর প্রদীপ জ্বলিলে মৃদঙ্গ লইয়া গান ধরে—শ্রিত-কমলাকুচ মণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে !

গুহার যে অংশে ছাদে ফুটা আজ সেইখানে বলরাম হাপর বসাইয়াছে। সকালবেলা চুল্লীতে আগুন ধরাইয়া সে কাজ করিতে বসে ; অর্জুন তাহার হাপরের দড়ি টানে। লৌহখণ্ড তপ্ত হইয়া তরুণার্করাগ ধারণ করিলে বলরাম তাহা হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া অভীষ্ট রূপ দান করে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে গল্প হয় ; বলরামই বেশি কথা বলে, অর্জুন কখনো ঘাড় নাড়ে কখনো দু'একটা কথা বলে। বলরাম বলে—'এ গুহাটি বেশ, এর সঙ্কেত-গুহা নাম সার্থক। আমরা এখানে আসার ফলে কিন্তু অনেক অভিসারিকার প্রাণে ব্যথা লেগেছে।'

অর্জুনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলরাম মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলে—'এ গুহাটি রাজপুরীর যুবতী দাসী-কিঙ্করীদের গুপ্ত বিহারগৃহ ; অভিসারিকারা কুহুরাত্রে চুপিচুপি আসত, নাগরেরাও আসত। গুহার অন্ধকারে ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলত। আর জ্বলত মদনানল।'

অর্জুন বলে—'তুমি কি করে জানলে ?'

বলরাম বলে—'তুমি দেখনি ! গুহার গায়ে জোড়া জোড়া নাম লেখা আছে। কোথাও খড়ি দিয়ে লেখা—রত্নমালা-দেবদত্ত ; কোথাও গিরিমাটি দিয়ে লেখা—চন্দ্রচূড়-বল্লভা। কতক নাম নূতন, কতক নাম অনেকদিনের পুরানো, প্রায় মিলিয়ে এসেছে, ভাল পড়া যায় না। এরা সব এখানে আসত। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বাদ সাধলেন, আমাদের এনে এখানে বসিয়ে দিলেন। ওদের মনে কি দুঃখ বল দেখি।

আবার নূতন গুহা খুঁজতে হবে।' বলিয়া বলরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া হো হো শব্দে হাসিতে থাকে। অর্জুনের অধরেও একটু হাসি খেলিয়া যায়।

আবার কখনো বলরাম বলে—'আজ আর কামান তৈরি করতে ভাল লাগছে না। এস, তোমার লাঠির জন্যে দুটো হুল তৈরি করে দিই। লাঠির ডগায় বসিয়ে দিলেই লাঠি বল্লমে পরিণত হবে।'

অর্জুন বলে—'তাতে কী লাভ?'

বলরাম বলে—'লাভ হবে না! একাধারে ঘোড়া এবং বল্লম পাবে। ভেবে দেখ, তুমি রাজদূত, তোমাকে যখন-তখন পাহাড় জঙ্গল ভেঙ্গে দূর-দূরান্তরে যেতে হবে। হঠাৎ যদি অস্ত্রধারী আততায়ী আক্রমণ করে! তুমি তখন কী করবে? লাঠি দিয়ে কত লড়বে! তখন এই অস্ত্রটি কাজে আসবে। তুমি টুক্ করে লাঠি থেকে নেমে বল্লম দিয়ে শত্রুর পেট ফুটো করে দেবে।'

'তা বটে।'

বলরাম দুইটি লোহার হুল তৈয়ার করিয়া লাঠির মাথায় আঁট করিয়া বসাইয়া দেয়। দুই বন্ধু দু'টি ভল্ল লইয়া কিছুক্ষণ ক্রীড়াযুদ্ধ করে। রঙ্গ কৌতুকে অর্জুনের মন লঘু হয়।

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে রাজপুরীর দাসী খাবার লইয়া আসে। দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখা যায়। মাথার উপর একটি প্রকাণ্ড থালা, তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জন। তার উপর আর একটি অন্ন-ব্যঞ্জনপূর্ণ থালা। সর্বোপরি একটি শূন্য থালা উপুড় করা। কোমরে ছোট একটি জলপূর্ণ কলসী। তাহার শাড়ীর রঙ কোনো দিন চাঁপা ফুলের মত, কোনো দিন পলাশ ফুলের মত। গতিভঙ্গী রাজহংসীর মত। তাহাকে আসিতে দেখিলে মনে হয় মাথায় সোনার মুকুট পরা দিব্যাঙ্গনা আসিতেছে।

সে দৃষ্টিগোচর হইলেই বলরাম কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, বলে—'অর্জুন ভাই, চল চল স্নান করে আসি। মধ্যাহ্ন ভোজন আসছে।'

গুহা হইতে চার-পাঁচ রজ্জু দূরে পৌরভূমির দক্ষিণ কিনারে বিপুল-প্রসার কমলা সরোবর; দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ক্রোশেক স্থান জুড়িয়া স্ফটিকের ন্যায় জল টলমল করিতেছে। দূরে পূর্বদিকে কমলাপুরের ঘাট দেখা যায়। অর্জুন ও বলরাম ঘাটে স্নান করিতে যায় না। নিকটেই আঘাটায় স্নান করিয়া ফিরিয়া আসে।

গুহায় ফিরিয়া দেখে, দাসী পীঠিকার সম্মুখে আহার্য সাজাইয়া বসিয়া আছে। তাহারা আহারে বসিয়া যায়। আহার শেষ হইলে দাসী উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

প্রথম দুই তিন দিন তাহারা দাসীকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। একদিন খাইতে বসিয়া বলরামের জিজ্ঞাসু চক্ষু তাহার উপর পড়িল। মেয়েটি পা মুড়িয়া অদূরে বসিয়া আছে। তাহার বয়স অনুমান কুড়ি-একুশ; কচি কলাপাতার মত স্নিগ্ধ দেহের বর্ণ। ঊর্ধ্বাঙ্গে কাঁচুলি ও উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গে উজ্জ্বল পীতবসন; মধ্যে ডমরুর ন্যায় কটি উন্মুক্ত। মুখখানি কমনীয়, টানা-টানা চোখ, অধর ঈষৎ স্ফুরিত। মুখের ভাব শান্ত এবং সংযত; যেন দর্শকের দৃষ্টি হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিতে চায়। লাজুক নয়, কিন্তু অপ্রগল্‌ভা। বলরাম তাহার প্রতি কয়েকবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে প্রশ্ন করিল—'তোমার নাম কি?'

যুবতীর চোখ দুটি ভূমিসংলগ্ন হইল, সে সম্বৃত স্বরে বলিল—'মঞ্জিরা!'

কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া বলরাম বলিল—'তুমি রাজপুরীতেই থাকো?'

মঞ্জিরা বলিল—'হাঁ।'

'কতদিন আছ?'

'আট বছর।'

'তোমার পিতা-মাতা নেই?'

'আছেন। তাঁরা নগরে থাকেন।'

বলরাম আরো কিছুক্ষণ আহার করিয়া মুখ তুলিল; তাহার

অধরকোণে একটু হাসি। বলিল—'তুমি আগে কখনো এ গুহায় এসেছ? অর্থাৎ আমরা আসার আগে কখনো এসেছ?'

মঞ্জিরা চোখ তুলিয়া বলরামের মুখের পানে চাহিল। চোখে ছল-কপট নাই, ঋজু দৃষ্টি। বলিল—'না।'

বলরাম বলিল—'কিন্তু অপবাদ শুনেছি, রাজপুরীর দাসী-কিঙ্করীরা মাঝে মাঝে রাত্রিকালে এই গুহায় আসে।'

মঞ্জিরার মুখের ভাব দৃঢ় হইল, সে বলরামের চোখে চোখ রাখিয়া বলিল—'যারা দুষ্ট মেয়ে তারা আসে। সকলে আসে না।'

তিরস্কৃত হইয়া বলরাম চুপ করিল। সেকালের কবিরা অভিসারিকাদের লইয়া যতই মাতামাতি করুন, সমাজে অভিসারিকাদের প্রশংসা ছিল না। বিকীর্ণকামা নারী সকল যুগে সকল সমাজেই নিন্দিতা। তবে এ কথাও সত্য, সেকালে অভিসারের প্রচলন একটু বেশি ছিল।

বলরাম ও অর্জুন আহার শেষ করিয়া আচমন করিতে উঠিল। মঞ্জিরা উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্জুন ও বলরাম ভ্রমণের জন্য বাহির হইল। রাজা রাজধানীতে নাই, সভা বসে না; তবু অর্জুন দিনে একেবার রাজসভার দিকে যায়, শূন্য সভাঙ্গনে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া ফিরিয়া আসে। আজ বলরামও তাহার সঙ্গে চলিল।

গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূর যাইবার পর বলরাম দেখিল, একটা উঁচু পাথরের চ্যাঙড়ের পাশে একজন অস্ত্রধারী লোক দাঁড়াইয়া আছে। মুখে প্রচুর গোঁফদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, হাতে ভল্ল, কোমরে তরবারি। তাহাদের আসিতে দেখিয়া লোকটা পাথরের আড়ালে অপসৃত হইল।

বলরাম বলিল—'এস তো, দেখি কে লোকটা।'

অর্জুনের হাতে স্থূল-শীর্ষ লাঠি দুটি ছিল, সুতরাং অস্ত্রধারী অজ্ঞাত পুরুষের সম্মুখীন হইতে ভয় নাই। অর্জুন একটি লাঠি বলরামকে

দিল, তারপর দুইজনে দুই দিক হইতে চ্যাঙড় ঘুরিয়া অন্তরালস্থিত লোকটির নিকটবর্তী হইল।

তাহাদের দেখিয়া লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল! বলরাম বলিল—'বাপু, কে তুমি? তোমার নাম কি? এখানে কি চাও?'

লোকটি বলিল—'আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। আমার নাম চতুর্ভুজ নায়ক।'

বলরাম বলিল—'কাকে পাহারা দিচ্ছ?'

চতুর্ভুজ নায়কের গোঁফ এবং দাড়ির সঙ্গমস্থলে একটু শ্বেতাভা দেখা দিল—'তোমাদের পাহারা দিচ্ছি।'

বিস্মিত হইয়া বলরাম বলিল—'আমাদের পাহারা দিচ্ছ! আমাদের অপরাধ?'

'তোমরা গোপনীয় রাজকার্যে ব্যাপৃত আছ। পাছে বাইরের লোক কেউ আসে তাই মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুমে পাহারা দিচ্ছি।'

'বুঝলাম। রাত্রেও কি পাহারা থাকে?'

'থাকে।'

'তুমি একা পাহারা দাও, না তোমার মতন চতুর্ভুজ আরো আছে?'

'আমরা তিনজন আছি, পালা করে পাহারা দিই।'

'নিশ্চিন্ত হলাম। অভিসারক আর অভিসারিকাদের ঠেকিয়ে রেখো। আমরা একটু ঘুরে আসি।'

সূর্যাস্তের অল্পকাল পরে অর্জুন ও বলরাম ফিরিয়া আসিল, দেখিল গুহায় দীপ জ্বলিতেছে, মঞ্জিরা খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে। দুইজনে খাইতে বসিয়া গেল।

রাজবাটি হইতে রোজ নূতন নূতন অন্ন-ব্যঞ্জন আসে। আজ আসিয়াছে শর্করা-মধুর পিণ্ডক্ষীর, দুই প্রকার মৎস্য, শূল্য মাংস উখ্য মাংস, দুগ্ধফেননিভ তণ্ডুল, ঘৃতলিপ্ত রোটিকা সম্বর, অবদংশ ও পর্পট। দক্ষিণ দেশে আহারের নিয়ম মধুরেণ সমাপয়েৎ নয়, মধুর

খাছ্য দিয়া আহার আরম্ভ। অর্জুন ও বলরাম পিণ্ডক্ষীর মুখে দিয়া পরম তৃপ্তিভরে ভোজন আরম্ভ করিল।

পিণ্ডক্ষীরের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে বলরাম অর্ধমুদিত নেত্রে মঞ্জিরাকে নিরীক্ষণ করিল। মঞ্জিরা বাম করতল ভূমিতে রাখিয়া একটু হেলিয়া বসিয়া আছে, স্নেহদীপিকার নম্র আলোকে তাহার মুখখানি বড় মধুর দেখাইতেছে। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলরাম বলিল—'তোমার নাম মঞ্জিরা। মঞ্জিরা মানে বাঁশি। তুমি বাঁশি বাজাতে জান ?'

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মঞ্জিরা আয়ত চক্ষু তুলিয়া চাহিল। একটু ঘাড় বাঁকাইল, বলিল—'জানি।'

বলরাম বলিল—'বাঃ বেশ। আমি গান গাইতে পারি, তোমাকে গান শোনাব। তুমি আমাকে বাঁশি শোনাবে ?'

মঞ্জিরার অধরে চাপা কৌতুকের হাসি খেলিয়া গেল, সে একটু ঘাড় নাড়িল।

বলরাম উৎসাহ ভরে বলিল—'ভাল। কাল তাহলে তুমি তোমার বাঁশি এনো। কেমন ?'

মঞ্জিরা আবার ঘাড় নাড়িল।

অর্জুন আড় চোখে বলরামের পানে চাহিল। গুহার ভিতর দুইটি নর-নারীর মধ্যে পূর্বরাগের অনুবন্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার মন উৎসুক ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মঞ্জিরা খাবার লইয়া আসিল। আজ বলরাম ও অর্জুন পূর্বাহ্নেই স্নান করিয়া প্রস্তুত ছিল। আহারে বসিয়া বলরাম বলিল—'কই, বাঁশি আনোনি ?'

মঞ্জিরা কোঁচড় হইতে বাঁশি বাহির করিয়া দেখাইল। বন-বেতসের এড়ো বাঁশি। বলরাম হৃষ্ট হইয়া বলিল—'এই যে বাঁশি! তা—তুমি বাজাও, আমরা খেতে খেতে শুনি।'

মঞ্জিরা নতমুখে মাথা নাড়িয়া হাসিল। বলরাম বলিল—'ও—বুঝেছি, আমি গান না গাইলে তুমি বাঁশি বাজাবে না। ভাবছ,

আমি গাইতে জানি না, ফাঁকি দিয়ে তোমার বাঁশি শুনে নিতে চাই।
—আচ্ছা দাঁড়াও।'

আহারান্তে বলরাম মৃদঙ্গ কোলে লইয়া বসিল। বলিল—
'জয়দেব গোস্বামীর পদ গাইছি।—শ্রীরাধিকার বিরহ হয়েছে, তিনি চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করছেন। কর্ণাট রাগ, যতি তাল। আমার সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে পারবে?'

মঞ্জিরা উত্তর দিল না, বাঁশিটি হাতে লইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বলরাম কয়েকবার মৃদঙ্গে মৃদু আঘাত করিয়া কলিতকণ্ঠে গান ধরিল—

'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।—'

মঞ্জিরা বাঁশিটি অধরে রাখিয়া ফুঁ দিল। বাঁশির ক্ষীণ-মধুর ধ্বনি বসন্তের প্রজাপতির মত জয়দেবের সুরের শীর্ষে শীর্ষে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। বলরাম গান গাহিতে গাহিতে মঞ্জিরার চোখে চোখ রাখিয়া চমৎকৃত হাসি হাসিল।

'সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজ-বিশিখভয়াদিব
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা।'

দু'জনের চক্ষু পরস্পর নিবদ্ধ, কিন্তু মন নিবদ্ধ সুরের জালে। মোহময় সুর, কুহকময় শব্দ; সঙ্গীতের স্রোতে আশ্লিষ্ট হইয়া দু'জনে একসঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে।

দুই দণ্ড পরে গান শেষ হইল।

মৃদঙ্গ নামাইয়া রাখিয়া বলরাম গদ্‌গদ স্বরে বলিল—'ধন্য! তুমি এত ভাল বাঁশি বাজাও আমি ভাবতেই পারিনি।—আমার গান কেমন শুনলে?'

মঞ্জিরা সলজ্জ স্বরে বলিল—'ভাল।'

বলরাম হঠাৎ বলিল—'ভাল কথা, তোমার খাওয়া হয়েছে?'

মঞ্জিরা মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

বলরাম বিব্রত হইয়া পড়িল—'অ্যাঁ—এখনো খাওনি! গান-

বাজনা পেলে বুঝি খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না? এ কি অন্যায় কথা! যাও যাও, খাও গিয়ে। কাল যখন আসবে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবে। কেমন?'

মঞ্জিরা চলিয়া যাইবার পর বলরাম শয্যা পাতিয়া শয়ন করিল, অর্জুনও নিজের শয্যা পাতিল। বলরাম কিছুক্ষণ সুপারি চর্বণ করিয়া বলিল—'মঞ্জিরা মেয়েটা ভারি সুশীলা।'

অর্জুন হাসি দমন করিয়া বলিল—'তা তো বুঝতেই পারছি।'

বলরাম সন্দিগ্ধ ভাবে তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইল, বলিল—'কি করে বুঝলে?'

অর্জুন বলিল—'বাঁশি বাজাতে পারে।'

বলরাম এবার হাসিয়া উঠিল—'সে জন্যে নয়। মেয়েটার শরীরে রাগ নেই, আর খুব কম কথা কয়। যে-মেয়ে কম কথা কয় সে তো রমণীরত্ন।'

অর্জুনের মনে পড়িল বলরামের পূর্বতন স্ত্রী মুখরা ও চণ্ডী ছিল। অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়া বলিল—'তা বটে।'

অতঃপর মঞ্জিরা আসে যায়। দ্বিপ্রহরে বলরামের সঙ্গে দু'দণ্ড বাঁশি বাজাইয়া তৃতীয় প্রহরে ফিরিয়া যায়। রাত্রে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না, আহার শেষ হইলেই পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়। বলরামের সহিত তাহার আন্তরিক বন্ধন ঘনিষ্ঠ হইতেছে। সঙ্গীতের বন্ধন নাগপাশের বন্ধন, দু'জনকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তবু, বলরাম সাবধানী লোক, সে জানিয়া লইয়াছে যে মঞ্জিরা অনূঢ়া; পরকীয়া প্রীতি যে অতি গর্হিত কার্য তাহা তাহার অবিদিত নাই।

এইভাবে দিন কাটিতেছে। বলরাম কামানটি সম্পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু রাজা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কিছু করণীয় নাই। কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়া শুক্লপক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর দুই বন্ধু গুহার বাহিরে দাঁড়াইয়া তরুণী চন্দ্রলেখার পানে চাহিয়া থাকে। চন্দ্রলেখা দিনে দিনে পরিবর্ধমানা।

একদিন এই নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে এক বিচিত্র অপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটিল। দিনটা ছিল শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী কি সপ্তমী তিথি। সন্ধ্যার পর যথারীতি আহার সমাপন করিয়া বলরাম ও অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মঞ্জিরা চলিয়া গিয়াছে; দীপের শিখাটি তৈলাভাবে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হইয়া আসিতেছে।

বলরাম আলস্যভরে জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া বলিল—'কামানটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ঠিক হল কিনা। কাল প্রত্যূষে বেরুব।'

অর্জুন বলিল—'বেশ তো! কোথায় যাবে?'

'কোনো নির্জন স্থানে। যাতে শব্দ শোনা না যায়। আজ ঘুমিয়ে পড়। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।'

কিন্তু নিদ্রাকর্ষণের পূর্বেই বাধা পড়িল। গুহার মুখের কাছে ধাবমান পদশব্দ শুনিয়া দু'জনেই ত্বরিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

গুহার রন্ধ্রমুখে ধূম্রাকার ছায়া পড়িল, একটি কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'অর্জুন ভদ্র! বলরাম ভদ্র!'

অর্জুন গলা চড়াইয়া হাঁক দিল—'কে তুমি!'

'আমি চতুর্ভুজ নায়ক।'

দু'জনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলরাম বলিল—'চতুর্ভুজ! ভিতরে এস। কী সমাচার?'

প্রহরী চতুর্ভুজ তখন গুহায় প্রবেশ করিয়া আলোকচক্রের মধ্যে দাঁড়াইল। দেখা গেল তাহার চক্ষু ভয়ে গোলাকৃতি হইয়াছে, দাড়িগোঁফ রোমাঞ্চিত। সে থরথর স্বরে বলিল—'হুক্ক-বুক্ক!'

'হুক্ক-বুক্ক! সে কাকে বলে?'

চতুর্ভুজ তখন স্খলিত স্বরে যথাসাধ্য বুঝাইয়া বলিল। রাজবংশের প্রবর্তক হরিহর ও বুক্কের প্রেতাত্মা দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা গুহার বাহিরে অনতিদূরে পদচারণ করিতেছেন। চতুর্ভুজ প্রথমে তাঁহাদের মানুষ মনে করিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা মানুষ নয়, প্রেত; চতুর্ভুজের সম্বোধন অগ্রাহ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

শুনিয়া অর্জুন লাঠি দুটি হাতে লইল, বলিল—'চল দেখি।'

চতুর্ভুজ মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—'আমি আর যাব না। তোমরা যাও।'

দুই বন্ধু গুহা হইতে বাহির হইয়া এদিক-ওদিক চাহিল। চন্দ্র এখনো অস্ত যায় নাই, জ্যোৎস্না-বাষ্পে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। কিন্তু মানুষ কোথাও দেখা গেল না। তাহারা তখন আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পাশে দাঁড়াইল।

হাঁ, সরোবরের দিক হইতে দুইজন লোক আসিতেছে। এখনো দর্শকদের নিকট হইতে প্রায় শত হস্ত দূরে আছে। একজন দীর্ঘকায় ও কৃশ, অন্য ব্যক্তি খব ও গজস্কন্ধ; জ্যোৎস্নালোকে তাহাদের মুখাবয়ব দেখা যাইতেছে না। তাহারা যেন প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত কোনো গোপনীয় কথার আলোচনা করিতেছে।

অর্জুন ও বলরামের মাথার উপর দিয়া একটা পেচক গম্ভীর শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল! বলরাম নিঃশব্দে অর্জুনের হাত ধরিয়া প্রস্তর-স্তূপের আড়ালে টানিয়া লইল।

দুই মূর্তি অগ্রসর হইতেছে। অর্জুন ও বলরাম পাথরের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, যুগলমূর্তি তাহাদের বিশ হাত দূর দিয়া রাজসভার দিকে চলিয়া যাইতেছে। এখনো তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট; মানুষ বলিয়া চেনা যায় কিন্তু মুখ-চোখ দেখা যায় না।

অর্জুন বলরামকে ইঙ্গিত করিল, দুইজনে আড়াল হইতে বাহির হইয়া সমস্বরে তর্জন করিল—'কে যায়? দাঁড়াও।'

মূর্তিযুগল দাঁড়াইল; তাহাদের দেহভঙ্গিতে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তারপর, বুদ্বুদ যেমন ফাটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি তাহারা শূন্যে মিলাইয়া গেল।

অর্জুন ও বলরাম দৃষ্টি বিনিময় করিল। বলরাম অধর লেহন করিয়া বলিল—'যা দেখবার দেখেছি! চল, গুহায় ফিরি।'

গুহার ভিতরে চতুর্ভুজ জড়সড় ভাবে বসিয়া ছিল; প্রদীপটা নিব-নিব হইয়াছিল। বলরাম প্রদীপে তৈল ঢালিল, প্রদীপ আবার উজ্জ্বল হইল

চতুর্ভুজ বায়সের ন্যায় বিকৃত কণ্ঠে বলিল—'দেখলে ?'

বলরাম শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল—'দেখলাম। চোখের সামনে মিলিয়ে গেল।—কিন্তু ওরা যে হুক্ক-বুক্কের প্রেতাত্মা তা তুমি জানলে কি করে ?'

চতুর্ভুজ শয্যার পাশে আসিয়া বসিল, বলিল—'গল্প শুনেছি। হরিহর ছিলেন লম্বা রোগা, আর বুক্ক ছিলেন বেঁটে মোটা। ওঁরা মাঝে মাঝে দেখা দেন, অনেকে দেখেছে। রাজ্যের যখন কোনো গুরুতর বিপদ উপস্থিত হয় তখন ওঁরা দেখা দেন।'

দুই বন্ধু উদ্বিগ্ন চক্ষে চাহিয়া রহিল। গুরুতর বিপদ! কী বিপদ! তুঙ্গভদ্রার পরপারে মূর্তিমান বিপদ বুভুক্ষু শার্দুলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপদ! কিংবা অন্য কিছু ?

চতুর্ভুজের কথায় তাহাদের চিন্তাজাল ছিন্ন হইল—'আজ রাত্রে আমি গুহার মধ্যে থেকেই পাহারা দেব। কি বল ?'

বলরাম বলিল—'সেই ভাল! তুমি আমাদের পাহারা দেবে, আমরা তোমাকে পাহারা দেব।'

॥ চার ॥

মহারাজ দেবরায় সৈন্য পরিদর্শনে যাত্রা করিবার পর সভাগৃহের দ্বিতলের গৌরব-গরিমা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। দুই রাজকন্যা পরিচারিকা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। পিঙ্গলা নাই, রাজার সঙ্গে গিয়াছে। বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার মানসিক অবস্থা খুবই করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

দুই ভগিনীর মনঃকষ্টের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মণিকঙ্কণা কাতর হইয়াছে রাজার বিরহে; প্রভাতে উঠিয়া সে আর রাজার দর্শন পায় না, আড়াল হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় না। সে ক্ষিপ্ন মনে এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়; কখনো চুপি চুপি রাজার বিরামকক্ষে যায়, পালঙ্কের পাশে বসিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে।

তারপর যখন গৃহ অসহ্য হইয়া ওঠে তখন দেবী পদ্মালয়ার ভবনে যায়; সেখানে বালক মল্লিকার্জুনের সঙ্গে কিয়ৎকাল খেলা করিয়া ফিরিয়া আসে। সে লক্ষ্য করে রাজার অবর্তমানে পদ্মালয়ার অবিচল প্রসন্নতা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে মনে মনে বিস্মিত হয়। এরা কেমন মানুষ!

বিদ্যুন্মালার সমস্যা অন্য প্রকার। বস্তুত তাঁহার সমস্যা একটা নয়, অনেকগুলা সমস্যার সূত্র এক সঙ্গে জট পাকাইয়া গিয়াছে।

বিদ্যুন্মালা যাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বিজয়নগরে আসিয়াছেন সেই দেবরায়ের প্রতি তিনি প্রীতিমতী নন; যাহার প্রতি তাঁহার মন আসক্ত হইয়াছে সে রাজা নয়, রাজপুত্র নয়; অতি সামান্য যুবক। তাহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহের কথা কেহ ভাবিতেই পারে না।

পূর্বে অর্জুনের সহিত বিদ্যুন্মালার প্রায় প্রত্যহ দেখা হইত। দশদিন আগে দ্বিতলের বাতায়নে দাঁড়াইয়া বিদ্যুন্মালা চকিতের ন্যায় অর্জুনকে অশ্বারোহণে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তারপর আর তিনি অর্জুনকে দেখেন নাই; শুনিয়াছিলেন অর্জুন দৌত্যকার্যে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াছে। তারপর সে কোথায় গেল? বিদ্যুন্মালা প্রত্যহ অতিথিশালার সম্মুখ দিয়া পম্পাপতির মন্দিরে যান, কিন্তু অর্জুনের দেখা পান না। কি হইল তাহার? দাসীদের প্রশ্ন করিতে শঙ্কা হয়, পাছে তাহারা সন্দেহ করে। তিনি অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছেন।

বিবাহ তিন মাস পিছাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তিন মাস কতটুকু সময়? একটি একটি করিয়া দিন যাইতেছে আর মেয়াদের কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। সময় যে যুগপৎ এমন দ্রুত ও মন্থর হইতে পারে তাহা কে জানিত? ভাবিয়া ভাবিয়া রাজকুমারীর দেহ কৃশ হইয়াছে, চোখে একটা অস্বাভাবিক প্রখর দৃষ্টি। জালবদ্ধা কুরঙ্গী বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

একদিন সূর্যাস্ত কালে বিদ্যুন্মালা নিজ শয্যায় অর্ধশয়ান হইয়া দুর্ভাবনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মণিকঙ্কণা কক্ষে নাই, বোধ করি নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাজার বিরামকক্ষে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। একটি দাসী ভূমিতলে বসিয়া কুমারীদের পরিধেয় বস্ত্র উর্মি করিতেছিল, কুমারীরা সান্ধ্য-স্নান করিয়া পরিধান করিবেন।

সূর্যাস্ত হইলে কক্ষের অভ্যন্তর ছায়াচ্ছন্ন হইল। বিদ্যুন্মালার দেহ সহসা অসহ্য অধীরতায় ছটফট করিয়া উঠিল। তিনি শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন—'ভদ্রা!'

দাসী কাপড় চুনট্ করিতে করিতে জিজ্ঞাসু মুখ তুলিল—'আজ্ঞা রাজকুমারি!'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'ঘরে আর তিষ্ঠতে পারছি না। চল, নীচে খোলা যায়গায় বেড়িয়ে আসি।'

ভদ্রা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'তাহলে প্রতিহারিণীদের বলি। আপনি সন্ধ্যাস্নান সেরে বেশ পরিবর্তন করুন।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না না, প্রতিহারিণীদের প্রয়োজন নেই, কেবল তুমি সঙ্গে থাকবে। ফিরে এসে বেশ পরিবর্তন করব।'

'যে আজ্ঞা রাজকুমারি।'

ভদ্রাকে লইয়া বিদ্যুন্মালা নীচে নামিলেন। সোপানের প্রতিহারিণীরা একবার সপ্রশ্ন ভ্রূ তুলিল, ভদ্রা দক্ষিণ হস্তের ঈষৎ ইঙ্গিত করিল। রাজকুমারীরা বন্দিনী নন, কেহ বাধা দিল না।

প্রাঙ্গণে নামিয়া বিদ্যুন্মালা এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কেবল উত্তরদিকে পম্পাপতির মন্দিরের পথ তাঁহার পরিচিত। তিনি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'ওদিকে কী আছে?'

ভদ্রা বলিল—'ওদিকে কমলা সরোবর।'

'চল।'—বিদ্যুন্মালা সেই দিকে চলিলেন।

চলিতে চলিতে ভদ্রা বলিল—'কমলা সরোবর এখান থেকে অনেকটা দূর, প্রায় অর্ধ ক্রোশ। অত দূর কি যেতে পারবেন রাজকুমারি!'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না, ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিলেন; কিন্তু তাঁহার মন অন্তর্নিহিত হইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময়

লোকজন বেশি নাই ; যে দু'চারটি পৌরজন সম্মুখে পড়িল তাহারা কলিঙ্গ-কুমারীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া গেল।

খানিক দূর গিয়া রাজকুমারী অনুভব করিলেন, পথ কঙ্করময় হইয়াছে, অদূরে একটি নীচু পাহাড়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওটা কি ?'

ভদ্রা বলিল—'ওটা একটা পাহাড় রাজকুমারি। ওর মধ্যে গুহা আছে। লোকে বলে—সঙ্কেত-গুহা।' ভদ্রার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসি দেখা দিল। সঙ্কেত-গুহার পরিচয় পুরস্ত্রীরা সকলেই জানে।

রাজকুমারী গুহা সম্বন্ধে আর কোনো ঔৎসুক্য দেখাইলেন না, আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কমলা সরোবর এখনও দূরে। তিনি ফিরিলেন। এই ভ্রমণের ফলে বিক্ষিপ্ত মন ঈষৎ শান্ত হইল।

পরদিন সায়ংকালে বিদ্যুন্মালা ভদ্রাকে বলিলেন—'আমি আজও একটু ঘুরে-ফিরে আসি। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে না।' ভদ্রার মুখে অব্যক্ত আপত্তি দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নেই, আমি হারিয়ে যাব না, পথ চিনে ফিরে আসতে পারব।'

ভদ্রা আর কিছু বলিতে পারিল না। বিদ্যুন্মালা নীচে নামিয়া কাল যেদিকে গিয়াছিলেন সেইদিকে চলিলেন। পরিচিত পথে চলাই ভাল ; অপরিচিত পথ কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ তাহা রাজকন্যা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আকাশে সূর্যাস্তের বর্ণলীলা শেষ হইয়াছে, চাঁদের কিরণ পরিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যুন্মালা নীচু পাহাড়টা পাশে রাখিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ফিরি-ফিরি করিতেছেন, এমন সময় পিছন দিক হইতে কে বলিল—'রাজকুমারি! আপনি এখানে!'

বিদ্যুন্মালা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন গুহার দিক হইতে দ্রুতপদে আসিতেছে—অর্জুন। তাহার মুখে বিস্ময়বিমূঢ় হাসি।

অর্জুন বিদ্যুন্মালার সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়াইল, বলিল—'আপনি একা এতদূর এসেছেন!'

বিদ্যুন্মালা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর কোনো কথা না বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উদ্বেগের সঞ্চিত বাষ্প অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া আসিল।

অর্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, নির্বাক সশঙ্ক মুখে বিদ্যুন্মালার পানে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যুন্মালা চোখ মুছিলেন না, গলদশ্রু নেত্রে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন—'আগে রোজ সকালে আপনাকে দেখতাম, আজকাল দেখতে পাই না কেন?'

অর্জুন হৃদয়ের মধ্যে একটা চমক অনুভব করিল। রাজকুমারী এ কী বলিতেছেন! কিন্তু না, ইহা সাধারণ কুশলপ্রশ্ন মাত্র। অশ্রুজলেরও হয়তো একটা কারণ আছে; রমণীর অশ্রুপাতের কারণ কে কবে নির্ণয় করিতে পারিয়াছে? অর্জুন আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'আমি এখন আর অতিথি-ভবনে থাকি না। রাজা আমাকে কাজ দিয়েছেন। আমি আমার বন্ধু বলরামের সঙ্গে ওই গুহায় থাকি।'

বিদ্যুন্মালা এবার চোখ মুছিলেন, ঘাড় ফিরাইয়া গুহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'গুহায় থাকেন! গুহায় থাকেন কেন?'

অর্জুন বলিল—'তা জানি না। রাজার আদেশ।—আপনি ভাল আছেন?'

বিদ্যুন্মালার অধরে একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল—'ভাল। হাঁ, ভালই আছি। আপনি তো লাঠি চড়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

অর্জুন বিস্মিত হইয়া বলিল—'আপনি জানলেন কি করে? ও—আমি বোধহয় আপনাকে লাঠি চড়ার কথা বলেছিলাম। হাঁ, রাজা আমাকে দূতকার্যে পাঠিয়েছিলেন।'

কিছুক্ষণ দুজনে নীরব, যেন উভয়েরই কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। শেষে অর্জুন বলিল—'সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না, আমি একা যেতে পারব। কাল এই সময় আপনি এখানে থাকবেন, আমি আসব।'

বিদ্যুন্মালা চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে কয়েকবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর রাজকন্যা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে অশান্ত শঙ্কিত মনে গুহায় ফিরিল।

বিদ্যুন্মালার একটি রাত্রি এবং একটি দিন দুঃসহ অধীরতার মধ্যে কাটিল। কিন্তু তিনি মন স্থির করিয়া লইয়াছেন: বায়ুতাড়িত হালভাঙ্গা নৌকায় ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে কোনো ফল হইবে না; নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তীরের দিকে যাইতে হইবে। এবার অগাধ জলে সাঁতার।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বিদ্যুন্মালা গুহার অভিমুখে গেলেন। মণিবন্ধে একটি মল্লী-ফুলের মালা জড়ানো। আজ আর কান্নাকাটি নয়, প্রগল্ভ চটুলতা। অর্জুনের হৃদয় এখনো প্রেমহীন; নারীর তূণীরে যত বাণ আছে সমস্ত প্রয়োগ করিয়া অর্জুনের হৃদয় জয় করিয়া লইতে হইবে।

অর্জুন অপেক্ষা করিতেছিল, যে পাষাণস্তূপের পাশে দাঁড়াইয়া হুক্ক-বুক্কের প্রেতাত্মা দর্শন করিয়াছিল সেই পাষাণস্তূপে ঠেস দিয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল। বিদ্যুন্মালা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অর্জুন খাড়া হইয়া দুই কর যুক্ত করিল।

বিদ্যুন্মালা হাসিলেন। গোধূলির আলোকে দুই হাসির বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন অর্জুনের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। সে দেখিতে পাইল না যে হাসির পিছনে অনেকখানি কান্না, অনেকখানি ভয় লাগিয়া আছে।

রাজকন্যা বলিলেন—'এদিকটা বেশ নিরিবিলি। তবু স্তম্ভের আড়ালে যাওয়াই ভাল।'

তিনি আগে আগে চলিলেন, অর্জুন নীরবে তাঁহার অনুগামী হইল। দু'জনে স্তম্ভ-পাষাণের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। এখানে কাহারো চোখে পড়িবার আশঙ্কা নাই।

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের একটু কাছে সরিয়া আসিলেন, একটু ভঙ্গুর

হাসিয়া বলিলেন—'অর্জুন ভদ্র, আবার আপনার বিপদ উপস্থিত হয়েছে।'

বিদ্যুন্মালার মুখে এমন কিছু ছিল যাহা দেখিয়া অর্জুনের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল, সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'বিপদ!'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'হাঁ, গুরুতর বিপদ। একবার যাকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাকে আবার উদ্ধার করতে হবে।'

অর্জুন মূঢ়ের ন্যায় পুনরাবৃত্তি করিল—'উদ্ধার!'

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের মুখ পর্যন্ত চক্ষু তুলিয়া আবার বক্ষ পর্যন্ত নত করিলেন; অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'হাঁ, উদ্ধার। আমাকে উদ্ধার করতে হবে। এখনো বুঝতে পারছেন না?'

অসহায় ভাবে মাথা নাড়িয়া অর্জুন বলিল—'না।'

'তবে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

বিদ্যুন্মালা মল্লীমালিকাটি মণিবন্ধ হইতে পাকে পাকে খুলিয়া দুই হাতে ধরিলেন, তারপর অর্জুন কিছু বুঝিবার পূর্বেই মালিকাটি তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

অর্জুন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল—'রাজকুমারি, এ কি করলেন!'

থরথর কম্পিত অধরে হাসি আনিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'স্বয়ংবরা হলাম।'

তিনি একটি পাষাণ-পট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন। প্রগল্ভতা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তাই এইটুকু অভিনয় করিয়া তাঁহার দেহমনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

অর্জুন আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল; ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অলক্ষিত আকাশে আলো মৃদু হইয়া আসিতেছে।

অর্জুন মিনতির স্বরে বলিল—'রাজকুমারি, আপনি ক্ষণিক বিভ্রমে ভুল করে ফেলেছেন। আপনার মালা ফিরিয়ে নিন। আমি প্রাণান্তেও কাউকে কিছু বলব না।'

বিদ্যুন্মালা আকাশের পানে চাহিলেন, মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'আর তা হয় না। কিন্তু আজ আমি যাই, অন্ধকার হয়ে গেছে। কাল আবার আসব। কাল কিন্তু আর তোমাকে 'আপনি' বলতে পারব না; তুমিও আমাকে 'তুমি' বলবে।'

ছায়ার ন্যায় বিদ্যুন্মালা অন্তর্হিতা হইলেন।

অর্জুন গুহায় ফিরিল। মঞ্জিরা এখনো খাদ্য লইয়া আসে নাই; বলরাম প্রদীপ জ্বালিয়া মৃদঙ্গ লইয়া বসিয়াছে, আপন মনে গান ধরিয়াছে—

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।

অর্জুন গলা হইতে মালা খুলিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়াছিল; বলরাম মালা দেখিয়া গান থামাইল; বলিল—'মালা কোথায় পেলে? পান-সুপারি বাজারে গিয়েছিলে নাকি?'

অর্জুন একটু স্থির থাকিয়া বলিল—'না, একটি মেয়ে দিয়েছে।'

বলরাম উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল—'আরে বাঃ! তুমিও একটি মেয়ে জুটিয়ে ফেলেছ! বেশ বেশ। তা—কে মেয়েটি? রাজপুরীর পুরন্ধ্রী নিশ্চয়।'

অর্জুন বলিল—'হাঁ, রাজপুরীর পুরন্ধ্রী। কিন্তু নাম বলতে নিষেধ আছে।'

এই সময় নৈশাহারের পাত্র মাথায় লইয়া মঞ্জিরা উপস্থিত হইল। মালার প্রসঙ্গ স্থগিত হইল।

সে রাত্রে অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। গভীর দুঃখ ও বিজয়োল্লাস এক সঙ্গে অনুভব করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার তাহার জীবনে কেন ঘটিল! বিদ্যুন্মালাকে সে দেখিয়াছে শ্রদ্ধার চোখে, সম্ভ্রমের চোখে। কিন্তু তিনি মনে মনে তাহাকে কামনা করিয়াছেন। তিনি রাজকন্যা, রাজার বাগ্‌দত্তা বধূ; আর অর্জুন অতি সামান্য মানুষ। কী করিয়া ইহা সম্ভব হইল! তারপর—এখন কী হইবে? ইহার পরিণাম কোথায়!

যে-ভাবে বলরাম মঞ্জিরাকে ভালবাসে সে-ভাবে অর্জুন বিদ্যুন্মালাকে ভালবাসে না। সম্ভ্রম ও পদমর্যাদার বিপুল ব্যবধান তাহাদের, মাঝখানে। তাহাদের মধ্যে যে কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে ইহা তাহার কল্পনার অতীত। উপরন্তু সে রাজার ভৃত্য, রাজার বাগ্‌দত্তা বধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে কোন্ স্পর্ধায়!

উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অসংযত দিগ্‌ভ্রান্ত চিন্তা নিষ্পন্ন হইবার পূর্বেই অর্জুন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিল শেষ রাত্রে। মল্লীমালার ম্রিয়মাণ গন্ধ তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল।

মালাটি তাহার বুকের কাছে ছিল। সে তাহা মুষ্টিতে লইয়া একবার সজোরে পেষণ করিল, তারপর দূরে সরাইয়া রাখিল। যাহাতে ওই গন্ধ নাকে না আসে।

কিন্তু ঘুম আর আসিল না। মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা-উর্ণনাভ জাল বুনিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে পাথরের আড়ালে অর্জুন ও বিদ্যুন্মালার নিম্নরূপ কথোপকথন হইল:

অর্জুন বলিল—'তুমি রাজকন্যা। আমি সামান্য মানুষ।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তুমি সামান্য মানুষ নও। তুমি যদুকুলোদ্ভব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার পূর্বপুরুষ।'

বিদ্যুন্মালা দেবীর মত একটি প্রস্তরখণ্ডে রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় বসিয়াছেন, অর্জুন তাঁহার সম্মুখে সমতল ভূমিতে পিছনে পা মুড়িয়া উপবিষ্ট। বিদ্যুন্মালার চক্ষু অর্জুনের মুখের উপর নিশ্চলভাবে নিবদ্ধ। তিনি যেন জীবন বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন। অর্জুনের দৃষ্টি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত এদিক-ওদিক ছটফট করিয়া ফিরিতেছে।

অর্জুন বলিল—'তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগ্‌দত্তা।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি কাউকে বাগ্‌দান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, আমি কেন তার দ্বারা আবদ্ধ হব?'

'তোমার পিতা তোমাকে দান করেছেন।'

'আমি কি পিতার তৈজস ? আমার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই!'

'শাস্ত্রে বলে স্ত্রীজাতি কখনো স্বাতন্ত্র্য পায় না।'

'ও শাস্ত্র আমি মানি না। আমার হৃদয় আমি যাকে ইচ্ছা দান করব।'

'তুমি অপাত্রে হৃদয় দান করেছ।'

'ও কথা আগে হয়ে গেছে। তুমি অপাত্র নও।'

অর্জুন কিছুক্ষণ নত মুখে রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল—'আমার দিক থেকে কথাটা চিন্তা করে দেখেছ ?'

বিদ্যুন্মালার মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামিয়া আসিল, চক্ষু বর্ষণ-শঙ্কিত হইল। তিনি বিদীর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—'তুমি কি আমাকে চাও না ?'

অর্জুন ক্লান্ত মস্তক বিদ্যুন্মালার জানুর উপর রাখিল, বিধুব কণ্ঠে বলিল—'চাওয়া না-চাওয়ার অবস্থা পার হয়ে গেছে। তিন দিন আগে আমি সজ্জন ছিলাম, আজ আমি কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক। রাজা আমাকে ভালবাসেন, আমাকে পরম বিশ্বাসের কাজ দিয়েছেন ; আর আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তুমি আমার এ কী সর্বনাশ করলে ?'

বিদ্যুন্মালার মুখের মেঘ কাটিয়া গিয়া ভাস্বর আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। বিজয়িনীর আনন্দ। তিনি অর্জুনের মাথায় হাত রাখিয়া কোমল স্বরে বলিলেন—'কেন তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ! রাজা হৃদয়বান লোক, তিনি তোমায় স্নেহ করেন, সবই সত্যি। কিন্তু তাঁর অনেক ভৃত্য-পরিচর আছে, তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে। এবং তিনি না থাকলেও তোমার চলবে। তুমি এ দেশের অধিবাসী নও। তুমি রাজার কাজ ছেড়ে দাও। চল, আমরা চুপি চুপি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।'

অর্জুন চমকিয়া মুখ তুলিল, বিভ্রান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'এ দেশ ছেড়ে চলে যাব! এই অমরাবতী ছেড়ে পালিয়ে যাব! কোথায় যাব ? ম্লেচ্ছের দেশে ? না, আমি পারব না।'

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুন্মালাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহার হাত ধরিলেন। তিনি কিছু বলিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় প্রান্তর-

স্তম্ভের অন্তরাল হইতে শব্দ শুনিয়া থমকিয়া গেলেন। অর্জুন শরীর শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা আর কিছু নয়, মঞ্জিরা আপন মনে গানের কলি গুঞ্জরণ করিতে করিতে খাবার লইয়া গুহার দিকে যাইতেছে। দুইজনে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মঞ্জিরা তাঁহাদের দেখিতে পাইল না, তাহার গানের গুঞ্জন দূরে মিলাইয়া গেল।

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কানে অধর স্পর্শ করিয়া চুপি চুপি বলিলেন —'আজ যাই। কাল আবার আসব।'

তিনি জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অর্জুন হর্ষ-বিষাদ ভরা অন্তরে গুহায় ফিরিতে ফিরিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাল আর সে বিদ্যুন্মালার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রহিল না। পরদিন সে যথাকালে যথাস্থানে আবার উপস্থিত হইল। যৌবন ও বিবেকবুদ্ধির দড়ি-টানাটানি চলিতে লাগিল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিল। কিন্তু সমস্যার নিষ্পত্তি হইল না।

॥ পাঁচ ॥

মহারাজ দেবরায় সৈন্য পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন কৃষ্ণ পক্ষের দশমী তিথিতে, শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে অগ্রদূত আসিয়া সংবাদ দিল, আগামী কল্য পূর্বাহ্নে মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। রাজপুরী এই এক পক্ষকাল যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, আবার চনমনে হইয়া উঠিল।

মণিকঙ্কণার হৃদয় আনন্দের হিন্দোলায় দুলিতেছে। কাল মহারাজ আসিবেন, কতদিন পরে তাঁহার দর্শন পাইব! প্রতীক্ষার উত্তেজনায় সে আত্মহারা। দিন কাটে তো রাত কাটে না।

বিদ্যুন্মালার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। রাজার অনুপস্থিতি কালে তিনি প্রবল হৃদয়বৃত্তির স্রোতে অবাধে ভাসিয়া

চলিয়াছিলেন, বাধাবিঘ্নগুলি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছিল ; এখন বাধাবিঘ্নগুলি পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল। তাঁহার সংকল্প তিলমাত্র বিচলিত হইল না, কিন্তু সংকল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা কঠিন নৈরাশ্যের আঘাতে ভূমিসাৎ হইল। কী হইবে! অর্জুন পলায়ন করিতে অসম্মত। তবে কি মৃত্যু ভিন্ন এ সংকট হইতে উদ্ধারের অন্য পথ নাই? বিদ্যুন্মালা উপাধানে মুখ গুঁজিয়া নীরবে কাঁদিলেন, চোখের জলে উপাধান সিক্ত হইল। কিন্তু অন্ধকারে পথের দিশা মিলিল না।

অর্জুনের অবস্থা বিদ্যুন্মালার অনুরূপ হইলেও তাহার মনে অনেকখানি আত্মগ্লানি মিশ্রিত আছে। বিদ্যুন্মালাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভালোবাসিয়াছে, মনের মধ্যে এমন নিবিড় প্রেমের অনুভূতি পূর্বে তাহার অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রেম যত গভীরই হোক, তাহার দ্বারা অপরাধ-বোধ তো দূর হয় না। প্রেম যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে তখনো মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার ক্রিয়া চলিয়াছে—আমি রাজার সহিত কৃতঘ্নতা করিয়াছি ; যিনি আমার অন্নদাতা, যিনি আমার প্রভু, তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। কেন বিদ্যুন্মালার প্রেম প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করি নাই, কেন বার বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। এখন কী হইবে! রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব কেমন করিয়া! তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া চাইব কোন সাহসে? তিনি যদি মুখ দেখিয়া মনের কথা বুঝিতে পারেন!…এ কথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলরামকেও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। বলরাম তাহার চিত্তবিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াছে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু সত্য উত্তর পায় নাই। সে ভাবিয়াছে অর্জুনের হৃদয় এখনো পিতৃশোকে মুহ্যমান।

এদিকের এই অবস্থা। ওদিকে কুমার কম্পন রাজার আশু প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া সর্বাঙ্গে উত্তেজনায় শিহরণ অনুভব করিলেন। সময় উপস্থিত ; আর বিলম্ব নয়। এবার গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হইবে। যাহারা রাজার বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র কেবল

সেইসব মন্ত্রী সভাসদকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। তারপর সকলে একত্রিত হইলে রাজার সঙ্গে সকলকে এক সঙ্গে নির্মূল করিতে হইবে। কবে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয়? কাল রাজা ফিরিবেন, হয়তো ক্লান্ত দেহে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিতে পারেন। সুতরাং পরশ্বই শুভদিন।

কুমার কম্পন বাছা বাছা রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন এবং নবনির্মিত গৃহে অতিথিসৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পিতা বীরবিজয়ের কথাও কম্পন ভুলিলেন না। বুড়া তাঁহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহার সদ্‌গতি করিতে হইবে।

পরদিন মধ্যাহ্নের দুই দণ্ড পূর্বে মহারাজ দেবরায় ডঙ্কা বাজাইয়া সদলবলে পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। সভাগৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করিতেছিল, তন্মধ্যে দুইজন প্রধান: কুমার কম্পন এবং ধন্নায়ক লক্ষ্মণ। সাত শত পুরপ্রহরিণী শঙ্খ বাজাইয়া তুমুল নির্ঘোষে রাজার সম্বর্ধনা করিল।

রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেই কুমার কম্পন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার জানু স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, বলিলেন—'আর্য, আপনি ছিলেন না, রাজপুরী অন্ধকার ছিল, আজ এক পক্ষ পরে আবার সূর্যোদয় হল।'

কুমার কম্পন অতিশয় মিষ্টভাষী, কিন্তু তাঁহার মুখেও কথাগুলি চাটুবাক্যের মত শুনাইল। রাজা একটু হাসিলেন, ভ্রাতার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'তোমার সংবাদ শুভ? গৃহপ্রবেশের আর বিলম্ব কত?'

কম্পন বলিলেন—'গৃহ প্রস্তুত। কেবল আপনার জন্য গৃহপ্রবেশ স্থগিত রেখেছি। কাল সন্ধ্যার সময় আপনাকে আমার নূতন গৃহে পদার্পণ করতে হবে আর্য। কাল আমার গৃহপ্রবেশের শুভমুহূর্ত স্থির হয়েছে।'

রাজা বলিলেন—'তোমার নূতন গৃহে অবশ্য পদার্পণ করব।'

'ধন্য।' কম্পন আর দাঁড়াইলেন না, বেশি কথা বলিলে পাছে

মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া পড়ে তাই তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

রাজা তখন মন্ত্রী উপমন্ত্রী সভাসদ্ বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি সমবেত প্রধানদের দিকে ফিরিলেন। প্রত্যেককে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া কিছু সংবাদের আদান-প্রদান করিয়া বিরাম-ভবনে প্রবেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে পিঙ্গলা আসিয়া দ্বিতলের বিশ্রামকক্ষের তত্ত্বাবধান করিয়াছিল, পাচকেরা রান্না চড়াইয়াছিল। রাজা অত্বরিতভাবে স্নান করিলেন, তারপর ধীরে সুস্থে আহারে বসিলেন। আহার শেষ হইতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

রাজা পালঙ্কে অঙ্গ প্রসারিত করিলেন। পিঙ্গলা ভূমিতলে বসিয়া পান সাজিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা অলসকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কলিঙ্গ-রাজকুমারীদের সংবাদ নিয়েছ?'

পিঙ্গলা বলিল—'তাঁরা কুশলে আছেন আর্য।'

এই সময় নব জলধরে বিজুরিরেখার ন্যায় মণিকঙ্কণা কক্ষে প্রবেশ করিল; ছায়াচ্ছন্ন কক্ষটি তাহার রূপের প্রভায় প্রভাময় হইয়া উঠিল।

তাহাকে দেখিয়া মহারাজ সহাস্যমুখে শয্যায় উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন; মণিকঙ্কণা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—'উঠবেন না মহারাজ, আপনি বিশ্রাম করুন। পিঙ্গলা তুমি ওঠো, আজ আমি মহারাজকে পান সেজে দেব।'

পিঙ্গলা হাসিমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। মণিকঙ্কণা তাহার স্থানে বসিয়া পান সাজিতে লাগিয়া গেল। রাজা পাশ ফিরিয়া অর্ধশয়ান-ভাবে তাহার তাম্বুল রচনা দেখিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা স্মিতমুখে বলিল—'ধন্য রাজকুমারী! পান সাজতেও জানেন!'

মণিকঙ্কণা পর্ণপত্রে খদির লেপন করিতে করিতে বলিল—'কেন জানব না! কতবার মাতাদের পান সেজে দিয়েছি। কলিঙ্গ দেশে পানের খুব প্রচলন। তবে উপকরণে বিশেষ আছে। পানের সঙ্গে গুয়া খদির কর্পূর দারুচিনি তো থাকেই, চুয়া কেয়া-খদির নারঙ্গফুলের ত্বক্ কেশর প্রভৃতিও থাকে।—এই নিন মহারাজ।'

মণিকঙ্কণা উঠিয়া পানের তবক রাজার সম্মুখে ধরিল; তিনি সেটি মুখে দিয়া কিছুক্ষণ চিবাইলেন, তারপর বলিলেন—'চমৎকার পান! তুমি এত ভাল পান সাজতে পার জানলে আগেই তোমার শরণ নিতাম। কাল থেকে তুমি নিত্য দ্বিপ্রহরে এসে আমার পান সেজে দেবে।'

মণিকঙ্কণা কৃতার্থ হইয়া বলিল—'তাই দেব মহারাজ। আমাদের সঙ্গে কিছু কলিঙ্গদেশীয় পানের উপকরণ আছে, তাই দিয়ে পান সেজে দেব।'

সে আবার পানের বাটা লইয়া বসিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিঃশব্দপদে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'ও মা, মন্ত্রীমশায় এলেন! এবার বুঝি রাজকার্য হবে। আমি তাহলে যাই।' রাজার প্রতি দীর্ঘ বিলম্বিত দৃষ্টি সম্পাত করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মন্ত্রী পালঙ্কের শিয়রের দিকে ভূমিতলে বসিলেন। পিঙ্গলা তাম্বুল করঙ্ক তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। রাজার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পর সে এখনো পলকের জন্য বিশ্রাম পায় নাই।

রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। মন্ত্রী মহাশয়ের নিবেদন করিবার বিশেষ কিছু ছিল না, তিনি সংক্ষেপে রাজ্য সম্বন্ধীয় বক্তব্য শেষ করিয়া বলিলেন—'একটা সংবাদ আছে; হুক্ক-বুক্কের প্রেতাত্মা দেখা দিয়েছে।'

রাজা শয্যায় উঠিয়া বসিলেন—'হুক্ক-বুক্ক দেখা দিয়েছেন! কে দেখেছে?'

মন্ত্রী বলিলেন—'অর্জুন ও বলরামের গুহা পাহারা দেবার জন্য যাদের নিয়োগ করেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন দেখেছে। অর্জুন ও বলরামও দেখেছে।'

'হুঁ।' মহারাজ কর্ণের মণিকুণ্ডল অঙ্গুলিতে ধরিয়া একটু নাড়াচাড়া করিলেন—'অনেক দিন পরে হুক্ক-বুক্ক দেখা দিলেন। সেই আহমদ

শা সুলতান হয়ে যখন বিজয়নগর আক্রমণ করেছিল তার আগে দেখা দিয়েছিলেন! আশঙ্কা হয়, দারুণ বিপদ আসন্ন। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসবে তা বুঝতে পারছি না।'

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—'সীমান্তের অবস্থা কেমন দেখলেন ?'

রাজা বলিলেন—'শত্রুর তৎপরতার কোনো চিহ্ন পেলাম না। আমার সীমান্তরক্ষী সেনাদল একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, আমাকে দেখে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।'

মন্ত্রী কিছুক্ষণ কুচকুচ করিয়া সুপারী কাটিলেন, তারপর নিজের জন্য পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন—'কুমার কম্পন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে বাছা বাছা কয়েকজন সদস্যকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছি। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।'

'কী ভাল লাগছে না ?'

এই নিমন্ত্রণের ভাবভঙ্গী। সন্দেহ হচ্ছে কুমার কম্পনের কোনো প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আছে। যে দ্বাদশ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাদের কারুর সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা নেই।'

'কিন্তু—প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি কী থাকতে পারে ?'

'তা জানি না। মহারাজ, আপনিও নিমন্ত্রিত, আমার মনে হয় আপনার না যাওয়াই ভাল।'

রাজার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'কম্পন আমাকে ভালবাসে, সে আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে, আমি ভাবতেও পারি না। তাছাড়া আমার অনিষ্ট করবার ক্ষমতা তার নেই।—আপনিও তো নিমন্ত্রিত হয়েছেন, আপনি কি যাবেন না ?'

মন্ত্রী পান মুখে দিয়া বলিলেন—'না মহারাজ, আমি যাব না। হুক্ক-বুক্ক দেখা দিয়েছেন, এ সময় আমাদের সকলেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই দ্বার-রক্ষিণী আসিয়া জানাইল, অর্জুনবর্মা ও বলরাম রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজার অনুমতি পাইয়া দুইজনে আসিয়া পালঙ্কের পদপ্রান্তে বসিল। অর্জুন রাজার মুখের দিকে একবার চক্ষু তুলিয়াই চক্ষু নত করিল। বলরাম যুক্তকরে বলিল—'আর্য, কামান তৈরি হয়েছে। সঙ্গে এনেছিলাম, প্রহরিণীর কাছে গচ্ছিত আছে।'

রাজা প্রহরিণীকে ডাকিয়া কামান আনিতে বলিলেন। কামান আসিলে প্রহরিণীকে বলিলেন—'বলরাম বা অর্জুন যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার কাছে আসতে চায়, তাদের বাধা দিও না।'

প্রহরিণী প্রস্থান করিলে বলরাম উঠিয়া কামান রাজার হাতে দিল। একহস্ত পরিমাণ যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা বক-যন্ত্রের মত। রাজা সেটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রীর হাতে দিলেন, বলিলেন—'যন্ত্রের প্রক্রিয়া বুঝেছি। যন্ত্র চালিয়ে দেখেছ?'

বলরাম বলিল—'আজ্ঞা দেখেছি, ঠিক চলে। অর্জুন আর আমি একদিন বনের মধ্যে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। পঞ্চাশ হাত দূর পর্যন্ত প্রাণঘাতী লক্ষ্যভেদ করতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'ভাল, আমিও পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কাল প্রত্যূষে তোমরা আসবে, দক্ষিণের জঙ্গলে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার জন্যে কি কি বস্তু প্রয়োজন?'

বলরাম বলিল—'বেশি কিছু নয় আর্য, গোটা তিনেক মাটির কলসী হলেই চলবে। বাকি যা কিছু—গুলি বারুদ কার্পাসবস্ত্র নারিকেল-রজ্জু—আমি নিয়ে আসব।'

রাজা প্রশ্ন করিলেন—'লৌহ-নালিকা প্রস্তুতের কৌশল প্রকাশ করতে চাও না?'

বলরাম আবার যুক্তপাণি হইল—'মহারাজ, এটি আমার নিজস্ব গুপ্তবিদ্যা। যদি উপযুক্ত শিষ্য পাই তাকে শেখাব।'

'ভাল। তুমি একা এই লঘু-কামান কত তৈয়ার করতে পার?'

'মাসে তিনটা তৈয়ার করতে পারব।'

রাজা ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'তবে তোমার গুপ্তবিদ্যা গুপ্তই থাক। অন্তত শত্রুপক্ষ জানতে পারবে না।'

পরদিন উষাকালে রাজা বলরাম ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণের জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। জঙ্গল নামমাত্র, রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক গাছপালার ফাঁকে শিলাকীর্ণ অসম ভূমি। তিনটি মৃৎকলস পাশাপাশি বসাইয়া বলরাম কলস হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে সরিয়া আসিয়া লক্ষ্যভেদের জন্য প্রস্তুত হইল।

প্রথমে সে কামানটির নলের মুখ দিয়া অর্ধমুষ্টি বারুদ প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ক্ষুদ্র একখণ্ড কার্পাস নলের মুখে ঠাসিয়া দিল; কামানের পশ্চাদ্ভাগে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে একটু বারুদের গুঁড়া দেখা গেল। তখন সে নলের মুখে মটরের মত কয়েকটি লৌহ-গুটিকা প্রবিষ্ট করাইয়া আবার কার্পাসখণ্ড দিয়া মুখ বন্ধ করিল। বলিল—'মহারাজ, কামান তৈরি। এখন আগুন দিলেই গুলি বেরুবে।'

রাজা বলিলেন—'দাও আগুন।'

বলরাম একটি অগ্নিমুখ নারিকেল-রজ্জু সঙ্গে আনিয়াছিল, সে কলসীর দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া কামানের পিছন দিকে অগ্নিস্পর্শ করিল। অমনি সশব্দে কামান হইতে গুলি বাহির হইয়া পঞ্চাশ হাত দূরের তিনটি কলস চূর্ণ করিয়া দিল।

রাজা সহর্ষে বলরামের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'ধন্য! আজ থেকে অর্জুনের মত তুমিও আমার ভৃত্য হলে।—এই লঘু কামান আমি নিলাম।'

॥ ছয় ॥

সন্ধ্যার পর কুমার কম্পনের নূতন প্রাসাদ দীপমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। প্রাসাদের তোরণশীর্ষে একদল বাদ্যকর মধুর বাদ্যধ্বনি করিতেছিল। গৃহপ্রবেশের শুভমুহূর্ত সমাগত।

প্রাসাদে এখনো পুরস্ত্রীগণের শুভাগমন হয় নাই। কেবল কয়েকজন যণ্ডামার্ক ভৃত্য আছে; আর আছে স্বয়ং কুমার কম্পন।

অতিথিরা একে একে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় বেশি নয়, মাত্র দ্বাদশ জন।

কুমার কম্পন পরম সমাদরের সহিত সকলকে গোষ্ঠাগারে বসাইলেন। তাঁহার মুখের অম্লান হাসির উপর মনের আরক্ত ছায়া পড়িল না।

দ্বাদশজন সমবেত হইলে কুমার কম্পন বলিলেন—'আমি মানস করেছি আমার গৃহের প্রত্যেকটি কক্ষে একটি করে অতিথিকে ভোজন করাব। তাহলে আমার সমস্ত গৃহ পবিত্র হবে।'

অতিথিরা হর্ষ জ্ঞাপন করিলেন। কুমার কম্পন একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'জীমূতবাহন ভদ্র, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি আগে আসুন।'

বয়োজ্যেষ্ঠ জীমূতবাহন ভদ্র গাত্রোত্থান করিয়া কুমার কম্পনের অনুসরণ করিলেন। বাকী সকলে বসিয়া নিজ নিজ বয়সের তুলনা-মূলক আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কুমার কম্পন অতিথিকে একটি কক্ষে লইয়া গেলেন। বহু দীপের আলোকে কক্ষটি প্রভান্বিত, শঙ্খশুভ্র কুট্টিমের উপর শ্বেতপ্রস্তরের পীঠিকা, পীঠিকার সম্মুখে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনপরিপূর্ণ থালি। দুইজন ভৃত্য অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, একজনের হাতে ভৃঙ্গার ও পানপাত্র, অন্য ভৃত্য চামর লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

কুমার কম্পন অতিথিকে বলিলেন—'আসন গ্রহণ করুন ভদ্র।'

ভদ্র পীঠিকায় উপবিষ্ট হইলেন। কুমার কম্পন বলিলেন—'অগ্রে ফলাম্লরস পান করুন ভদ্র।'

ভৃত্য পানপাত্রে পানীয় ঢালিয়া ভদ্রের হাতে দিল, ভদ্র পানপাত্র মুখে দিয়া এক নিশ্বাসে পান করিলেন। পাত্র ভৃত্যের হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া তিনি ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন।

কুমার কম্পন অপলক নেত্রে অতিথিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তাঁহার মুখে চকিত হাসি ফুটিল। অব্যর্থ বিষ, বিষবৈদ্য যাহা

বলিয়াছিল মিথ্যা নয়। তিনি ভৃত্যদের ইঙ্গিত করিলেন, ভৃত্যেরা অতিথির মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া পিছনের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।

কুমার কম্পনের মস্তকে ধীরে ধীরে হত্যার মাদকতা চড়িতেছে, চোখের দৃষ্টি ঈষৎ অরুণাভ হইয়াছে। তিনি অন্য অতিথিদের কাছে ফিরিয়া গেলেন, মধুর হাসিয়া বলিলেন—'ভদ্র কুমারাপ্পা, এবার আপনি আসুন।'

কুমারাপ্পা মহাশয় সানন্দে গাত্রোত্থান করিলেন।

এইভাবে কুমার কম্পন একটির পর একটি করিয়া দ্বাদশটি অতিথির সৎকার করিলেন। এই কার্য সমাপ্ত করিতে একদণ্ড সময়ও লাগিল না।

কুমার কম্পনের মাথায় রক্তের নেশা পাক খাইতেছে, তিনি চারিদিক রক্তবর্ণ দেখিতেছেন, সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া অসহ্য অধীরতায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিতেছে। রাজা এখনো আসিতেছে না কেন! তবে কি আসিবে না! যদি না আসে?

গৃহে ভৃত্যেরা ছাড়া অন্য কেহ নাই। অন্য কেহ আসিবে না। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা নিঃশেষিত হইয়াছে। বাকী শুধু রাজা। রাজা যদি কিছু সন্দেহ করিয়া থাকে সে আসিবে না। লক্ষ্মণ মল্লপও আসে নাই, হয়তো লক্ষ্মণ মল্লপই রাজাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে—!

কুমার কম্পনের মাথার মধ্যে রক্তস্রোত তোলপাড় করিতেছিল, অধিক সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। রাজা যদি না আসে আমিই তাহার কাছে যাইব। সে এই সময় একাকী বিরাম-কক্ষে থাকে। যদি বা লক্ষ্মণ মল্লপ সঙ্গে থাকে তবে একসঙ্গে দুজনকেই বধ করিব।

ভৃত্যদের সাবধান করিয়া দিয়া কুমার কম্পন একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা কটিবস্ত্রে বাঁধিয়া লইলেন; তারপর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তোরণশীর্ষে মধুর বাদ্যধ্বনি চলিতে লাগিল।

তোরণের বাহিরে আসিয়া একটা কথা কুমার কম্পনের মনে পড়িল, তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ পিতা বিজয় রায়। সে কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখিতে পারে না, সে যদি বাঁচিয়া থাকে তবে নানা

অনর্থ ঘটাইবে। সুতরাং তাহাকেই সর্বাগ্রে বিনাশ করা প্রয়োজন।

রাজ-পিতা বিজয় রায়ের ভবন অধিক দূর নয়, কুমার কম্পন সেইদিকে চলিলেন।

বিজয় রায়ের ভবনে পাহারার ব্যবস্থা নামমাত্র, ভবন-দাসীর সংখ্যাও বেশি নয়; বৃদ্ধ ঘটা-চটা ভালবাসেন না। তোরণদ্বারের কাছে দুইজন প্রহরী বসিয়া দুইজন ভবন-দাসীর সঙ্গে রসালাপ করিতেছিল; কুমার কম্পনকে দেখিয়া তাহারা সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমার কম্পন পিতৃভবনে কখনো আসেন না।

তিনি কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুত্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আশঙ্কার কথা কিছু নাই, তাহারা ভাবিতে লাগিল শিষ্টাচারের কোনো ত্রুটি হইল কি না।

ভবনের দ্বিতলে বসিয়া বিজয় রায় তখন এক নূতন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছিলেন। যবচূর্ণ শক্তু তালের রসে মাখিয়া পিণ্ডক্ষীরের সহিত থাসিয়া পাক করিলে উত্তম নাড়ু হয় কিনা পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় কম্পন গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিজয় রায় মুখ তুলিয়া ভ্রূকুটি কবিলেন, বলিলেন—'কম্পন! কী চাও?'

কুমার কম্পন উত্তর দিলেন না, ক্ষিপ্রহস্তে কটি হইতে ছুরিকা লইয়া পিতার বক্ষে আঘাত করিলেন। ছুরিকা পঞ্জরের অন্তর দিয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল। বিজয় রায় চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কেবল একটি ত্রস্ত-বিস্মিত শব্দ বাহির হইল —'অধম—!' তারপর তাঁহার অক্ষিপটল উল্টাইয়া গেল।

কম্পন তাঁহার বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া আবার কটিতে রাখিলেন। পিতার মুখের পানে আর চাহিলেন না, দ্রুত নামিয়া চলিলেন।

সূর্যাস্তকালে অর্জুন অভ্যাসমত সভাগৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়াছিল।

অভ্যাসবশতই লাঠি দু'টি তাহার সঙ্গে ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, মহারাজ সভা ভঙ্গ করিয়া দ্বিতলে প্রস্থান করিলেন। তবু অর্জুন প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোনো নিমিত্ত ছিল না, রাজা তাহাকে আহ্বান করেন নাই, কিন্তু তাহার মন তথাপি গুহায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। এই গৃহে বিদ্যুন্মালা আছেন তাই কি সে নিজের অজ্ঞাতে এই গৃহের ছায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, অকারণে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায়? মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়, মন কখন মানুষকে কোন দিকে টানিতেছে, কোন দিকে ঠেলিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না।

চাঁদ উঠিয়াছে। প্রাঙ্গণ জনবিরল হইয়া গিয়াছে। সহসা অর্জুন দেখিল কুমার কম্পন আসিতেছেন। তাঁহার গতিভঙ্গিতে অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। তিনি অর্জুনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না, সভাগৃহের দ্বারের অভিমুখে চলিলেন। অর্জুন চকিত হইয়া লক্ষ্য করিল তাহার কটিতে এক ছুরিকা আবদ্ধ রহিয়াছে। কম্পন অবশ্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, কিন্তু সঙ্গে ছুরি কেন? অস্ত্র লইয়া রাজার সম্মুখীন হওয়া নিষিদ্ধ। বিদ্যুদ্বেগে কয়েকটি চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল।

কুমার কম্পন সোপান বাহিয়া দ্রুতপদে উঠিতে লাগিলেন। সোপানের প্রতিহারিণীরা বাধা দিল না, কারণ রাজসকাশে কম্পনের অবাধ গতি।

কম্পন রাজার বিরামকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দীপান্বিত কক্ষে অন্য কেহ নাই, রাজা পালঙ্কে শুইয়া চক্ষু মুদিয়া আছেন। বোধহয় নিদ্রিত। কম্পন ক্ষিপ্রচরণে সেইদিকে চলিলেন।

রাজা কিন্তু নিদ্রা যান নাই, চক্ষু মুদিয়া রাজ্য-চিন্তা করিতে-ছিলেন। পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। কম্পনের ভাবভঙ্গী স্বাভাবিক নয়। রাজা ঈষৎ বিস্মিত স্বরে বলিলেন—'কম্পন, কী চাও?' তিনি গৃহপ্রবেশের কথা ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন।

কম্পনের হিংস্র মুখে হাসি ফুটিল। তিনি ছুরিকা হাতে লইয়া বলিলেন—'রাজ্য চাই।'

তারপর যাহা ঘটিল তাহা প্রায় নিঃশব্দে ঘটিল। রাজা নিরস্ত্র বসিয়া আছেন। কুমার কম্পন তাঁহার কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইলেন। রাজা অবশে আত্মরক্ষার জন্য বাম বাহু তুলিলেন, ছুরি তাঁহার কফোনির নিম্নে বাহুর পশ্চাদ্দিকে বিদ্ধ হইল। প্রথমবার ব্যর্থ হইয়া কম্পন আবার ছুরি তুলিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে ছুরি চালাইতে হইল না, অকস্মাৎ পিছন হইতে তীক্ষ্ণাগ্র বংশ-ভল্ল আসিয়া তাঁহার গ্রীবামূলে বিদ্ধ হইল। কম্পন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পালঙ্কের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন।

রাজাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, এক দৃষ্টে মৃত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বাহু হইতে গলগল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

'মহারাজ, আপনি আহত!'

রাজা অর্জুনের পানে চক্ষু তুলিলেন। অর্জুন দেখিল, রাজার চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

রাজা কণ্ঠস্বর সংযত করিতে করিতে বলিলেন—'অর্জুন, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ।'

অর্জুন নীরব রহিল।

এই সময় পিঙ্গলা কক্ষে প্রবেশ করিল, রাজার রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—'এ কী, মহারাজ আহত! কে এ কাজ করল! ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়'—

বিভিন্ন দ্বার দিয়া কঞ্চুকী পাচক প্রহরিণী অনেকগুলি লোক কক্ষে প্রবেশ করিল এবং রাজার শোণিতলিপ্ত দেহ দেখিয়া স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাজা সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'কম্পন আমাকে হত্যা করতে এসেছিল, অর্জুন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমার আঘাত মারাত্মক নয়, তবে ছুরিকায় যদি বিষ থাকে—'

মণিকঙ্কণা পিঙ্গলার চীৎকার শুনিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া লইল, তারপর ত্বরিতে উঠিয়া নিজের বস্ত্র হইতে পট্টিকা ছিঁড়িয়া রাজার বাহুর ঊর্ধ্বভাগে শক্ত করিয়া তাগা বাঁধিয়া দিল। গলদশ্রু নেত্রে অস্ফুট-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'দারুব্রহ্ম! এ কি হল—এ কি হল'—

ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন, কক্ষে ভিড় দেখিয়া তিনি ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিলেন; রাজার অবস্থা এবং কুমার কম্পনের মৃতদেহ দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। রাজার সহিত তাঁহার একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল; রাজা করুণ হাসিয়া যেন তাহাকে জানাইলেন—তোমার সন্দেহই সত্য।

মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্মণ মল্লপ সারথির বল্‌গা নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন; তাঁহার আকৃতি ভিন্নমূর্তি ধারণ করিল। তিনি সকলের দিকে আদেশের কণ্ঠে বলিলেন—'তোমরা এখানে কি করছ? যাও, নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাও।—পিঙ্গলা, তুমি ছুটে যাও, শীঘ্র বৈদ্যরাজকে ডেকে নিয়ে এস।—অর্জুন, তুমি যেও না, তোমাকে প্রয়োজন হবে।'

কক্ষ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মণিকঙ্কণা ও অর্জুন রহিল। বিদ্যুন্মালাও একবার কক্ষে আসিয়াছিলেন; দৃশ্য দেখিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া গিয়া দু হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ মণিকঙ্কণাকে বলিলেন—'দেবিকা, আপনি এখন নিজ কক্ষে ফিরে যান, আর কোনো শঙ্কা নেই।'

মণিকঙ্কণা উঠিল না, রাজার পৃষ্ঠ বাহুবেষ্টিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—'আমি যাব না।'

ভয়ঙ্কর বার্তা মুখে মুখে পৌরভূমির সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রানীদের কানে সংবাদ উঠিয়াছিল। তাঁহারা রাজাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজার অনুমতি ব্যতীত তাঁহাদের ভবন হইতে বাহিরে আসিবার অধিকার নাই। সকলে নিজ নিজ মহলে

আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। দেবী পদ্মালয়াম্বিকা দীপহীন কক্ষে পুত্র মল্লিকার্জুনকে কোলে লইয়া পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বৈদ্যরাজ দামোদর স্বামীর গৃহ রাজ-পুরভূমির মধ্যেই। সেদিন সন্ধ্যার পর রসরাজ মহাশয় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই বৃদ্ধের মধ্যে ইত্যবসরে প্রণয় অতিশয় গাঢ় হইয়াছিল। দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া দ্রাক্ষাসব পান করিতেছিলেন; মৃদুমন্দ বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। এমন সময় পিঙ্গলা ঝটিকার ন্যায় আসিয়া দুঃসংবাদ দিল। দুই বৃদ্ধ পরস্পরের হাত ধরিয়া উঠি-পড়ি ভাবে রাজভবনের দিকে ছুটিলেন। পিঙ্গলা ঔষধের পেটরা লইয়া সঙ্গে ছুটিল।

রাজার বিরাম-ভবন হইতে তখন কম্পনের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে পিতার ও দ্বাদশজন সভাসদের মৃত্যুসংবাদও রাজা পাইয়াছেন। তিনি অবসন্ন দেহভার মণিকঙ্কণার দেহে অর্পণ করিয়া মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছেন। ক্ষত হইতে অল্প রক্ত ক্ষরিত হইতেছে।

দামোদর ও হ্রস্বদৃষ্টি রসরাজ দ্রুত স্খলিত পদে প্রবেশ করিলেন। দামোদর হাত তুলিয়া বলিলেন—'জয় ধন্বন্তরি! কোনো ভয় নেই। স্বস্তি স্বস্তি।'

তিনি পালঙ্কে রাজার পাশে বসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন, মুখে চট্‌কার শব্দ করিলেন, তারপর রাজার দক্ষিণ মণিবন্ধে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া নাড়ী পরীক্ষায় ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি মাথা নাড়িয়া চোখ খুলিলেন—'না, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। নাড়ী ঈষৎ দমিত, কিন্তু বিষক্রিয়ার কোনো লক্ষণ নেই।—রসরাজ মহাশয়, আপনি দেখুন।'

রসরাজ রাজার নাড়ী দেখিলেন, তারপর সহর্ষে বলিলেন—'বৈদ্যরাজ যথার্থ বলেছেন। রাজদেহে কণামাত্র বিষের প্রকোপ নেই। স্বস্তি স্বস্তি। এখন ক্ষতস্থানে প্রলেপাদির ব্যবস্থা করলেই রাজা অচিরাৎ নিরাময় হবেন।'

তখন ক্ষত চিকিৎসার উপযোগ হইল। তাগা খুলিয়া দিয়া ক্ষতস্থান

পরিষ্কৃত হইল; দামোদর স্বামী তাহাতে শতধৌত ঘৃতের প্রলেপ লাগাইলেন, ক্ষত বন্ধন করিলেন না। তারপর রাজাকে অরিষ্ট পান করাইয়া পুনরায় নাড়ী পরীক্ষাপূর্বক নাড়ীর উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সানন্দে বহু আশীর্বাদ আবৃত্তি করিতে করিতে রাত্রির জন্য প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ অর্জুনের সঙ্গে কক্ষের এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এখন রাজার পালঙ্কের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'অর্জুনকে মধ্যম কুমারের শিবিরে পাঠাচ্ছি। তিনি দূরে আছেন, হয়তো অন্যের মুখে বিকৃত সংবাদ শুনে বিচলিত হবেন।'

রাজা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'তাই করুন।—কী হয়ে গেল! কম্পন পিতাকে পর্যন্ত---। অর্জুন, তুমি কোথায় ছিলে? কেমন করে যথাসময়ে উপস্থিত হলে?'

অর্জুন বলিল—'আর্য, আমি প্রাঙ্গণে ছিলাম, কুমার কম্পনকে আসতে দেখলাম। তাঁর ভাবভঙ্গী ভাল লাগল না, তাঁর কটিতে ছুরিকা দেখে সন্দেহ হল। তাই তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তাঁর অভিসন্ধি সঠিক বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারলে মহারাজ অক্ষত থাকতেন।'

রাজা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'হুক্ক-বুক্কের আবির্ভাব মিথ্যা নয়, হয়তো এই জন্যই এসেছিলেন।—অর্জুন, তুমি আজ যে-কাজে যাচ্ছ যাও, এই মুদ্রাঙ্গুরীয় নাও, বিজয়কে দেখিও, তারপর তাকে সব কথা মুখে বোলো।—আর ফিরে এসে তুমি আমার দেহ-রক্ষীর কাজ করবে, প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রাণরক্ষার ভার তোমার।'

অর্জুন নত হইয়া যুক্তকরে রাজাকে প্রণাম করিল। অল্পকাল পরে মন্ত্রী তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মণিকঙ্কণা রাজাকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল না। রাত্রে সে ও পিঙ্গলা রাজার কাছে রহিল।

চতুর্থ পর্ব

॥ এক ॥

রাজার প্রতি আক্রমণের সংবাদ প্রচারিত হইলে কিছুদিন খুব উত্তেজিত আলোড়ন চলিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইল। রাজার ক্ষত দু'চার দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইল, তিনি নিয়মিত সভায় আসিতে লাগিলেন। রাজ্যের লোক নিশ্চিন্ত হইল।

কুমার কম্পনের মৃতদেহ কোলে লইয়া তাঁহার দুই পত্নী কৃষ্ণা দেবী ও গিরিজা দেবী সহমৃতা হইয়াছেন। বিনা দোষে দুই অভাগিনীর অকালে জীবনান্ত হইল।

বিজয়নগরের জীবনযাত্রা আবার পুরাতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে আকাশে নববর্ষার সূচনা দেখা যাইতেছে। কুমারী বিদ্যুন্মালা যথারীতি পম্পাপতির মন্দিরে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহার অন্তরে হরিষে বিষাদ। শ্রাবণ মাস দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; কিন্তু অর্জুনকে তিনি কাছে পাইয়াছেন। অর্জুন সারা দিন রাজার কাছে থাকে, রাজা সভায় যাইলে তাঁহার পিছনে যায়, সিংহাসনের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি বিরাম-ভবনে আসিলে কখনো তাঁহার কক্ষে থাকে, কখনো কক্ষের আশেপাশে অলিন্দে চত্বরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিদ্যুন্মালার মন সর্বদা সেই দিকে পরিয়া থাকে। তিনি সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান; যখনি দেখেন অর্জুন অলিন্দে একাকী আছে তখনি লঘুপদে আসিয়া তাহার দেহে হাত রাখিয়া স্পর্শ করিয়া যান, অস্ফুট কণ্ঠে একটি-দুইটি কথা বলেন। কিন্তু এই সুখ ক্ষণিকের, ইহাতে ভবিষ্যতের আশ্বাস নাই। বিদ্যুন্মালার মন হর্ষ-বিষাদে দোল খাইতে থাকে।

মণিকঙ্কণার জীবনে নূতন এক আনন্দময় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে সে চুরি করিয়া রাজাকে দেখিয়া যাইত, এখন রাজা যখনই

বিরাম-ভবনে আসেন সে তাঁহার কাছে আসিয়া বসে। রাজার মনের উপর একটা দাগ পড়িয়াছে, প্রায়ই বিমনা হইয়া বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতার কথা চিন্তা করেন, লোভী কৃতঘ্ন ভ্রাতার জন্য প্রাণ কাঁদে। মণিকঙ্কণা পালঙ্কের পাশে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প জুড়িয়া দেয়—কলিঙ্গ দেশের কথা, পিতামাতার কথা, আরো কত রকম কথা। তারপর পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসে, নিজের দেশের খদিরাদি উপকরণ দিয়া পান সাজিয়া রাজাকে খাওয়ায়। পিঙ্গলা কখনো ঘরে আসিলে তাহাকে বলে—'তুই যা, আমি রাজার কাছে আছি।'

মণিকঙ্কণার সংসর্গে রাজার মন উৎফুল্ল হয়, তিনি কম্পনের কথা ভুলিয়া যান।

প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরের নিমগ্ন প্রদেশে একটি নিভৃত রস-সত্তা আছে, রাজার সেই রস-সত্তা মণিকঙ্কণার সান্নিধ্যে উন্মোচিত হয়। মণিকঙ্কণার সহিত রাজা একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন। ইহা পতি-পত্নীর স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ নয়, যেন তদপেক্ষাও নিগূঢ়-ঘনিষ্ঠ একটি রসোল্লাস।

একদিন রাজা রহস্য করিয়া বলিলেন—'কঙ্কণা, তোমার ভগিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিয়েটাও দেব স্থির করেছি, কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে দেব ভেবে পাচ্ছি না।'

মণিকঙ্কণা ক্ষণেক অবাক হইয়া চাহিল, তারপর বলিল—'আমি কাকে চাই আমি জানি।'

রাজা বুঝিলেন, গূঢ় হাস্য করিয়া বলিলেন—'কিন্তু তুমি যাকে চাও সে যদি তোমাকে না চায়?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তাহলে চিরজীবন কুমারী থাকব। দিনান্তে যদি একবার দেখতে পাই তাহলেই আমার যথেষ্ট।'

রাজার হৃদয় প্রগাঢ় রসমাধুর্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি মণিকঙ্কণার বেণীতে একটু টান দিয়া বলিলেন—'আচ্ছা সে দেখা যাবে!'—

আষাঢ়ের নীলাঞ্জন মেঘ একদিন অপরাহ্ণে ঝড় লইয়া আসিল, প্রবলবেগে করকাপাত করিয়া চলিয়া গেল। দশদিক শীতল হইল।

দামোদর স্বামী নিজ গৃহের উঠান হইতে কিছু করকা-শিলা চয়ন করিয়া বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় লাঠি ধরিয়া রসরাজ আসিলেন। দামোদর স্বামী বলিলেন—'এস বন্ধু, আজ করকা সহযোগে মাধ্বী পান করা যাক।'

দামোদরের স্ত্রী-পরিবার নাই, একটি যুবতী দাসী তাঁহার সেবা করে। দাসী আসিয়া ঘরে দীপ জ্বালিয়া মন্দুরা পাতিয়া দিয়া গেল। দুই বন্ধু মাধ্বীর ভাণ্ড লইয়া বসিলেন। দামোদর করকা-শিলার পুঁটলি খুলিলেন; করকাখণ্ডগুলি জমাট বাঁধিয়া শুভ্র বিম্বফলের আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি সন্তর্পণে শীতল পিণ্ডটি তুলিয়া মাধ্বীর ভাণ্ডে ছাড়িয়া দিলেন। মাধ্বী শীতল হইলে দুইজনে পাত্রে ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন।

দাসী আসিয়া থালিকায় ভর্জিত বেসনের ঝাল-বড়া রাখিয়া গেল।

পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে জল্পনা চলিল। কেবল নিদান শাস্ত্রের আলোচনা নয়, মাধ্বীর মাদক প্রভাব যত বাড়িতে লাগিল, দুই বৃদ্ধের জিহ্বা ততই শিথিল হইল। রসের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। রসরাজ উৎকল-প্রেয়সীদের রতি-চাতুর্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিলেন; প্রত্যুত্তরে দামোদর স্বামী কর্ণাটকামিনীদের বিলাসবিভ্রম ও রসনৈপুণ্যের আলোচনায় পঞ্চমুখ হইলেন।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, সুধাভাণ্ড শেষ হইয়া আসিল। দু'জনেরই মাথায় রুমঝুম অপ্সরীর নূপুর বাজিতেছে, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ। রাজা-রানীদের সম্বন্ধে গুপ্তকথার আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়া গেল।

দামোদর স্বামী গলার মধ্যে সংহত গভীর হাস্য করিলেন, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন—'বন্ধু, একটি গুপ্ত কথা আছে যা রাজা আর আমি জানি, আর কেউ জানে না।'

রসরাজ মধুভাণ্ডটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া শেষ করিলেন, বলিলেন—'তাই নাকি!'

দামোদর বলিলেন—'হুঁ। রাজার মধ্যমা রানী অসূর্যম্পশ্যা, শুনেছ কি?'

রসরাজ আবার বলিলেন—'তাই নাকি! কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা কেন? এ দেশে তো ও রীতি নেই।'

দামোদর বলিলেন—'না। প্রকৃত রহস্য কেউ জানে না। একবার মধ্যমার রোগ হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করেছিলাম। তাই আমি জানি।'

'তাই নাকি! রহস্যটা কী?'

'মধ্যমা অপূর্বসুন্দরী, কিন্তু দাঁত নেই; জন্মাবধি একটিও দাঁত গজায়নি। একেবারে ফোক্‌লা।'

'তাই নাকি! এ রকম তো দেখা যায় না।' রসরাজ দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন—'হুঁ হুঁ হুঁ। রানী ফোক্‌লা।'

দামোদর বলিলেন—'রাজা কিন্তু সেজন্য মধ্যমাকে কম স্নেহ করেন না! রাজাদের সব রকম চাই—খি খি খি—বুঝলে?'

রসরাজ বলিলেন—'তা বটে। সব যদি এক রকম হয় তাহলে পাঁচটা বিয়ে করে লাভ কি!'

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামিলে দামোদর ভাণ্ড পরীক্ষা করিলেন; ভাণ্ড শূন্য দেখিয়া বলিলেন—'রাত হয়েছে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমি কানা মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় যাবে।'

দুই বন্ধু বাহির হইলেন। অতিথি-ভবন বেশি দূর নয়, সেখানে উপস্থিত হইয়া রসরাজ বলিলেন—'তুমি একলা ফিরবে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দু'জনে ফিরিলেন। দামোদর নিজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তাই তো, তুমি এখন ফিরবে কি করে? চল তোমাকে পৌঁছে দিই।'

এইভাবে পরস্পরকে পৌঁছাইয়া দেওয়া কতক্ষণ চলিল বলা যায় না। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল দুই বন্ধু দামোদর স্বামীর বহিঃকক্ষে মন্দুরার উপর শয়ন করিয়া পরম আরামে নিদ্রা যাইতেছেন।

গুহার মধ্যে বলরাম ও মঞ্জিরার প্রণয় ঘনাবর্ত দুগ্ধের ন্যায় যৌবনের তাপে ক্রমশ গাঢ় হইতেছে। অর্জুন আজকাল দিনের বেলা গুহায় থাকে না, রাজার সঙ্গে থাকে, তাই তাহাদের সমাগম নিরঙ্কুশ। মঞ্জিরা দ্বিপ্রহরে কেবল বলরামের খাবার লইয়া আসে। বলরামের আহার শেষ হইলে দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া গল্প করে। কখনো বলরাম চুল্লী জ্বালিয়া কাজ আরম্ভ করে, মঞ্জিরা হাপরের দড়ি টানে; বায়ুর প্রবাহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, আগুনের মধ্যে লোহার পত্রিকা রক্তিমবর্ণ ধারণ করে। বলরাম আগুন হইতে পত্রিকা বাহির করিয়া এক লৌহদণ্ডের চারিপাশে ঠুকিয়া ঠুকিয়া পেঁচ দিয়া জড়ায়; লোহা ঠাণ্ডা হইলে আবার আগুনে রক্তবর্ণ করিয়া লৌহদণ্ডের চারিপাশে জড়ায়। এইভাবে ধীরে ধীরে লোহার নল প্রস্তুত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র কামানের অর্থাৎ বন্দুকের নল তৈরি করিবার ইহাই তাহার গুপ্ত কৌশল।

কখনো তাহারা মৃদঙ্গ ও বাঁশী লইয়া বসে। বলরাম মঞ্জিরার চোখে চোখ রাখিয়া গায়—

প্রিয়ে চারুশীলে প্রিয়ে চারুশীলে
মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

মঞ্জিরা শান্ত ধীর প্রকৃতির মেয়ে, বলরামের একটু প্রগল্‌ভতা বেশি। কিন্তু তাহাদের আসক্তি শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যায় না।

এইভাবে চলিতেছে, হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে মঞ্জিরা আসিল না। তাহার পরিবর্তে অন্য একটি মেয়ে খাবার লইয়া আসিল।

বলরাম চক্ষু পাকাইয়া বলিল—'তুমি কে? মঞ্জিরা কোথায়?'

নূতনা বলিল—'আমি সুভদ্রা। মঞ্জিরা বাপের বাড়ি গিয়েছে, তাই আমি খাবার নিয়ে এসেছি।'

'বাপের বাড়ি গিয়েছে!' মঞ্জিরার বাপের বাড়ি থাকিতে পারে একথা পূর্বে বলরামের মনে আসে নাই—'বাপের বাড়ি গিয়েছে কেন?'

'তার আম্মার অসুখ, খবর পেয়ে কাল রাত্রেই সে চলে গেছে।'

'আম্মা মানে তো দাদা! দাদার অসুখ!—তা কবে ফিরবে?'

'তা কি জানি!'

'হুঁ। মঞ্জিরার বাপের নাম কি?'

'বীরভদ্র। তিনি রাজার হাতিশালে কাজ করেন।'

'হুঁ। বাড়ী কোথায়?'

'নীচু নগরে। পান-সুপারি রাস্তার পূবে তুঙ্গভদ্রার তীরে তাঁর বাড়ী।'

'বটে।' বলরাম আহারে বসিল। নবাগতা সুভদ্রা মঞ্জিরার সখী, বলরামের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

আহারের পর সুভদ্রা পাত্রাদি লইয়া প্রস্থান করিবার পর বলরাম চিন্তা করিতে লাগিল। কি করা যায়! মঞ্জিরা কবে আসিবে কিছুই ঠিক নাই। তাহার পিতা হস্তিপক বীরভদ্রকে হস্তিশালা হইতে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু তাহাতে লাভ কি! মঞ্জিরার বাপকে দর্শন করিলে তো প্রাণ জুড়াইবে না। বরং তাহার গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিলে কাজ হইবে।

তৃতীয় প্রহরে বলরাম পরিষ্কার বস্ত্র উত্তরীয় পরিধান করিয়া বাহির হইল। নীচু নগরে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পল্লীতে তুঙ্গভদ্রার তীরে খোঁজাখুঁজি করিবার পর রাজ-হস্তিপক বীরভদ্রের গৃহ পাওয়া গেল।

প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। বলরাম দ্বারে করাঘাত করিলে মঞ্জিরা দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল। বলরামকে দেখিয়া তাহার মুখে বিস্ময়ানন্দ ভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বলরাম মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—'খবর না দিয়ে পালিয়ে এসেছ যে!'

মঞ্জিরা থতমত হইয়া বলিল—'সময় পেলাম না। কাল রাত্রে বাবা ডাকতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে চলে এলাম।'

'আম্মা কেমন আছে?'

মঞ্জিরার মুখ মলিন হইল, সে ছলছল চক্ষে বলিল—'ভাল না। কাল খুব বাড়াবাড়ি গিয়েছে। বৈদ্য মহাশয় বলছেন, 'ত্রিদোষ'।'

দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আরো কিছুক্ষণ কথা হইল, তারপর বলরাম 'কাল আবার আসব' বলিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর বলরাম প্রত্যহ আসে, দ্বারের কাছে দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া কথা বলিয়া যায়। মঞ্জিরার আন্না ক্রমশ আরোগ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাণের আশঙ্কা আর নাই।

একদিন অনিবার্যভাবেই মঞ্জিরার পিতা বীরভদ্রের সহিত বলরামের দেখা হইয়া গেল। দীর্ঘায়ত গৌরবর্ণ মানুষ, বয়স অনুমান চল্লিশ; প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর। মঞ্জিরাকে অপরিচিত যুবার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন। বলরাম বলিল—'আপনি মঞ্জিরার পিতা? নমস্কার। মঞ্জিরার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তাই—'

বীরভদ্র শিষ্টতা সহকারে বলরামকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। দুইজনে আস্তরণের উপর উপবিষ্ট হইলে বীরভদ্র বলরামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মঞ্জিরা একটু আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

বলরাম নিজের পরিচয় দিল, মঞ্জিরার সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল তাহা জানাইল। শুনিয়া বীরভদ্র বলিলেন—'বাপু, তুমি দেখছি গুণবান ব্যক্তি। ভাগ্যবানও বটে, কারণ রাজার নজরে পড়েছ।'

বীরভদ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া বলরাম ভাবিল, এই সুযোগ, এমন সুযোগ হয়তো আর আসিবে না। যা থাকে কপালে। সে হাত জোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—'মহাশয়, আপনার শ্রীচরণে আমার একটি নিবেদন আছে।'

বীরভদ্র একটু চকিত হইলেন, বলিলেন—'কী নিবেদন?'

বলরাম বলিল—'আপনার কন্যা মঞ্জিরাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।'

বীরভদ্র নূতন চক্ষে বলরামকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ধীরে

ধীরে বলিলেন—'বাপু, তুমি যোগ্য পাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি বিদেশী, তোমার হাতে কন্যা দান করতে শঙ্কা হয়।'

বলরাম বলিল—'মহাশয়, আমি বিদেশ থেকে এসেছি বটে, কিন্তু কোনো দিন ফিরে যাব এমন সম্ভাবনা নেই। বিজয়নগরই আমার গৃহ, বিজয়নগরই আমার দেশ।'

বীরভদ্র বলিলেন—'তা ভাল। কিন্তু এ বিষয়ে মঞ্জিরার মন জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা, মঞ্জিরা রাজপুরীতে কাজ করে, রাজাই তার প্রকৃত অভিভাবক। তিনি যদি অনুমতি দেন আমার আপত্তি হবে না।'

'যথা আজ্ঞা'—বলরাম আশান্বিত মনে গাত্রোত্থান করিল। রাজার অনুমতি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

মঞ্জিরা আড়াল হইতে সব শুনিয়াছিল। তাহার দেহ ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হইল, মন আশার আনন্দে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

বিজয়নগর হইতে বহু দূরে তুঙ্গভদ্রার গিরি-বলয়িত উপকূলের ক্ষুদ্র গ্রামটিতে চিপিটক ও মন্দোদরীর দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। একই গুহায় বাস করিয়া ছদ্ম দাম্পত্য বেশিদিন বজায় রাখা কঠিন। অগ্নি এবং ঘৃত যত পুরাতনই হোক, তাহাদের সান্নিধ্যের ফল অনিবার্য। চিপিটক ও মন্দোদরীর দাম্পত্য ব্যবহারে কপটতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

চিপিটক মনকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তিনি বিজয়নগরে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। মন্দোদরী কিন্তু পরমানন্দে ছিল। এখানে আসিবার পর দারুব্রহ্ম তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সে একটি পুরুষ পাইয়াছে। আর কী চাই!

কিন্তু জনসমাজে বাস করিতে হইলে কিছু কাজ করিতে হয়, কেহ বসিয়া খাওয়ায় না। মন্দোদরী নিজের কাজ জুটাইয়া লইয়াছিল। সে অল্পকাল মধ্যে গ্রামের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিল। তৃতীয় প্রহরে গ্রামের যুবতীরা গা ধুইতে নদীতে যাইত, মন্দোদরী তাহাদের সঙ্গে

যাইত। সকলে মিলিয়া গা ধুইত, তারপর গ্রামের আম্রকুঞ্জের ছায়ায় গিয়া বসিত। মন্দোদরী নানা ছাঁদে চুল বাঁধিতে জানে, সে একে একে সকলের চুল বাঁধিয়া দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলিত। মেয়েরা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অবহিত হইয়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিত। তারপর সূর্য পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইলে যে যার কুটিরে ফিরিয়া যাইত। মন্দোদরীকে রাধিতে হইত না, গ্রামবধূরা পালা করিয়া তাহার গুহায় অন্নব্যঞ্জন দিয়া যাইত।

চিপিটকমূর্তি কিন্তু রাজশ্যালক, সুতরাং অকর্মার ধাড়ি। গ্রামে চিপিটক বিতরণের কাজ থাকিলে হয়তো করিতে পারিতেন, কিন্তু অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজে তাঁহার রুচি নাই। দেখিয়া শুনিয়া মোড়ল বলিল—'কর্তা, তোমাকে দিয়ে অন্য কাজ হবে না, তুমি ছাগল চরাও।'

চিপিটক দেখিলেন, ছাগল চরানোতে কোনো পরিশ্রম নাই; ছাগলেরা আপনিই চরিয়া খায়, তাহাদের মাঠে ছাড়িয়া দিয়া গাছতলায় বসিয়া থাকিলেই হইল। তিনি রাজী হইলেন।

অতঃপর চিপিটক ছাগল চরাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তে সুখ নাই, মন পড়িয়া আছে বিজয়নগরে। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া তিনি আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন।

এদেশের ছাগলগুলি আকারে আয়তনে বেশ বৃহৎ, রামছাগলের চেয়েও বৃহৎ ও হৃষ্টপুষ্ট; কাবুলী গর্দভের আকার। গাঁয়ের ছেলেরা তাহাদের পিঠে চড়িয়া ছুটাছুটি করে। দেখিয়া দেখিয়া একদিন তাহার মাথায় একটি বুদ্ধি গজাইল। ছাগলের পিঠে চড়িয়া তিনি যদি নদীর ধার দিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন তবে অচিরাৎ বিজয়নগরে পৌঁছিতে পারিবেন।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। চিপিটক একটি বলিষ্ঠ পাঁঠা ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন এবং নদীর কিনার দিয়া তাহাকে উজানে চালিত করিলেন। চিপিটকের দেহ শীর্ণ ও লঘু, তাহাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে অতিকায় পাঁঠার কোনোই কষ্ট হইল না।

কিন্তু নদীর তীর সর্বত্র সমতল নয়, তীরের পাহাড় মাঝে মাঝে নদী পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ একটি ক্রমোচ্চ পাহাড়ের সম্মুখীন হইয়া ছাগল স্থির হইয়া দাঁড়াইল; সে গ্রাম হইতে অর্ধক্রোশ আসিয়াছে, এখন পর্বত ডিঙাইয়া আর অগ্রসর হইতে রাজী নয়। চিপিটক তাহাকে তাড়না করিলেন, মুখে নানাপ্রকার শব্দ করিলেন, কিন্তু ছাগল নড়িল না। চিপিটক তখন দুই পায়ের গোড়ালি দিয়া সবেগে ছাগলের পেটে গুঁতা মারিলেন। ছাগল হঠাৎ চার পায়ে শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া গা ঝাড়া দিল। চিপিটক তাহার পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িলেন। ছাগল লাফাইতে লাফাইতে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

পতনের ফলে চিপিটকের অস্থি মচকাইয়া গিয়াছিল, তিনি লেংচাইতে লেংচাইতে গৃহে ফিরিলেন।

অতঃপর কিছুদিন কাটিলে তাঁহার মাথায় আর একটি বুদ্ধি অবতীর্ণ হইল; এটি তেমন মারাত্মক নয়, এমনকি সুবুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। তিনি মন্দোদরীকে আদেশ করিলেন—'তুই রোজ দুপুরবেলা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকবি। আমাদের নৌকো তিনটের ফেরার সময় হয়েছে, একদিন না একদিন এই পথে যেতেই হবে। তুই চোখ মেলে থাকবি, তাদের দেখতে পেলেই ডাকবি।'

মন্দোদরী বলিল—'আচ্ছা।'

চিপিটক দ্বিপ্রহরে ছাগল চরাইতে চরাইতে গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়েন। মন্দোদরী গজেন্দ্রগমনে নদীতীরে যায়, উঁচু পাথরের ছায়ায় শুইয়া ঘুমায়। নৌকা সম্বন্ধে তাহার মোটেই আগ্রহ নাই, সে পরম সুখে আছে। অপরাহ্ণে গাঁয়ের মেয়েরা গা ধুইতে আসিলে সে তাহাদের সঙ্গে গা ধুইয়া ফিরিয়া যায়। চিপিটককে বলে—'কোথায় নৌকো!'

এই ভাবে দিন কাটিতেছে।

॥ দুই ॥

গ্রীষ্মকালীন ঝড়-ঝাপ্‌টা অপগত হইয়া বিজয়নগরে বর্ষা নামিয়াছে। রাজ-পৌরভূমির চারিদিকে ময়ূরের ষড়্‌জসংবাদিনী কেকাধ্বনি শুনা যাইতেছে। ময়ূরগুলি কোথা হইতে আসিয়া উচ্চভূমিতে অথবা শৈলশীর্ষে উঠিয়াছে এবং পেখম মেলিয়া মেঘের পানে উৎকণ্ঠ হইয়া ডাকিতেছে।

এদেশে বেশি বৃষ্টি হয় না; কখনো রিম্‌ঝিম্ কখনো ঝিরিঝিরি। কিন্তু আকাশ সর্বদা মেঘ-মেদুর হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের কঠোর তাপ অপগত হইয়া মধুর শৈত্য মানুষের দেহে সুধা সিঞ্চন করিতে থাকে। দিবাভাগে সূর্যদেব যেন অঙ্গে ধূসর আস্তরণ টানিয়া ঘুমাইয়া পড়েন; রাত্রিগুলি দেবভোগ্য স্বর্গের রাত্রি হইয়া দাঁড়ায়। পীতবর্ণ তৃণপাদপ ধীরে ধীরে হরিৎ বর্ণ ধারণ করে; পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গাঢ় সবুজের রেখা। তুঙ্গভদ্রার শীর্ণ ধারা অলক্ষিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে।

বর্ষা সমাগমে অর্জুন ও বলরামকে গুহা ছাড়িতে হইয়াছিল। গুহার ছাদের ফুটা দিয়া জল পড়ে। মন্ত্রী মহাশয় তাহাদের বাসের অন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমার কম্পনের নূতন প্রাসাদ শূন্য পড়িয়া ছিল, তাহারা প্রাসাদের নিম্নতলে আশ্রয় পাইয়াছিল। বলরাম গৃহের রন্ধনশালায় কামারশালা পাতিয়াছিল।

চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভের দিনটা আরম্ভ হইল টিপি টিপি বৃষ্টি লইয়া। অর্জুন প্রত্যূষে উঠিয়া রাজ সকাশে চলিল। চারিদিক অন্ধকার, মেঘের আড়ালে রাত্রি শেষ হইয়াছে কিনা বোঝা যায় না। হেমকূট পর্বতের শৃঙ্গে এখনো ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতেছে।

সভা-ভবনের নিকটে আসিয়া অর্জুন দ্বিতলের একটি বিশেষ গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিল। গবাক্ষে আবছায়া একটি মুখ দৃষ্টিগোচর হইল। বিদ্যুন্মালা দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি প্রত্যহ এই সময় অর্জুনের দর্শনাশায় গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

অর্জুনের হৃদয় মথিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ইহার শেষ কোথায় ?

রাজার বিরাম-ভবনে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে। গতরাত্রে রাজা বিরাম-ভবনেই ছিলেন, তিনি স্নান সারিয়া পূজায় বসিয়াছেন। অর্জুন সোপান দিয়া উপরে আসিয়া রাজার কক্ষে দাঁড়াইল। কক্ষে কেহ নাই, অর্জুন রাজার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। ছায়াচ্ছন্ন কক্ষ, বাতায়নগুলি অচ্ছাভ আলোর চতুষ্কোণ রচনা করিয়াছে।

সহসা পাশের একটি পর্দা-ঢাকা দ্বার দিয়া বিদ্যুন্মালা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চোখে বিভ্রান্ত ব্যাকুলতা। তিনি লঘু পদে অর্জুনের কাছে আসিয়া তাহার হাতে হাত রাখিলেন, সংহত স্বরে বলিলেন—'আজ কী দিন জানো ? চাতুর্মাস্য আরম্ভের দিন। কাল শ্রাবণ মাস পড়বে।'

অর্জুন নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। বিদ্যুন্মালা আরো কাছে আসিয়া অর্জুনের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল—'তুমি কি আমাকে সত্যই চাও না ? আমি কি তবে আত্মহত্যা করব ? কী করব তুমি বলে দাও।'

এই সময় একটি দ্বারের পর্দা একটু নড়িল। পিঙ্গলা কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া রহিল। দেখিল, বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রাখিয়া নিম্নস্বরে কথা বলিতেছেন। অর্জুন বা বিদ্যুন্মালা পিঙ্গলাকে দেখিতে পাইলেন না।

অর্জুন অতি কষ্টে কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির করিল—'আমি কি বলব ? তুমি যাও, এখনি রাজা আসবেন।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর আমি তোমার কাছে যাব।'

বিদ্যুন্মালা নিঃশব্দ পদে অন্তর্হিতা হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে পিঙ্গলা অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল, অর্জুনের প্রতি একটি সুতীক্ষ্ণ বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'এই যে অর্জুন ভদ্র ! আপনি একলা রয়েছেন। মহারাজের পূজা শেষ হয়েছে, তিনি এখনি আসবেন।'

অর্জুন গলার মধ্যে শব্দ করিল; কথা বলিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল।

দুই দণ্ড পরে মণিকঙ্কণা ও বিদ্যুন্মালা পম্পাপতির মন্দিরে চলিয়া গেলেন।

নিজ কক্ষে দেবরায় সভারোহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পালঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া পিঙ্গলা তাঁহার বাহুতে অঙ্গদ পরাইয়া দিতেছিল। অর্জুন দূরে দ্বারের নিকট প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রাজার কপালে কুঙ্কুম তিলক পরাইতে পরাইতে পিঙ্গলা মৃদুস্বরে রাজাকে কিছু বলিল। রাজা পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন। পিঙ্গলা আবার কিছু বলিল। রাজা আরো কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অর্জুনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। স্বর ঈষৎ চড়াইয়া বলিলেন—অর্জুনবর্মা, তুমি সভায় গিয়ে বলো আজ আমি সভায় যাব না। তুমি সভা থেকে গৃহে ফিরে যেও, আজ আর তোমাকে প্রয়োজন হবে না।'

রাজাকে প্রণাম করিয়া অর্জুন চলিয়া গেল। সোপান দিয়া নামিতে নামিতে তাহার হৃৎপিণ্ড আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। রাজার কণ্ঠস্বরে আজ যেন অনভ্যস্ত কঠিনতা ছিল। তিনি কি কিছু জানিতে পারিয়াছেন? পিঙ্গলা কি—?

অপরাধ না করিয়াও যাহারা অপরাধীর অধিক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে অর্জুনের অবস্থা তাহাদের মত।

বিরাম-কক্ষে দেবরায় পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। তিনি পিঙ্গলার পানে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—'অর্জুন সম্বন্ধে গোপন কথা কি আছে?'

পিঙ্গলা রাজার পায়ের কাছে ভূমিতলে বসিল, করজোড়ে বলিল—'আর্য, অভয় দিন।'

রাজা বলিলেন—'নির্ভয়ে বল।'

পিঙ্গলা তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—'কিছুদিন থেকে

দাসীদের মধ্যে কানাকানি শুনছিলাম; দেবী বিদ্যুন্মালা নাকি অন্তরালে অর্জুনবর্মার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। আমি শুনেও গ্রাহ্য করিনি। অর্জুনবর্মা দেবী বিদ্যুন্মালার সঙ্গে নৌকায় এসেছেন, তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ আমি নিজের চোখে দেখেছি মহারাজ।'

'কী দেখেছ ?'

তখন পিঙ্গলা যাহা দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল, রাজাকে শুনাইল। বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রাখিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিল। কিছু বাড়াইয়া বলিল না, কিছু কমাইয়াও বলিল না। রাজা শুনিয়া বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায় মুখ অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বলরাম একটি নূতন কামান প্রস্তুত করিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সেটি থলিতে ভরিয়া সে বাহির হইল। অর্জুনকে বলিয়া গেল—'রাজাকে কামান দিতে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে বিয়ের কথাটাও পাকা করে আসব। একটা বৌ না হলে ঘর-দোর আর মানাচ্ছে না।'

অর্জুন নিজ শয্যায় লম্বমান হইয়া ছাদের পানে চাহিয়া ছিল, উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, তারপর ঘরময় পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভালবাসা পাইয়াও সুখ নাই; একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা তাহার অন্তঃকরণকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে; যেন মরণাধিক একটা মহাবিপদ অলক্ষ্যে ওৎ পাতিয়া আছে, কখন অকস্মাৎ ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। এই শঙ্কার হাত হইতে পলকের জন্য নিস্তার নাই। মাঝে মাঝে তাহার ইচ্ছা হইয়াছে, চুপি চুপি কাহাকেও না বলিয়া বিজয়নগর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু কোথায় পলাইবে? বিজয়নগর তাহার হৃদয়কে লৌহজটিল বন্ধনে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। বিজয়নগর ছাড়িয়া আর সে মুসলমান রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। প্রাণ যায় সেও ভাল।

কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর মৃদু শব্দে অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বিদ্যুন্মালা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া কক্ষের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলরাম নাই দেখিয়া তিনি অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীপের স্নিগ্ধ আলোকস্পর্শে তাঁহার সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল।

বিদ্যুন্মালা ভঙ্গুর হাসিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—'আমি মরতে চাই না, আমি তোমাকে চাই। আমার লজ্জা নেই, অভিমান নেই, আমি শুধু তোমাকে চাই।' দুই বাহু বাড়াইয়া তিনি অর্জুনের গলা জড়াইয়া লইলেন। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিলেন।

অর্জুন জগৎ ভুলিয়া গেল। তাহার বাহু অবশে বিদ্যুন্মালার দেহ দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টন করিয়া লইল।

হিয়ে হিয় রাখনু। যুগ কাটিল কি মুহূর্ত কাটিল ধারণা নাই। হৃদয় কোন্ অতলস্পর্শ অমৃতসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রতি অঙ্গে রোমহর্ষণ।

তারপর এই আত্মবিস্মৃত রসোল্লাসের অতল হইতে দুইজনে উঠিয়া আসিলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, কে একজন তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তবু সহজে মোহতন্দ্রা কাটিতে চায় না। ধীরে ধীরে তাঁহারা চেতনার বহির্লোকে ফিরিয়া আসিলেন। যিনি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি—মহারাজ দেবরায়।

এই ভয়ঙ্কর সত্য সম্পূর্ণরূপে অন্তরে প্রবেশ করিলে দুইজনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বিদ্যুন্মালার দিকে তাকাইলেন না, অর্জুনের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভয়াল কণ্ঠে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা!'

অর্জুন নতমুখে রহিল, মুখে কথা যোগাইল না। রাজা যে-দৃশ্য দেখিয়াছেন তাহার একমাত্র অর্থ হয়, দ্বিতীয় অর্থ হয় না; সুতরাং বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

রাজার কটি হইতে তরবারি বিলম্বিত ছিল, রাজা তাহার মুষ্টিতে

হাত রাখিলেন। বিদ্যুন্মালা ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া ছিলেন। তিনি সহসা মুখে অব্যক্ত আকুতি করিয়া রাজার পদতলে পতিত হইলেন ; ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'রাজাধিরাজ, অর্জুনবর্মাকে ক্ষমা করুন। ওঁর কোনো দোষ নেই, আমি অপরাধিনী। হত্যা করতে হয় আমাকে হত্যা করুন।'

রাজা বিরাগপূর্ণ নেত্রে বিদ্যুন্মালার পানে চাহিলেন। বিদ্যুন্মালা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বলিতে লাগিলেন—'রাজাধিরাজ, আমি অর্জুনবর্মাকে প্রলুব্ধ করেছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সম্মত হননি। ওঁর অপরাধ নেই, আমি অপরাধিনী, আমাকে দণ্ড দিন।'

রাজার মুখের কোনো পরিবর্তন হইল না, তিনি আরো কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া দুই হাতে তালি বাজাইলেন। অমনি ছয়জন অসিধারিণী প্রতিহারিণী কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাদের অগ্রে পিঙ্গলা।

রাজা বলিলেন—'রাজকুমারীকে মহলে নিয়ে যাও।'

পিঙ্গলা বিদ্যুন্মালার হাত ধরিয়া তুলিল, সহজ স্বরে বলিল—'আসুন দেবি।'

বিদ্যুন্মালা একবার রাজার দিকে একবার অর্জুনের দিকে চাহিলেন, তারপর অধর দংশন করিয়া গর্বিত পদক্ষেপে দাসীদের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। তিনি রাজকন্যা, দাসী-কিঙ্করীর সম্মুখে দীনতা প্রকাশ করা চলিবে না।

কক্ষে রহিলেন রাজা এবং অর্জুন। রাজা বহ্নিমান শৈলশৃঙ্গের ন্যায় জ্বলিতেছেন, অর্জুন তাঁহার সম্মুখে মুহ্যমান। রাজার হাত আবার তরবারির মুষ্টির উপর পড়িল ; তিনি বলিলেন—'রাজকন্যা যা বলে গেলেন তা সত্য ?'

অর্জুন জানে রাজকন্যার কথা সত্য, কিন্তু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহার স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইতে পারিবে না। সে একবার মুখ তুলিয়া আবার মুখ নত করিল ; ধীরে ধীরে বলিল—'আমিও সমান অপরাধী মহারাজ।'

রাজা গর্জিয়া উঠিলেন—'কৃতঘ্ন! বিশ্বাসঘাতক! এ অপরাধের দণ্ড জানো?'

অর্জুন মুখ তুলিল না, বলিল—'জানি মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'মৃত্যুদণ্ডই তোমার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে, আমিও তোমার প্রাণদান করলাম। যাও, এই দণ্ডে আমার রাজ্য ত্যাগ কর। অহোরাত্র পরে যদি তোমাকে বিজয়নগর রাজ্যে পাওয়া যায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে। বিজয়নগরে তোমার স্থান নেই।'

অর্জুনের কাছে ইহা প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠিন আজ্ঞা। কিন্তু সে নতজানু হইয়া যুক্তকরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

দু' দণ্ড পরে বলরাম গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—'রাজার সাক্ষাৎ পেলাম না, তিনি বিরাম-ভবনে নেই। একি! অর্জুন—?'

অর্জুন ভূমির উপর জানু মুড়িয়া জানুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে, বলরামের কথায় পাংশু মুখ তুলিল। বলরাম কামানের থলি ফেলিয়া দ্রুত তাহার কাছে আসিয়া বসিল; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কী হয়েছে অর্জুন?'

অর্জুন ভগ্নস্বরে বলিল—'রাজা আমাকে বিজয়নগর থেকে নির্বাসন দিয়েছেন।'

'অ্যাঁ! সে কী! কেন? কেন?'

অর্জুন অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর নতমুখে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলরামকে সকল কথা বলিল, কিছু গোপন করিল না। শুনিয়া বলরাম কিছুক্ষণ মেঝের উপর আঙুল দিয়া আঁক-জোক কাটিল। শেষে উঠিয়া গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল।

রাজ-রসবতীর দাসী রাত্রির খাবার লইয়া আসিল। মঞ্জিরা নয়, অন্য দাসী; মঞ্জিরা এখনো পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসে নাই। দাসীকে কেহ লক্ষ্য করিল না দেখিয়া সে খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্জুন উঠিল, লাঠি দু'টি হাতে

লইয়া বলরামের শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বলিল—'বলরাম ভাই, এবার আমি যাই।'

বলরাম ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল; বলিল—'যাবে! দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও।'

সে উঠিয়া দ্রুতহস্তে নিজের জিনিসপত্র গুছাইল, নবনির্মিত কামান ইত্যাদি ছালার মধ্যে ভরিল। অর্জুন অবাক হইয়া দেখিতেছিল; বলিল—'এ কী, তুমিও যাবে নাকি?'

বলরাম বলিল—'হ্যাঁ, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।'

অর্জুন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—'কিন্তু—রাজার কামান তৈরি—!'

বলরাম বলিল—'কামান তৈরি রইল!'

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অর্জুন বলিল—'আর—মঞ্জিরা?'

বলরাম বলিল—'মঞ্জিরা রইল। যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই আপদ। চল, বেরিয়ে পড়া যাক।—আরে, খাবার দিয়ে গেছে দেখছি। এস খেয়ে নিই। আবার কবে রাজভোগ জুটবে কে জানে।'

অর্জুনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল না, তবু সে বলরামের সঙ্গে খাইতে বসিল। আহারান্তে দুই বন্ধু বাহিরে আসিল। বলরাম বলিল—'চল, আগে বাজারে যাই।'

পান-সুপারির বাজার তখনো সব বন্ধ হয় নাই; বলরাম চিঁড়া ও গুড় কিনিয়া ঝোলায় রাখিল, ঝোলা কাঁধে ফেলিয়া বলিল—'পাথেয় সংগ্রহ হল। এবার চল।'

'কোন দিকে যাবে?'

'পশ্চিম দিকে। পূব দিকের সীমান্ত অনেক দূরে, পশ্চিমের সীমান্ত কাছে। শুনেছি, পশ্চিম দিকে সমুদ্রতীরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজা আছে।'

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নগরের কর্ম-কলধ্বনি শান্ত হইয়া আসিতেছে। হেমকূট চূড়ায় অগ্নিস্তম্ভ অস্থির শিখায় জ্বলিতেছে। অর্জুন একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল। তারপর হৃদয়ে অবরুদ্ধ আবেগ লইয়া

অন্ধকার নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াইল। সহায়হীন যাত্রাপথে বন্ধু তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে ইহাই তাহার একমাত্র ভরসা।

॥ তিন ॥

মহারাজ দেবরায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ন্যায়বুদ্ধি ক্রোধের অগ্নিবন্যায় ভাসিয়া যায় নাই। তিনি স্বভাবতই ধীর প্রকৃতির মানুষ, নচেৎ সেদিন অর্জুন প্রাণে বাঁচিত না।

কিন্তু মানুষ যতই ধীরপ্রকৃতির হোক, এমন একটা দৃশ্য চোখে দেখিবার পর সহজে মাথা ঠাণ্ডা হয় না। নিজের বাক্‌দত্তা বধূ অন্য পুরুষের আলিঙ্গনাবদ্ধ! কয়জন রাজা রক্তদর্শন না করিয়া শান্ত হইতে পারেন?

দেবরায় বিরাম-ভবনে ফিরিয়া আসিলেন, কটি হইতে তরবারি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া পালঙ্কের পাশে বসিলেন। পিঙ্গলা বোধহয় শিলাকুট্টিমের উপর তরবারির ঝনৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, দ্রুত আসিয়া রাজার পায়ের কাছে বসিল, জিজ্ঞাসু নেত্রে রাজার মুখের পানে চাহিল।

রাজা একবার কক্ষের চারিদিকে কষায়িত দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর কঠিন স্বরে বলিলেন—'বিদ্যুন্মালাকে স্বতন্ত্র কক্ষে রাখো, দ্বারে প্রহরিণী থাকবে। আমার বিনা আদেশে কোথাও বেরুতে পাবে না।'

পিঙ্গলা বলিল—'ভাল মহারাজ। কিন্তু বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা প্রত্যহ প্রাতে পম্পাপতির মন্দিরে যান। তার কি হবে?'

দেবরায় বিবেচনা করিলেন। ক্রোধের যুক্তিহীনতা কিঞ্চিৎ উপশম হইল।—পরপুরুষ স্পর্শের দোষ ক্ষালনের জন্য পম্পাপতির পূজা, অথচ—। এ কী বিড়ম্বনা! যা হোক, হঠাৎ পম্পাপতির মন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলে লোকে নানাপ্রকার সন্দেহ করিবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। রাজ-অন্তঃপুরের কলঙ্ককথা যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই ভাল। বিদ্যুন্মালা হাজার হোক রাজকন্যা, তাহার সম্বন্ধে সমুচিত

চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হইবে। রাজা বলিলেন—'আপাতত যেমন চলছে চলুক। ব্রত উদ্‌যাপনের আর বিলম্ব কত?'

'আর এক পক্ষ আছে আর্য।'

এক পক্ষ সময় আছে। রাজা পিঙ্গলাকে বিদায় করিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন। রাজপরিবারে এমন উৎকট ব্যাপার বড় একটা ঘটে না। কিন্তু ঘটিলে বিষম সমস্যার উৎপত্তি হয়।

মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ একবার আসিলেন। রাজা তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না। লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার বিমনা ভাব ও বাক্যালাপে অনৌৎসুক্য দেখিয়া দুই-চারিটা কাজের কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

—স্ত্রীজাতির মন স্বভাবতই চঞ্চল। অধিকাংশ নারীই বিকীর্ণ-মন্মথা। কিন্তু বিদ্যুন্মালাকে দেখিয়া চপল-স্বভাবা মনে হয় না। সে গম্ভীর প্রকৃতির নারী। রাজকুমারীসুলভ আত্মাভিমান তাহার মনে আছে। তবে সে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল কেন!

অর্জুন তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, নদী হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। অঙ্গস্পর্শ না করিয়া নদী হইতে উদ্ধার করা যায় না, অনিবার্যভাবেই অঙ্গস্পর্শ ঘটিয়াছিল। কিসে কি হয় বলা যায় না, সম্ভবত অঙ্গস্পর্শের ফলেই বিদ্যুন্মালা অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নারীর মন একবার যাহার প্রতি ধাবিত হয়, সহজে নিবৃত্ত হয় না।

আর অর্জুন! সে প্রভুর সহিত এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল! অর্জুনের চরিত্র স্বভাবতই সৎ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; তাহার প্রত্যেক কার্যে তাহার সৎস্বভাব সুপরিস্ফুট। হয়তো বিদ্যুন্মালার কথাই সত্য, সে অর্জুনকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। রমণীর কুহক-ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া কত সচ্চরিত্র যুবার সর্বনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

অর্জুন শাস্তি পাইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই: বিদ্যুন্মালাকে লইয়া কী করা যায়! জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করা অসম্ভব। অথচ বিবাহ না করিয়া তাহাকে পিতৃরাজ্যে ফিরাইয়া দেওয়াও যায় না। গজপতি ভানুদেব সামান্য ব্যক্তি নন, তিনি এই অপমান সহ্য করিবেন

না। আবার যুদ্ধ বাধিবে, যে মিত্র হইয়াছে সে আবার শত্রু হইবে।…বিষ খাওয়াইয়া কিংবা অন্য কোনো উপায়ে বিদ্যুন্মালার প্রাণনাশ করিয়া অপঘাত বলিয়া রটনা করিয়া দিলে সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু—

মণিকঙ্কণা প্রবেশ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু দু'টি আতঙ্কে বিস্ফারিত। দ্বিধাজড়িত পদে সে পালঙ্কের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কা-সংহত কণ্ঠে বলিল—'মহারাজ, কি হয়েছে? মালা কী করেছে?'

বিদ্যুন্মালা ভিতরে ভিতরে কী করিতেছে মণিকঙ্কণা কিছুই জানিতে পারে নাই। এখন বিদ্যুন্মালাকে সহসা বন্দিনী অবস্থায় পৃথক কক্ষে রক্ষিত হইতে দেখিয়া মণিকঙ্কণা আশঙ্কায় একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।

দেবরায় অপলক নেত্রে কিয়ৎকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'তুমি জানো না?'

মণিকঙ্কণা পালঙ্কের পাশে বসিয়া পড়িল, রাজার পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল—'না মহারাজ, আমি কিছু জানি না। কিন্তু আমার বড় ভয় করছে।'

সহসা মহারাজ দেবরায়ের মনের উষ্মা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। পৃথিবীতে বিদ্যুন্মালাও আছে, মণিকঙ্কণাও আছে; সরলতা ও কপটতা পাশাপাশি বাস করিতেছে। তিনি মণিকঙ্কণাকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলিলেন—'তাহলে তোমার জেনে কাজ নেই। আজ থেকে তুমি আর বিদ্যুন্মালা পৃথক থাকবে।'

মণিকঙ্কণা আর প্রশ্ন করিল না, রাজার জানুর উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

অর্জুন ও বলরাম চলিয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে অস্পষ্ট পথরেখা ধরিয়া চলিয়াছিল। কেহ কথা বলিতেছিল না, বলিবার আছেই বা কি?

একে একে নগরের সপ্ত তোরণ পার হইয়া মধ্যরাত্রে তাহারা

নগরসীমানার বাহিরে উপস্থিত হইল। অতঃপর রাজপথের স্পষ্ট নির্দেশ আর পাওয়া যায় না; নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, রাজপথও তেমনি উন্মুক্ত শিলা-তরঙ্গিত প্রান্তরে আসিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথ-বিপথ নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

চলিতে চলিতে টিপিটিপি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বলরাম এতক্ষণ নীরবে চলিয়াছিল, এখন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল—'আকাশের দেবরাজ আর বিজয়নগরের দেবরায়, দু'জনেই আমাদের প্রতি বিরূপ।'

কয়েক পা চলিবার পর অর্জুন বলিল—'বিজয়নগরের দেবরায়ের দোষ নেই। দোষ আমার।'

বলরাম বলিল—'কারুর দোষ নয়, দোষ ভাগ্যের। দৈবজ্ঞ ঠাকুর ঠিক বলেছিলেন।'

'হুঁ। আমার সঙ্গদোষে তোমারও সর্বনাশ হল।'

'সে আমার ভাগ্য।'

টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মৃদু স্ফুরণ অদৃশ্য প্রকৃতিকে পলকের জন্য দৃশ্যমান করিয়া লুপ্ত হইতেছে। থমকিয়া থমকিয়া বায়ুর একটা তরঙ্গ বহিতে আরম্ভ করিল। পথিক দু'জন এতক্ষণ বিশেষ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নাই, এখন রোমাঞ্চকর শৈত্য অনুভব করিতে লাগিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইবার পর বিদ্যুতের আলোকে অদূরে একটি দেউল চোখে পড়িল। দেউলটি ভগ্নপ্রায়, কিন্তু তাহার ছাদযুক্ত বহিরঙ্গন এখনো দাঁড়াইয়া আছে। পরিত্যক্ত দেবালয়। এখানে মানুষ কেহ থাকে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বলিল—'এস, খানিক বিশ্রাম করা যাক। দিনের আলো ফুটলে আবার বেরিয়ে পড়া যাবে।'

দুইজনে ছাদের নীচে গিয়া বসিল। এখানে বিরক্তিকর বৃষ্টি ও বাতাস নাই, ভূমিতলও শুষ্ক। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর বলরাম পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া শয়ন করিল। অর্জুনের দেহ অপেক্ষা মন

অধিক ক্লান্ত, সে জানুর উপর মাথা রাখিয়া অবসন্ন মনে ভাবিতে লাগিল—বিদ্যুন্মালার ভাগ্যে কী আছে···

দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙ্গিল পাখির ডাকে। আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া দিনের আলো ফুটিয়াছে। কয়েকটা চটক পক্ষী মণ্ডপের তলে উড়িয়া কিচিরমিচির করিতেছে। আশে পাশে কোথাও মানুষের চিহ্ন নাই। দেউলে দেবতার বিগ্রহ নাই।

অর্জুন ও বলরাম আবার বাহির হইয়া পড়িল। বৃষ্টি থামিয়াছে, মেঘের গায়ে ফাটল ধরিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া নীল আকাশ দেখা যাইতেছে। বলরাম ঝুলি হইতে একমুঠি চিঁড়া বাহির করিয়া অর্জুনকে দিল. নিজে একমুঠি লইল, বলিল—'খেতে খেতে চল।'

বলরাম চিঁড়া চিবাইতে চিবাইতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিল। বলিল—'এখানে মানুষ-জন নেই বটে, কিন্তু আগে জন-বসতি ছিল, হয়তো গ্রাম ছিল। এখনো তার চিহ্ন পড়ে রয়েছে চারিদিকে। কতদিন আগে গ্রাম ছিল কে জানে!'

অর্জুন একবার চক্ষু তুলিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গৃহের ভগ্নাবশেষগুলি দেখিল, বলিল—'পঞ্চাশ-ষাট বছরের বেশি নয়। হয়তো মুসলমানেরা এদিক থেকে বিজয়নগর আক্রমণ করেছিল, তারপর গ্রাম ছারখার করে দিয়ে চলে গেছে।'

'তাই হবে।'

ক্রমে সূর্যোদয় হইল, ছিন্ন মেঘের ফাঁকে কাঁচা রৌদ্র চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, পাশে তুঙ্গভদ্রার জল ঝলমল করিয়া উঠিল।

তাহারা পশ্চিমদিকে যাইতেছে, ডানদিকে তুঙ্গভদ্রা। কিন্তু তাহারা তুঙ্গভদ্রার বেশি কাছে যাইতেছে না, সাত-আট রজ্জু দূর দিয়া যাইতেছে; তুঙ্গভদ্রার তীরে সেনা-গুল্ম আছে, সৈনিকদের হাতে পড়িলে হাঙ্গমা বাধিতে পারে।

পথে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পড়িল। বর্ষার জলে খরস্রোতা কিন্তু অগভীর, দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া তুঙ্গভদ্রায় মিলিয়াছে।

অর্জুন ও বলরাম জলে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল। তারপর এক-হাঁটু জল পার হইয়া চলিতে লাগিল।

তরঙ্গায়িত ভূমি, শিলাখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে তৃণোদ্গম হইয়াছে, পথের চিহ্ন নাই। আকাশে কখনো রৌদ্র কখনো ছায়া। দুই পান্থ চলিয়াছে। সূর্যাস্তের পূর্বে বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা পার হইয়া যাইতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে তাহারা একটি পয়োনালকের তীরে বসিয়া গুড় সহযোগে চিঁড়া ভক্ষণ করিল, তারপর পয়ঃপ্রণালীতে জল পান করিয়া আবার চলিতে লাগিল।

অপরাহ্নে তাহারা একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছিল। উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্বত প্রাকারের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। বোধহয় এই পর্বতই বিজয়নগর রাজ্যের অপরান্ত।

উপত্যকার উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই পান্থ লক্ষ্য করিল, আশেপাশে নিকটে দূরে বহু স্তূপ রহিয়াছে; স্তূপগুলির অভ্যন্তরস্থ পাথর দেখা যায় না, বহু যুগের ধূলা ও বালুকায় ঢাকা পড়িয়াছে। মনে হয়, সুদূর অতীতকালে এই উপত্যকায় একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল; তারপর কালের আগুনে পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মানুষের হস্তাবলেপের সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

অর্জুন ও বলরাম প্রাকারসদৃশ পর্বতের পদমূলে যখন পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু সূর্য পর্বতের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। পর্বতের পৃষ্ঠদেশে এক সারি উচ্চ পাষাণ-স্তম্ভ দেখিয়া বোঝা যায় ইহাই বিজয়নগর রাজ্যের পশ্চিম সীমানা।

বলরাম ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল—'এই পাহাড়টা পার হলেই আমরা মুক্ত। চল, বেলা থাকতে থাকতে পার হয়ে যাই।'

পর্বতগাত্র পিচ্ছিল। সাবধানে উপরে উঠিতে উঠিতে বলরাম মন্তব্য করিল—'ওপারে কা'দের রাজ্য কে জানে।'

অর্জুন বলিল—'যদি মুসলমান রাজ্য হয়—'

বলরাম বলিল—'যদি মুসলমান রাজ্য হয়, অন্য রাজ্যে চলে যাব। দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দু'একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য আছে।'

পাহাড়ে বেশি দূর উঠিতে হইল না, অল্প দূর উঠিয়া তাহারা দেখিল সম্মুখেই একটি গুহার মুখ। বহুকাল পূর্বে এই গুহা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হইত, গুহার মুখ উচ্চ খিলান দিয়া বাঁধানো ছিল। এখন খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গুহামুখে স্তূপীভূত হইয়াছে। কিন্তু গুহার মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

বলরাম গুহার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল—'আমাদের দেখছি গুহা-ভাগ্য প্রবল, যেখানে যাই সেখানেই গুহা।'

বলরাম একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিল, আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—'রাত্রে বোধহয় আবার বৃষ্টি হবে। পাহাড়ের ওপারে আশ্রয় পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই।—কি বল? আজ রাত্রিটা গুহাতেই কাটাবে?'

অর্জুন নির্লিপ্ত স্বরে বলিল—'তোমার যেমন ইচ্ছা।'

'তবে এস, এই বেলা গুহায় ঢুকে পড়া যাক।' বলরাম উঠিয়া গুহায় প্রবেশের উপক্রম করিল।

এই সময় অর্জুনের দৃষ্টি পড়িল গুহামুখের একটি প্রস্তরফলকের উপর। অসমতল প্রস্তরফলকের গাত্রে প্রাচীন কর্ণাটী লিপিতে কয়েকটি আঁকাবাঁকা শব্দ খোদিত রহিয়াছে।

অপটু হস্তে পাষাণ কাটিয়া কেহ এই শব্দগুলি খোদিত করিয়াছিল। বহুকালের রৌদ্রবৃষ্টির প্রকোপে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবু যত্ন করিলে পাঠোদ্ধার করা যায়—'দেবদাসী তনুশ্রী গৌড়নিবাসী শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল।'

অর্জুন কিছুক্ষণ এই শিলালেখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপর বাহিরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। বলরাম বলিল—'কি হল?'

অর্জুন উত্তর দিল না, বহু দূর অতীতের এক পরিচয়হীনা নারীর কথা ভাবিতে লাগিল। কবে কে জানে, তনুশ্রী নামে এক দেবদাসী

ছিল···সম্মুখের উপত্যকায় নগরী ছিল, নগরীর দেবমন্দিরে তনুশ্রী ছিল দেবদাসী···সেকালে দেবদাসীদের বিবাহ হইত না, তাহারা দেবভোগ্যা···তারপর কোথা হইতে আসিল মীনকেতু নামে এক শিল্পী···হয়তো সে পাষাণ-শিল্পে দক্ষ ছিল, যে-মন্দিরে তনুশ্রী ছিল দেবদাসীদের অন্যতমা সেই মন্দিরের শিল্পশোভা রচনার জন্য শিল্পী মীনকেতু আসিয়াছিল···তারপর তনুশ্রী কামনা করিল শিল্পী মীনকেতুকে···অন্তর্গূঢ় তীব্র কামনা···দিন কাটিল মাস কাটিল, কিন্তু তনুশ্রীর কামনা পূর্ণ হইল না···শিল্পী মীনকেতু একদিন কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল, হয়তো তনুশ্রীকে নিজের বজ্রসূচী উপহার দিয়া গেল···তারপর একদিন অন্তরের গোপন দাহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তনুশ্রী চুপি চুপি গুহামুখে আসিয়া পাষাণ-গাত্রে নিজের মর্মজ্বালা খোদিত করিয়া রাখিল ; অনিপুণ হস্তের স্বল্পাক্ষর ভাষায় তাহার হৃদয়ের ক্রন্দন প্রকাশ পাইল—দেবদাসী তনুশ্রী গৌড়নিবাসী শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল।—কামনা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইলে মর্মান্তিক গোপন কথা পাষাণে উৎকীর্ণ হইত না।

সামান্যা দেবদাসী তনুশ্রীকে কেহ মনে করিয়া রাখে নাই, কিন্তু তাহার ব্যর্থ কামনা পাষাণফলকে কালজয়ী হইয়া আছে। ইহাই কি সকল ব্যর্থ কামনার অন্তিম নিয়তি!

অর্জুন তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল, কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জল তাহার মাথায় পড়িল। সে ঊর্ধ্বে একবার নেত্রপাত করিয়া দেখিল, সন্ধ্যার আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ঝরিয়া-পড়া বারিবিন্দু যেন দেবদাসী তনুশ্রীর অশ্রুজল।

অর্জুন উঠিয়া বলরামকে বলিল—'চল, গুহায় যাই।'

॥ চার ॥

গুহার প্রবেশ-মুখ বেশ প্রশস্ত, কিন্তু ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া ভিতর দিকের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভূমিতলে শুষ্ক প্রস্তরপট্ট।

এখানে শয়ন করিলে আর কোনো সুখ না থাক, বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয় নাই।

দুইজনে প্রস্তরপট্টের খানিকটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উপবেশন করিল। বলরাম বলিল—'মন্দ হল না। যদি বাঘ ভাল্লুক না থাকে আরামে রাত কাটাবে। এস, এবার রাজভোগ সেবন করে শুয়ে পড়া যাক। অনেক হাঁটা হয়েছে।'

গুহার বাহিরে ধূসর আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইতেছে। গুহার মধ্যে অন্ধকার ঘন হইতেছে। দুইজনে শুষ্ক চিঁড়া-গুড় সেবন করিয়া পাশাপাশি শয়ন করিল।

দু'জনেই পরিশ্রান্ত। বলরাম অচিরাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। অর্জুনের কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘুম আসিল না। গুহার ভিতর ও বাহির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল; রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

ক্লান্ত চক্ষু অন্ধকারে মেলিয়া অর্জুন চিন্তা করিতে লাগিল দুইটি নারীর কথা; এক, বহুযুগের পরপার হইতে আগতা তনুশ্রী, দ্বিতীয়—বিদ্যুন্মালা। একজন সামান্যা দেবদাসী, অন্যা রাজকুমারী। কিন্তু তাহাদের জীবনের এক স্থানে ঐক্য আছে; তাহারা যাহা কামনা করিয়াছিল তাহা পায় নাই। নিয়তির পক্ষপাত নাই, নিয়তির কাছে রাজকন্যা এবং দেবদাসী সমান।—অর্জুনের মনের মধ্যে রাজকন্যা ও দেবদাসী একাকার হইয়া গেল।

গুহার মধ্যে শীতল জলসিক্ত বায়ুর মন্দ প্রবাহ রহিয়াছে। বায়ু-প্রবাহ গুহা-মুখের দিক হইতে আসিতেছে না, ভিতর দিক হইতে আসিতেছে। অর্জুন কিছুক্ষণ তাহা অনুভব করিয়া ভাবিল—গুহার মধ্যে তো বায়ু-চলাচল থাকে না, বদ্ধ বাতাস থাকে; তবে কি এ গুহা গুহা নয়, সুড়ঙ্গ? পাহাড়ের পেট ফুঁড়িয়া অপর পাশে বাহির হইয়াছে? তাহা যদি হয়, পর্বত লঙ্ঘনের ক্লেশ বাঁচিয়া যাইবে।

ক্রমে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু এই সময় একটি অতি ক্ষীণ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আবার তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিল। শব্দ নয়,

যেন বাতাসের মৃদু অথচ দ্রুত স্পন্দন; বহুদূর হইতে আসিতেছে। বাদ্যভাণ্ডের শব্দ। কিছুক্ষণ শুনিবার পর অর্জুন উঠিয়া বসিল।

হ্যাঁ, তাই বটে। বহু দূরে কিড়ি কিড়ি নাকাড়া বাজিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া যাইতেছে, আবার বাজিতেছে।—কিন্তু এই জনপ্রাণীহীন গিরিপ্রান্তরে এত রাত্রে নাকাড়া বাজায় কে? শব্দটা এতই ক্ষীণ যে, কোন্ দিক হইতে আসিতেছে অনুমান করা যায় না।

অর্জুন বলরামের গায়ে হাত রাখিতেই সে উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিল না, বলরাম বলিল—'কী?'

অর্জুন বলিল—'কান পেতে শোনো। কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

বলরাম কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া শুনিল; শেষে বলিল—'অনেক দূরে নাকাড়া বাজছে! এ কি ভৌতিক কাণ্ড না কি? কারা নাকাড়া বাজাচ্ছে? হুক্ক-বুক্ক?'

অর্জুন বলিল—'না, মুসলমান নাকাড়া বাজাচ্ছে। আমি ওদের বাজনা চিনি।'

'আমিও চিনি।' বলরাম আরো খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিল—'তাই বটে। খিটি মিটি খিটি মিটি খিট্ খিট্। কিন্তু মুসলমান এখানে এল কোথা থেকে?

'পাহাড়ের ওপারে হয়তো বহমনী রাজ্য।'

'তা হতে পারে, কিন্তু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এতদূরে নাকাড়ার শব্দ আসবে?'

'কেন আসবে না। এই গুহা যদি সুড়ঙ্গ হয়, তাহলে আসতে পারে।'

'সুড়ঙ্গ!'

অর্জুন বায়ু-চলাচলের কথা বলিল। শুনিয়া বলরাম বলিল—'সম্ভব। উপত্যকায় যখন মানুষের বসতি ছিল তখন তারা এই সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড় পার হত। এখন মানুষ নেই, গুহাটা পড়ে আছে।—কিন্তু মুসলমানেরা গুহার ওপারে কী করছে? ওপারে কি নগর আছে?'

'জানি না। সম্ভব মনে হয় না।'

বলরাম একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'আজ রাত্রে আর ভেবে কোনো লাভ নেই। শুয়ে পড়। কাল সকালে উঠে দেখা যাবে।'

বলরাম শয়ন করিল। অর্জুন উৎকর্ণভাবে বসিয়া রহিল, কিন্তু দূরাগত নাকাড়া-ধ্বনি আর শোনা গেল না। তখন সেও শয়ন করিল।

পরদিন প্রাতে যখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল তখন সূর্যোদয় হইয়াছে, মেঘভাঙ্গা সজল রৌদ্র গুহা-মুখে প্রবেশ করিয়াছে। বলরাম বলিল—'এস দেখা যাক, এটা গুহা কি সুড়ঙ্গ।'

দুইজনে গুহার অভ্যন্তরের দিকে চলিল। নবোদিত সূর্যের আলো অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে, সেই আলোতে পথ দেখিয়া চলিল। গুহা ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, দুইজন পাশাপাশি চলা যায় না। অর্জুন আগে আগে চলিল।

অনুমান দুই রজ্জু সিধা গিয়া রন্ধ্র তেরছাভাবে মোড় ঘুরিল। এখানে আর সূর্যের আলো নাই; প্রথমটা ছায়া-ছায়া, তারপর সূচীভেদ্য অন্ধকার।

অর্জুন তাহার লাঠি দু'টি ভল্লের ন্যায় সম্মুখে বাড়াইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। অনুমান আর দুই রজ্জু গিয়া লাঠি প্রাচীরে ঠেকিল। আবার একটা মোড়, এবার বাঁ দিকে।

মোড় ঘুরিয়া কয়েক পা গিয়া অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়াছে, বেশ খানিকটা দূরে চতুষ্কোণ রন্ধ্রের মুখে সবুজ আলোর ঝিলিমিলি।

অর্জুন বলিল—'সুড়ঙ্গই বটে।'

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ ক্রমশ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু সুড়ঙ্গের শেষে নির্গমনের রন্ধ্রটি বৃহৎ নয়; প্রস্থ অনুমান দুই হস্ত, খাড়াই তিন হস্ত। একজন মানুষের বেশি একসঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে না।

অর্জুন ও বলরাম রন্ধ্রমুখ দিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের দেহ শক্ত হইয়া উঠিল।

রন্ধ্রমুখের চারিপাশে ও নিম্নে যে-সব ঝোপ-ঝাড় জন্মিয়াছিল

তাহা কাটিয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে; রন্ধ্রমুখ হইতে জমি ক্রমশ ঢালু হইয়া প্রায় বিশ হাত নীচে সমতল হইয়াছে। সমতল ভূমিতে বড় বড় গাছের বন। গাছগুলি কিন্তু ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়, গাছের ফাঁকে ফাঁকে বহুদূর পর্যন্ত নিষ্পাদপ ভূমি দেখা যায়। উন্মুক্ত ভূমির উপর সারি সারি অসংখ্য তালপাতার ছাউনী। ছাউনীতে অগণিত মানুষ। মানুষগুলি মুসলমান সৈনিক, তাহাদের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া বোঝা যায়। মাটির উপর লম্বমান অনেকগুলি তালগাছের কাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ কামান; সৈনিকেরা কামানের গায়ে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে পাহাড়ের দিকে টানিয়া আনিতেছে। বেশি চেঁচামেচি সোরগোল নাই, প্রায় নিঃশব্দে কাজ হইতেছে।

বলরাম কিছুক্ষণ এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া অর্জুনের হাত ধরিয়া ভিতর দিকে টানিয়া লইল। রন্ধ্রমুখ হইতে কিছু দূরে বসিয়া দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলরাম হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়, আস্তে কথা বল। কী বুঝলে?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অর্জুন বলিল—'ওরা বহমনী রাজ্যের সৈন্য।'

বলরাম বলিল—'হুঁ। কত সৈন্য?'

'ছাউনী দেখে মনে হয় দশ হাজারের কম নয়। পিছনে আরো থাকতে পারে।'

'হুঁ! ওদের মতলব কি?'

'অর্কিতে বিজয়নগর আক্রমণ করা ছাড়া আর কী মতলব থাকতে পারে? ওরা এই সুড়ঙ্গের সন্ধান জানে, তাই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ঝোপ-ঝাড় কেটে পরিষ্কার করে রেখেছে। এইদিক দিয়ে সৈন্যরা বিজয়নগরে প্রবেশ করবে।'

'আর কামানগুলো? সেগুলো তো সুড়ঙ্গ দিয়ে আনা যাবে না।'

'সেইজন্যেই বোধহয় ওদের দেরি হচ্ছে। কামানগুলোকে আগে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নিয়ে যাবে, তারপর নিজেরা সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বলরাম থলি হইতে চিঁড়া-গুড় বাহির

করিয়া অর্জুনকে দিল, নিজেও লইল। বলিল—'এখন আমাদের কর্তব্য কি?'

অর্জুন বলিল—'এদের কার্যকলাপ আরো কিছুক্ষণ লক্ষ্য করা দরকার। আমরা যা অনুমান করছি তা ভুলও হতে পারে।'

দু'জনে নির্জলা প্রাতরাশ শেষ করিল। বলরাম বলিল—'ইতিমধ্যে আমার ছোট্ট কামানে বারুদ গেদে তৈরি হয়ে থাকি। যদি কেউ সুড়ঙ্গে মাথা গলায় তাকে বধ করব।'

অর্জুন বলিল—'প্রস্তুত থাকা ভাল। আমারও ভল্ল আছে।'

বলরাম থলি হইতে কামান বাহির করিল। কামানে বারুদ ও গুলি ভরিয়া নারিকেল ছোবড়ার দড়ির মুখে চক্‌মকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইল। তারপর দুইজনে রন্ধ্রমুখের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সৈন্যদের কার্যবিধি দেখিতে লাগিল।

যত বেলা বাড়িতেছে সৈনিকদের কর্মতৎপরতাও তত বাড়িতেছে। কয়েকজন সেনানী-পদস্থ ব্যক্তি সিপাহীদের কর্ম পরিদর্শন করিতেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, কামানগুলিকে টানিয়া পাহাড়ে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কামানগুলি এতই গুরুভার যে, কার্য অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

দ্বিপ্রহরে কিটি কিটি নাকাড়া বাজিল। এই নাকাড়ার ক্ষীণ শব্দ কাল রাত্রে তাহারা শুনিয়াছিল। সৈনিকেরা কর্মে বিরাম দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিল। বলরাম ও অর্জুন তখন রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিল। বলরাম বলিল—'আর সন্দেহ নেই। এখন কর্তব্য কী বল।'

অর্জুন বলিল—'কর্তব্য অবিলম্বে রাজাকে সংবাদ দেওয়া।'

বলরাম কিছুক্ষণ মাথা চুলকাইল। রাজা অর্জুনকে নির্বাসন দিয়াছেন, কিন্তু অর্জুন বিজয়নগরকে মাতৃভূমি জ্ঞান করে, বিজয়নগরকে সে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। বলরামেরও রক্ত তপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—'ঠিক কথা। কিন্তু রাজাকে অবিলম্বে সংবাদ কি করে দেওয়া যায়! আমি যেতে পারি, কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগবে। ততক্ষণে—' বলরাম রন্ধ্রমুখের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিল।

অর্জুন বলিল—'তুমি যাবে না, আমি যাব।'

বলরাম চমকিয়া বলিল—'তুমি যাবে! কিন্তু রাজ্যের মধ্যে ধরা পড়লেই তো তোমার মুণ্ড যাবে।'

অর্জুন বলিল—'যায় যাক। আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই। যদি বিজয়নগরকে রক্ষা করতে পারি—'

'অর্জুন, আমার কথা শোনো। তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি। কাল এই সময় পৌঁছুতে পারব।'

'না। ততক্ষণে শত্রু কামান নিয়ে পাহাড় পার হবে। আমি লাঠিতে চড়ে শীঘ্র যাব, আজ রাত্রেই রাজাকে সংবাদ দিতে পারব।'

'কিন্তু—তুমি বিজয়নগরকে এত ভালবাসো?'

'বিজয়নগরকে বেশি ভালবাসি, কি রাজাকে বেশি ভালবাসি, কি বিদ্যুন্মালাকে বেশি ভালবাসি, তা জানি না। কিন্তু আমি যাব।'

এই সময় বাধা পড়িল। রন্ধ্রমুখের বাহিরে মানুষের কণ্ঠস্বর। বলরাম ও অর্জুন দ্রুত উঠিয়া গুহামুখের পাশের দিকে সরিয়া গেল; বলরাম একবার গলা বাড়াইয়া দেখিল, তারপর অর্জুনের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'তিন-চারজন সেনানী এদিক পানে আসছে। তৈরি থাকো, ওরা গুহার মধ্যে পা বাড়ালেই কামান দাগব।' বলরাম ক্ষিপ্র হস্তে কামান ও আগুনের পলিতা হাতে লইয়া দাঁড়াইল।

সেনানীরা ঢালু জমি দিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাদের বাক্যাংশ বিচ্ছিন্নভাবে শোনা গেল—

'কামানগুলো আগে পাহাড়ের উপরে নিয়ে যেতে হবে, তারপর...'

'সৈন্যেরা যখন ইচ্ছা সুড়ঙ্গ পার হতে পারে...'

'তুমি সুড়ঙ্গে ঢুকে দেখেছ?'

'দেখেছি। মাঝখানে অন্ধকার বটে, কিন্তু মশাল জ্বাললে...'

'এস দেখি।'

রন্ধ্রের মুখ সংকীর্ণ, একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। বলরাম রন্ধ্রমুখের দিকে কামান লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল।

একটা মানুষ রন্ধ্রমুখে দেখা গেল। সে রন্ধ্রে প্রবেশ করিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে অমনি বলরামের কামান ছুটিল। গুহামধ্যে বিকট প্রতিধ্বনি উঠিল।

প্রবেশোন্মুখ লোকটার বুকে গুলি লাগিয়াছিল, সে রন্ধ্রের বাহিরে পড়িয়া গেল, তারপর ঢালু জমির উপর গড়াইতে গড়াইতে নীচে নামিয়া গেল। অন্য যাহারা সঙ্গে ছিল তাহারা এই অভাবনীয় বিপর্যয়ে ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

বলরাম উত্তেজিতভাবে অর্জুনের কানে কানে বলিল—'তুমি যাও, রাজাকে খবর দাও। আমি এখানে আছি। যতক্ষণ বারুদ আছে ততক্ষণ কাউকে গুহায় ঢুকতে দেব না।' সে আবার কামানে গুলি-বারুদ ভরিতে লাগিল।

'চললাম।' অর্জুন একবার বলরামকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। হয়তো আর দেখা হইবে না।

॥ পাঁচ ॥

সুড়ঙ্গের পূর্ব প্রান্তে নির্গত হইয়া অর্জুন আকাশের পানে চাহিল। মেঘ-ঢাকা আকাশে ছাই-ঢাকা অঙ্গারের মত সূর্য একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছে। এখনো দেড় প্রহর বেলা আছে। এই বেলা বাহির হইয়া পড়িলে সন্ধ্যার পর বিজয়নগরে পৌঁছানো যাইবে। অর্জুন উপত্যকায় নামিল, তারপর লাঠিতে চড়িয়া পূর্বমুখে দীর্ঘায়িত পদদ্বয় চালিত করিয়া দিল।

তেজস্বী অশ্ব যেরূপ শীঘ্র চলে, অর্জুন সেইরূপ শীঘ্র চলিয়াছে। তবু তাহার মনঃপূত হইতেছে না, আরো শীঘ্র চলিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার আশঙ্কা, যদি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, যদি ঘন মেঘের অন্তরালে সূর্য আকাশে অস্তমিত হয়, তাহা হইলে পথ চিনিয়া বিজয়নগরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। পথের একমাত্র নির্দেশ

দূরে বাম দিকে তুঙ্গভদ্রার উদ্বেল ধারা। তুঙ্গভদ্রার সমান্তরালে চলিলে পথ ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি প্রবল বারিধারায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তুঙ্গভদ্রাকে দেখা যাইবে না।

অর্জুন দুই দণ্ডে উপত্যকা পার হইল। তারপর উদ্‌ঘাতপূর্ণ শিলাবিকীর্ণ ভূমি, সাবধানে না চলিলে অপঘাতের সম্ভাবনা। অর্জুন সতর্কভাবে চলিতে লাগিল, তাহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হইল। তবু এই ভাবে চলিলে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে পৌঁছানো যাইতে পারে। এখনো প্রায় বিশ ক্রোশ পথ বাকি।

সূর্য দিগন্তের দিকে আরো নামিয়া পড়িল। দিক্‌চক্রে গাঢ় মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাই সূর্যাস্তের পূর্বেই চতুর্দিক ছায়াচ্ছন্ন, দূরের দৃশ্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তারপর হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা হইল। অর্জুনের একটি লাঠি পাথরের ফাটলের মধ্যে আটকাইয়া গিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অর্জুন প্রস্তুত ছিল না, হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িল।

ত্বরিতে উঠিয়া সে ভগ্ন লাঠি পরীক্ষা করিল। লাঠি ঠিক মাঝখানে ভাঙ্গিয়াছে, ব্যবহারের উপায় নাই। অর্জুন কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ভাঙ্গা লাঠি ফেলিয়া দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তর-কর্কশ ভূমির উপর দিয়া নগ্নপদে ছুটিয়া চলিল।

সূর্য অস্ত গেল। যেটুকু আলো ছিল তাহাও নিভিয়া গেল, আকাশের অষ্ট দিক হইতে যেন দলে দলে বাদুড় আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দিক্‌চিহ্নহীন ভূমিতলে আর কিছু দেখা যায় না।

অর্জুন তবু ছুটিয়া চলিয়াছে। শিলাঘাতে চরণ ক্ষতবিক্ষত, কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহার জ্ঞান নাই, তবু অন্তরের দুরন্ত প্রেরণায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

রাত্রি কত? প্রথম প্রহর কি অতীত হইয়া গিয়াছে! তবে কি আজ রাত্রে রাজার কাছে পৌঁছানো যাইবে না? অর্জুন থমকিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সহসা চোখে পড়িল বাম দিকে দিগন্তরেখার কাছে ক্ষুদ্র রক্তাভ একটি আলোকপিণ্ড।

প্রথমটা সে কিছু বুঝিতে পারিল না; তারপর মনে পড়িল—হেমকূট পর্বতের মাথায় অগ্নিস্তম্ভ। সে দিগ্‌ভ্রান্তভাবে দক্ষিণে চলিয়াছিল।

একটা নিশানা যখন পাওয়া গিয়াছে তখন আর ভাবনা নাই। বিজয়নগর এখনো অনেক দূরে, কিন্তু সেখান হইতে আলোর হাতছানি আসিয়াছে। অর্জুন অগ্নিবিন্দুটি সম্মুখে রাখিয়া আবার দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

মনে হইতেছে যেন অগ্নিবিন্দুটি আকারে বড় হইতেছে, শিখা দেখা যাইতেছে। বিজয়নগর আর বেশি দূর নয়।

তারপর হঠাৎ সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে সহসা তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, ক্ষণকাল শূন্যে পড়িতে পড়িতে সে ঝপাং করিয়া জলে পড়িল, পতনের বেগে জলে ডুবিয়া গেল। তারপর যখন সে মাথা জাগাইল তখন ভরা নদীর খরস্রোত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

আবার তুঙ্গভদ্রার জলে অবগাহন। কিন্তু এবার ভয় নাই। তুঙ্গভদ্রা তাহাকে বিজয়নগরে পৌঁছাইয়া দিবে।

•

অর্জুন চলিয়া যাইবার পর বলরাম কামানে গুলি-বারুদ ভরিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে বসিয়া রহিল। রন্ধ্রমুখের বাহির হইতে বহু কণ্ঠের উত্তেজিত কলরব আসিতেছে। কিন্তু রন্ধ্রমুখের কাছে কেহ আসিতেছে না। বলরাম দাঁত খিঁচাইয়া হিংস্র হাসি হাসিল, মনে মনে বলিল—'যিনি এদিকে আসবেন তাঁকে শহীদী'র শরবৎ পান করাব।*

দু'দণ্ড অপেক্ষা করিবার পর কেহ আসিতেছে না দেখিয়া বলরাম গুড়ি মারিয়া গুহামুখের নিকটে আসিল। বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিল, পঞ্চাশ হাত দূরে হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। ভিমরুলের চাকে ঢিল মারিলে যেরূপ হয় পরিস্থিতি প্রায় সেইরূপ;

---

*সেকালে মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত ছিল, হিন্দুকে মারিতে গিয়া যদি কোন মুসলমান মরে তবে সে শহীদীর শরবৎ পান করে। অর্থাৎ স্বর্গে যায়।

বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মত অগণিত মুসলমান সৈনিক বিভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, অধিকাংশ সৈনিক কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া আস্ফালন করিতেছে। কিন্তু মৃতদেহটা যেখানে গড়াইয়া পড়িয়াছিল সেখানেই পড়িয়া আছে, কেহ তাহার নিকটে আসিতে সাহস করে নাই। একদল সৈনিক অর্ধচন্দ্রাকারে কাতার দিয়া পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে তাকাইয়া আছে।

তাহাদের ভীতি ও বিভ্রান্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল কাছাকাছি শত্রু নাই। তাহারা ইতিপূর্বে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুড়ঙ্গের এপার ওপার দেখিয়া আসিয়াছে, জনমানবের দর্শন পায় নাই। হঠাৎ এ কী হইল? গুহার মধ্য হইতে কাহারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিল! কেমন অস্ত্র! তীর নয়, তীর হইলে দেহে বিঁধিয়া থাকিত। তবে কেমন অস্ত্র? আততায়ী মানুষ না জিন্! ছোট কামান যে থাকিতে পারে ইহা তাহাদের বুদ্ধির অতীত।

সেনানীরা নিজেদের মধ্যে এই অভাবনীয় ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। সকলেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। পাহাড় ডিঙ্গাইয়া কামান লইয়া যাওয়ার কাজও স্থগিত হইল। মৃতদেহটা সারাদিন পড়িয়া রহিল।

সূর্যাস্তের পর অন্ধকার গাঢ় হইলে একদল সৈনিক চুপি চুপি আসিয়া ভীত-চকিত নেত্রে রন্ধ্রের পানে চাহিতে চাহিতে মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া গেল। তারপর দীর্ঘকাল কোনো পক্ষেরই আর সাড়াশব্দ নাই।

মধ্যরাত্রে বলরাম কামান কোলে বসিয়া বসিয়া একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ একটা জ্বলন্ত মশাল গুহার মধ্যে আসিয়া পড়িল। বলরাম চমকিয়া আরো কোণের দিকে সরিয়া গেল, যাহাতে মশালের আলোকে তাহাকে দেখা না যায়। কামান উদ্যত করিয়া সে বসিয়া রহিল।

কিন্তু কেহ গুহায় প্রবেশ করিল না। মশালটা প্রচুর ধূম বিকীর্ণ করিতে করিতে নিভিয়া গেল।

দণ্ড দুই পরে আর একটা জ্বলন্ত মশাল আসিয়া পড়িল। বলরাম শত্রুপক্ষের মতলব বুঝিল; তাহারা আগুন ও ধোঁয়ার সাহায্যে গুহায় লুক্কায়িত আততায়ীকে বাহিরে আনিতে চাহে। সে চুপটি করিয়া রহিল।

ওদিকে বহমনী সেনানীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। যদি গুহায় লুক্কায়িত জীব বা জীবগণ মানুষ হয় তবে তাহারা নিশ্চয় বিজয়নগরের মানুষ। যদি বিজয়নগরের মানুষ আক্রমণের কথা জানিতে পারিয়া থাকে তাহা হইলে অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। এখন কী কর্তব্য? গুহানিবদ্ধ জীব সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা যায় না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আবার রন্ধ্রমুখের কাছে মশালের আলো দেখা গেল। এবার মশাল গুহামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল না; একজন কেহ গুহার বাহিরে অদৃশ্য থাকিয়া মশালটাকে ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে লাগিল।

বলরাম চুপটি করিয়া রহিল।

লোকটা তখন সাহস পাইয়া গুহার মধ্যে পা বাড়াইল। সে গুহার মধ্যে পদার্পণ করিয়াছে অমনি ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলরামের কামান গর্জন করিয়া উঠিল। লোকটা গলার মধ্যে কাকুতির ন্যায় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল, মশাল মাটিতে পড়িয়া দপ্‌দপ্ করিতে লাগিল।

লোকটা আর শব্দ করিল না, রন্ধ্রমুখের কাছে অনড় পড়িয়া রহিল। মশালের নিবন্ত আলোয় বলরাম আবার কামানে গুলি-বারুদ ভরিল। তাহার ইচ্ছা হইল উচ্চৈঃস্বরে গান ধরে—হরে মুরারে মধুকৈটভারে! কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিল।

অতঃপর আর কেহ আসিল না। মশালও না।

মহারাজ দেবরায় সান্ধ্য আহার শেষ করিয়া বিরামকক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন। মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ পালঙ্কের সন্নিকটে হর্ম্যতলে বসিয়া কোলের কাছে পানের বাটা লইয়া সুপারি কাটিতেছিলেন। কক্ষে

অন্য কেহ ছিল না; কক্ষের চারি কোণে দীপগুচ্ছ জ্বলিতেছিল। মন্ত্রী ও রাজা নিম্নস্বরে জল্পনা করিতেছিলেন।

মণিকঙ্কণা মাঝে মাঝে আসিয়া দ্বারের ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল। মন্ত্রীটা এখনো বসিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিতেছে। সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

রাজা শেষ পর্যন্ত বিদ্যুন্মালা সম্বন্ধে সকল কথা মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন। সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল, বিদ্যুন্মালাকে লইয়া কী করা যায়! অনেক আলোচনা করিয়াও সমস্যার নিষ্পত্তি হয় নাই।

সহসা বহির্দ্বারের ওপারে প্রতীহার-ভূমি হইতে উচ্চ বাক্যালাপের শব্দ শোনা গেল। মন্ত্রী ভ্রূ তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিলেন, রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তারপর একটি প্রতিহারিণী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'অর্জুনবর্মা মহারাজের সাক্ষাৎ চান।'

রাজা ও মন্ত্রী সবিস্ময় দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তারপর মন্ত্রী পানের বাটা সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'আমি দেখছি।'

মন্ত্রী দ্রুতপদে দ্বারের বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাজা কঠিন চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া ভ্রূবদ্ধ ললাটে বসিয়া রহিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী অর্জুনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অর্জুনের সর্বাঙ্গে জল ঝরিতেছে, বস্ত্র ও পদদ্বয় কর্দমাক্ত। সে টলিতে টলিতে আসিয়া রাজার সম্মুখে যুক্তকর ঊর্ধ্বে তুলিয়া অভিবাদন করিল, তারপর ছিন্নমূল বৃক্ষবৎ সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল।

মন্ত্রী ত্বরিতে তাহার বক্ষে হাত রাখিয়া দেখিলেন, বলিলেন—'অবসন্ন অবস্থায় মূর্ছা গিয়েছে। এখনি জ্ঞান হবে।' তিনি অর্জুনের মুখে যে দু'চার কথা শুনিয়াছিলেন তাহা রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজার মেরুদণ্ড ঋজু হইল।

'সত্য কথা?'

'সত্য বলেই মনে হয়। মিথ্যা সংবাদ দেবার জন্য ফিরে আসবে কেন?'

কিয়ৎকাল পরে অর্জুনের জ্ঞান হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া

বসিল, তারপর দণ্ডায়মান হইল; স্খলিত স্বরে বলিল—'মহারাজ, শত্রুসৈন্য পশ্চিম সীমান্তে রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করছে।'

রাজা বলিলেন—'বিশদভাবে বল।'

অর্জুন বিস্তারিতভাবে সকল কথা বলিল। শুনিয়া রাজা মন্ত্রীর দিকে ফিরিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ—'

কিন্তু মন্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন না। মন্ত্রী কখন অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সহসা বাহিরে ঘোর রবে রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়া বাজিয়া চলিল, দূর দূরান্তরে নিনাদিত হইল। বহু দূরে অন্য দুন্দুভি রাজপুরীর দুন্দুভিধ্বনি তুলিয়া লইয়া বাজিতে লাগিল। রাজ্যময় বার্তা ঘোষিত হইল—শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, সতর্ক হও, সকলে সতর্ক হও, সৈন্যগণ প্রস্তুত হও।

ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ কটিতে তরবারি বাঁধিতে বাঁধিতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ও মন্ত্রীতে দ্রুত বাক্যালাপ হইল—

'সব প্রস্তুত।'

'রাজধানীতে কত সৈন্য আছে?'

'ত্রিশ হাজার।'

রাজা বলিলেন—'বহমনী যখন পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করেছে তখন পূর্বদিক থেকেও একসঙ্গে আক্রমণ করবে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'আমারও তাই মনে হয়।—এখন আদেশ?'

'রাজধানী রক্ষার জন্য নগরপাল নরসিংহ মল্লের অধীনে দশ হাজার সৈন্য থাক। আমি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে পশ্চিম সীমান্তে যাচ্ছি, আপনি দশ হাজার নিয়ে পূর্ব সীমান্তে যান।'

'ভাল। কখন যাত্রা করা যাবে?'

'মধ্য রাত্রি অতীত হবার পূর্বেই।'

'তবে মশালের ব্যবস্থা করি। জয়োস্তু মহারাজ।' মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। অর্জুনের দিকে কেহ দৃক্‌পাত করিল না। দুন্দুভি বাজিয়া চলিল।

মণিকঙ্কণা এত রাত্রে দুন্দুভির শব্দ শুনিয়া হতচকিত গিয়াছিল, সে রাজার কাছে ছুটিয়া আসিল। অর্জুনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—'এ কি!'

রাজা বলিলেন—'মণিকঙ্কণা! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। পিঙ্গলাকে ডাকো, আমার রণসজ্জা নিয়ে আসুক।'

মণিকঙ্কণা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া পিছু হটিতে হটিতে চলিয়া গেল।

'মহারাজ—'

রাজা অর্জুনের দিকে চাহিলেন। অর্জুনের অস্তিত্ব তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অর্জুন বলিল—'মহারাজ, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, বিজয়নগরে ফিরে এসেছি, সেজন্য দণ্ডার্হ।'

রাজা বলিলেন—'তোমার দণ্ড আপাতত স্থগিত রইল। তুমি কারাগারে বন্দী থাকবে। আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমার বিচার করব। যদি তোমার সংবাদ মিথ্যা হয়—'

অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদি আমার সংবাদ মিথ্যা হয়, তৎক্ষণাৎ আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন।'

রাজা ক্ষণেক বিবেচনা করিলেন—'উত্তম। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

'ধন্য মহারাজ।'

পিঙ্গলা রাজার বর্মচর্ম শিরস্ত্রাণ ও তরবারি লইয়া প্রবেশ করিল।

॥ ছয় ॥

সে-রাত্রে বিজয়নগর রাজ্যে কাহারো নিদ্রা আসিল না। রাত্রির আকাশ ভরিয়া রণদুন্দুভির নিনাদ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দুন্দুভি ধ্বনির তাৎপর্য বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হয় নাই। যুদ্ধ!

শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। দূর গ্রামে গ্রামে গৃহস্থেরা দুন্দুভি শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, ঘরে অস্ত্রশস্ত্র যাহা ছিল তাহাতে শাণ দিতে লাগিল। নগরের সাধারণ জনগণ পরস্পরের গৃহে গিয়া উত্তেজিত জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিল; ধনী ব্যক্তিরা সোনাদানা লুকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। গণ্যমান্য রাজপুরুষেরা রাজসভার দিকে ছুটিলেন। সৈনিকেরা বর্মচর্ম পরিয়া প্রস্তুত হইল। অনেকদিন পরে যুদ্ধ। সৈনিকদের মনে হর্ষোদ্দীপনা, মুখে হাসি; সৈনিকবধূদের চোখে আশঙ্কার অশ্রুজল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে রাজা ও লক্ষ্মণ মল্লপ দুই দল সৈন্য লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকদের হস্তধৃত মশালশ্রেণী অন্ধকারে জ্বলন্ত ধূমকেতুব ন্যায় বিপরীত মুখে ছুটিয়া চলিল।

তিন রানী নিজ নিজ ভবনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকার শয্যায় শয়ন করিলেন। পদ্মালয়াম্বিকা শিশুপুত্র মল্লিকার্জুনকে বুকে লইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ ব্যাপারে নারীর করণীয় কিছু নাই, তাহারা কেবল কাল্পনিক বিভীষিকার আগুনে দগ্ধ হইতে পারে।

বিদ্যুন্মালা নিজের স্বতন্ত্র কক্ষে ছিলেন। তিনি কক্ষের বাহিরে যাইতেন না, মণিকঙ্কণা মাঝে মাঝে দ্বারের নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। একগৃহে থাকিয়াও দুই ভগিনীর মাঝখানে দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছিল। আজ বিদ্যুন্মালা নিজ শয্যায় জাগিয়া শুইয়াছিলেন; মণিকঙ্কণা আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিল, জলভরা চোখে বলিল—'রাজা যুদ্ধে চলে গেলেন।'

বিদ্যুন্মালা সবিশেষ কিছু জানিতেন না, কিন্তু রাজপুরীতে উত্তেজিত ছুটাছুটি দেখিয়া ও দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে। তিনি মণিকঙ্কণার হাতের উপর হাত রাখিলেন, কিছু বলিলেন না। মণিকঙ্কণা আবার বলিল—'অর্জুনবর্মা এসেছিলেন।'

বিদ্যুন্মালা উঠিয়া বসিলেন, মণিকঙ্কণার মুখের কাছে মুখ আনিয়া সংহত স্বরে বলিলেন—'কি বললি? কে এসেছিলেন?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'অর্জুনবর্মা এসেছিলেন। মাথার চুল থেকে জল ঝরে পড়ছে, কাপড় ভিজে; পাগলের মত চেহারা। রাজাকে কী বললেন, রাজা তাঁকে নিয়ে যুদ্ধে চলে গেলেন।'

বিদ্যুন্মালার দেহ কাঁপিতে লাগিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন, রাজা অর্জুনবর্মাকে নির্বাসন দিয়াছেন। তারপর হঠাৎ কী হইল! অর্জুনবর্মা ফিরিয়া আসিলেন কেন? অনিশ্চয়ের সংশয়ে তাঁহার অন্তর মথিত হইয়া উঠিল।

মণিকঙ্কণার অন্তরে অন্য প্রকার মন্থন চলিতেছে। রাজা যুদ্ধে গিয়াছেন। যাহারা যুদ্ধে যায় তাহারা সকলে ফিরিয়া আসে না। রাজা যদি ফিরিয়া না আসেন! সে অবসন্নভাবে বিদ্যুন্মালার পাশে শয়ন করিল, বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইয়া ম্রিয়মাণ স্বরে বলিল—'মালা, কি হবে ভাই?'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না। সারা রাত্রি দুই ভগিনী পরস্পরের গলা জড়াইয়া জাগিয়া রহিলেন।

বলরাম রাত্রে ঘুমায় নাই, রন্ধ্রের মধ্যে একটি মৃতদেহকে সঙ্গী লইয়া জাগিয়া ছিল। আবার যদি কেহ আসে তাহাকে 'শহীদী'র শরবৎ পান করাইতে হইবে।···অর্জুন কি বিজয়নগরে পৌঁছিয়াছে? রাজাকে সংবাদ দিতে পারিয়াছে? সংবাদ পাইয়া রাজা কি তৎক্ষণাৎ সৈন্য সাজাইয়া বাহির হইবেন! যদি বিলম্ব করেন—

সকাল হইল। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত, সাময়িকভাবে মেঘ সরিয়া গিয়াছে। বলরামের কৌতূহল হইল, দেখি তো মিঞা সাহেবরা কি করিতেছে। সে পাশের দিক দিয়া রন্ধ্রমুখের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ড ধক্ করিয়া উঠিল।

মুসলমান সৈনিকেরা একটা প্রকাণ্ড কামান ঘুরাইয়া সুড়ঙ্গের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়াছে এবং তাহাতে বারুদ ভরিতেছে। উদ্দেশ্য সহজেই অনুমান করা যায়; কামান দাগিয়া তাহারা গুহামুখ

ভাঙ্গিয়া দিবে, সেখানে যে অদৃশ্য শত্রু লুকাইয়া আছে তাহাকে বধ করিবে।

বলরাম দেখিল, কামানের গোলা রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে জীবনের আশা নাই। সে আর বিলম্ব করিল না, ঝোলা লইয়া যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে দ্রুত ফিরিয়া চলিল। প্রথম বাঁকের মুখে আসিয়া সে দেখিল এই স্থান বহুলাংশে নিরাপদ; কামানের গোলা সিধা পথে চলে, মোড় ঘুরিয়া আসিতে পারিবে না। সে বাঁক অতিক্রম করিয়া সুড়ঙ্গ মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বিরাট শব্দ করিয়া কামানের গোলা রন্ধ্র মধ্যে আসিয়া পড়িল। বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙ্গিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ হইয়া গেল। ভাগ্যক্রমে ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলা বলরামের নিকট পৌঁছিল না।

এতক্ষণ যতটুকু আলো ছিল তাহাও আর রহিল না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বলরাম হাত বাড়াইয়া গুহাপ্রাচীর অনুভব করিতে করিতে পূর্বমুখে চলিল। মুসলমানেরা যদি ইতিমধ্যে পাহাড় ডিঙ্গাইয়া সুড়ঙ্গের পূর্বদিকে পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে—!

অর্জুন রাজাকে লইয়া ফিরিবে কি না, কখন ফিরিবে, কে জানে!

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটা ধ্বনির অনুরণন বলরামের কানে আসিল। মানুষের কণ্ঠস্বর, দূর হইতে আসিতেছে। কিন্তু পাষাণগাত্রে প্রতিহত হইয়া বিকৃত হইয়াছে। শব্দের অর্থবোধ হয় না।

বলরাম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল। ধ্বনি ক্রমশ কাছে আসিতেছে, স্পষ্ট হইতেছে। তারপর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হইল—'বলরাম ভাই!'

মহাবিস্ময়ে বলরাম চীৎকার করিয়া উঠিল—'অর্জুন ভাই!'

অন্ধকারে হাতে হাত ঠেকিল, দুই বন্ধু আলিঙ্গনবদ্ধ হইল।

'বলরাম ভাই, তুমি বেঁচে আছ!'

'আছি। তুমি রাজার দর্শন পেয়েছ?'

'পেয়েছি। রাজা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কামানের শব্দ শুনলাম। ওরা কামান দাগছে?'

'হাঁ। কামান দেগে গুহার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে।'

'যাক, আর ভয় নেই। এস।'

বিজয়নগরের দশ হাজার সৈন্য পর্বতের পদমূলে সমবেত হইয়াছিল। রাজার আদেশে তাহারা ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

পর্বতের পরপারে বহমনী সৈন্যদল যখন দেখিল বিজয়নগরবাহিনী সত্যই উপস্থিত আছে তখন তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল না, কামান ও ছত্রাবাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সেকালের মুসলমানেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল, সম্মুখ-যুদ্ধে কখনো পশ্চাৎপদ হইত না। কিন্তু গুলবর্গার বহমনী সুলতান আহমদ শা'র নিকট খবর পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে।

বর্ষাকাল বিজয় অভিযানের উপযুক্ত কাল নয়; অবশ্য অতর্কিত আক্রমণ করিয়া পররাজ্য খানিকটা দখল করিয়া বসিতে পারিলে লাভ আছে, কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধ অসমীচীন। তিনি তাই সৈন্যদলকে ফিরিয়া আসিবার আদেশ পাঠাইয়াছিলেন।

বহমনী সৈন্যদল যুদ্ধ-স্পৃহা দমন করিয়া চলিয়া গেল। বিজয়নগরের সৈন্যদলও নিজ রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘন করিল না। অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

মহারাজ দেবরায় দুই হাজার সৈন্য পশ্চিম সীমান্তে রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জুন ও বলরাম তাঁহার সঙ্গে আসিল।

ওদিকে পূর্ব-সীমানা হইতে ধন্নায়ক লক্ষ্মণও ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে শত্রুসৈন্য নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, নদীর পরপারে বিজয়নগরের বাহিনী উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাহারা বিমর্ষভাবে প্রস্থান করিল।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী বহিঃশত্রু সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া অ াভ্যন্তরিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

শ্রাবণ মাস সমাগত। রাজগুরু বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন; শ্রাবণের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বিবাহ। সুতরাং বিবাহের কথাই সর্বাগ্রে চিন্তনীয়।

রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া মতলব স্থির করিয়াছেন যাহাতে সব দিক রক্ষা হয়।। মতলব স্থির করিয়া তাঁহারা রাজগুরুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছেন। রাজগুরু পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সামান্য কৈতবে সম্মতি দিয়াছেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া মহারাজ বিরাম-কক্ষে আসিয়া বসিলেন। পিঙ্গলার হাত হইতে পান লইয়া বলিলেন—'বিদ্যুন্মালাকে পাঠিয়ে দাও। আর মণিকঙ্কণাকে আটকে রাখো। সে যেন এখন এখানে না আসে।'

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুন্মালা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কয়দিনে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়াছে, মুখে রক্তহীন পাণ্ডুতা। গতিভঙ্গী ঈষৎ আড়ষ্ট। তিনি রাজার সম্মুখে আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইলেন।

রাজা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'শেষবার প্রশ্ন করছি। তুমি আমাকে বিবাহ করতে চাও না?'

বিদ্যুন্মালা নত নয়নে নির্বাক রহিলেন।

রাজা বলিলেন—'অর্জুনকেই তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর পাত্র মনে কর!'

এবারও বিদ্যুন্মালা নীরব, কেবল তাঁহার অধর ঈষৎ কম্পিত হইল।

রাজা একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—'স্ত্রীজাতির চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়। যাহোক, তুমি যখন পণ করেছ অর্জুনকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না তখন তাই হবে, অর্জুনের সঙ্গেই তোমার বিবাহ দেব।'

বিদ্যুন্মালার মুখ অতর্কিত ভাবসংঘাতে অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল,

অধরোষ্ঠ বিবৃত হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। তিনি একবার ভয়সংকুল চক্ষু রাজার দিকে তুলিয়া আবার নত করিয়া ফেলিলেন। তারপর কম্পিত দেহে ভূমির উপর রাজার পদমূলে বসিয়া পরিলেন।

রাজা অঙ্গুলি তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু একটি শর্ত আছে।'

বিদ্যুন্মালা ভয়ে ভয়ে আবার চক্ষু তুলিলেন। শর্ত! কিরূপ শর্ত!

রাজা বলিলেন—'তোমার বিদ্যুন্মালা নাম আর চলবে না। আজ থেকে তোমার নাম—মণিকঙ্কণা। বুঝলে?'

বিদ্যুন্মালা কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু ইহাই যদি শর্ত হয় তবে ভয়ের কী আছে? তিনি ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

রাজা তখন ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—'আমি গজপতি ভানুদেবের কন্যা বিদ্যুন্মালাকে বিবাহ করব বলে তাকে এখানে এনেছি। কিন্তু তুমি যদি অর্জুনকে বিবাহ কর তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়; সুতরাং আজ থেকে তোমার নাম মণিকঙ্কণা।—যাও, আসল মণিকঙ্কণাকে পাঠিয়ে দাও।'

বিদ্যুন্মালা নত হইয়া রাজার পায়ের উপর মাথা রাখিলেন; উদ্বেলিত অশ্রুধারায় রাজার চরণ নিষিক্ত হইল।

বিদ্যুন্মালা চলিয়া যাইবার পর মণিকঙ্কণা আসিল। তাহারও গতিভঙ্গী শঙ্কাজড়িত, চক্ষু সংশয়ে বিস্ফারিত; সে অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিল—'মহারাজ আমাকে ডেকেছেন?'

রাজা বলিলেন—'হ্যাঁ। এস, আমার কাছে বোসো।'

মণিকঙ্কণা আসিয়া পালঙ্কের পাশে বসিল, বলিল—'মালা কাঁদছে কেন?'

রাজা বলিলেন—'আমি বকেছি। আমাকে বিয়ে করতে চায় না, তাই বকেছি।'

মণিকঙ্কণার মুখ ধীরে ধীরে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এক দৃষ্টে রাজার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রাজা বলিলেন—'ও যখন আমাকে বিবাহ করতে চায় না তখন তোমাকেই আমি বিবাহ করব।—কেমন, রাজী?'

মণিকঙ্কণার মুখখানি আনন্দে উত্তেজনায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। রাজা তর্জনী তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু একটি শর্ত আছে। আজ থেকে তোমার নাম—বিদ্যুন্মালা। মণিকঙ্কণা নামটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

এই শর্ত! বিগলিত হাস্যে মণিকঙ্কণা মহারাজের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল!

সন্ধ্যার পর মহারাজের বিরামকক্ষে দীপাবলী জ্বলিয়াছে। রাজা একটি কোষবদ্ধ তরবারি কোলের উপর লইয়া পালঙ্কে বসিয়া আছেন। পালঙ্কের পাশে ভূমিতে বসিয়া মন্ত্রী নির্লিপ্তভাবে কুচ্‌কুচ্‌ সুপারি কাটিতেছেন।

অর্জুনবর্মা আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। নাগরিকের ন্যায় পরিচ্ছন্ন বেশবাস; হাতে অস্ত্র নাই। রাজা তাহার আপাদমস্তক দেখিলেন। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, আমার আদেশে তুমি বিজয়নগর থেকে নির্বাসিত হয়েছিলে। সে আদেশ আমি প্রত্যাহার করলাম। তুমি দেশভক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছ। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে মাতৃভূমিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। তোমাকে আমার তুরঙ্গ বাহিনীর সেনানী নিযুক্ত করলাম। এই নাও তরবারি!'

অর্জুন নতজানু হইয়া দুই হস্তে তরবারি গ্রহণ করিল। তারপর রাজা হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় দিবার উপক্রম করিলে মন্ত্রী রাজার মুখের পানে চাহিয়া হাসিলেন; রাজা তখন বলিলেন—'হ্যাঁ, ভাল কথা। আগামী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিঙ্গ-রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ। প্রস্তুত থেকো।'

অর্জুন হতবুদ্ধি ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আভূমি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অর্জুনের পর বলরাম আসিল। প্রণাম করিয়া রাজার পায়ের

কাছে মাটিতে বসিল। রাজা কিছুক্ষণ কঠোর নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার অজ্ঞাতসারে অর্জুনের সঙ্গে পালিয়েছিলে, সেজন্য দণ্ডার্হ।'

বলরাম হাত জোড় করিল—'মহারাজ, ছেলেটা বড় কাতর হয়ে পড়েছিল তাই সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

মহারাজ বলিলেন--'হুঁ! তুমি ক'টা ম্লেচ্ছ মেরেছ?'

বলরাম বিরসমুখে বলিল—'আজ্ঞা মাত্র তু'টি।'

'আনুপূর্বিক বল।'

বলরাম সেদিন বিজয়নগর ত্যাগের পর হইতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া রাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন--'সমস্তই দৈবের লীলা। হয়তো এইজন্যই হুক্ক-বুক্ক এসেছিলেন। যাহোক, উপস্থিত তোমাদের ক্ষিপ্রবুদ্ধির জন্য বিপদ নিবারিত হয়েছে। তুমি যদিও দণ্ডনীয় তবু তোমাকে পুরস্কৃত করব।'—উপাধানের তলদেশ হইতে একটি সোনার অঙ্গদ বাহির করিয়া রাজা বলরামকে দিলেন—'এই নাও অঙ্গদ, পরিধান কর। এখন থেকে তুমি প্রধান রাজকর্মকার, অস্ত্রাগারের সমস্ত কর্মকার তোমার অধীনে কাজ করবে।'

বলরাম বাহুতে অঙ্গদ পরিল, মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর আবার হাত জোড় করিল—'মহারাজ, দীনের একটি নিবেদন আছে।'

রাজা বলিলেন—'ভয় নেই, তোমার গুপ্তবিদ্যা প্রকাশ করতে হবে না।'

বলরাম বলিল—'ধন্য মহারাজ! আর একটি নিবেদন আছে।'

'আবার নিবেদন! কী নিবেদন?'

'মহারাজ, আমি বিবাহ করতে চাই।'

মহারাজের মুখে ধীরে ধীরে কৌতুকহাস্য ফুটিয়া উঠিল--'তুমিও বিবাহ করতে চাও! কাকে?'

'মহারাজ, তার নাম মঞ্জিরা। আপনার অন্তঃপুরে রন্ধনশালার দাসী।'

'তার পিতৃ-পরিচয় আছে ?'

'আছে মহারাজ। মঞ্জিরার পিতার নাম বীরভদ্র, তিনি মহারাজের হাতিশালার একজন হস্তিপক। তাঁর অনুমতি চাইতে গিয়েছিলাম : তিনি বললেন, মহারাজ যদি অনুমতি দেন তাঁর আপত্তি নেই।'

রাজা কুতূহল-ভরা চক্ষে কিছুক্ষণ বলরামকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'বীরভদ্রের যদি আপত্তি না থাকে আমারও আপত্তি নেই। তুমি ধূর্ত বাঙ্গালী, তোমাকে বেঁধে রাখবার জন্য কঠিন শৃঙ্খল চাই। —এখন যাও, আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন তোমার বিবাহ হবে।'

বলরাম মহানন্দে প্রণাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা মন্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিলেন—'মন্দ হল না। একসঙ্গে তিনটে বিবাহ। যত বেশি হয় ততই ভাল। বরযাত্রীদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হবে।'

॥ সাত ॥

রাজা এবং রাজকুলোদ্ভব পাত্রপাত্রীদের বিবাহ হইবে পম্পাপতির মন্দিরে, ইহাই চিরাচরিত বিধি। রাজার অনুমতি থাকিলে অন্য বিবাহও পম্পাপতির মন্দিরে সম্পাদিত হইতে পারে।

রাজার বিবাহের তিথি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার পর রাজ্যময় উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। রাজা ইতিপূর্বে তিনবার বিবাহ করিয়াছেন, চতুর্থ বারে বেশি ধুমধাম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সদ্য বিপন্মুক্তির পর রাজার বিবাহ, তাই উৎসব একটু বেশি জাঁকিয়া উঠিল। গৃহে গৃহে পুষ্পমালা ঝুলিল, নানা বর্ণের কেতন উড়িল। নাগরিকারা দলবদ্ধভাবে গীত গাহিতে গাহিতে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। চতুষ্পথে চতুষ্পথে বাজীকরের খেলা; মাঠে মাঠে মল্লযোদ্ধাদের বাহ্বাস্ফোট, হাতীর লড়াই; তুঙ্গভদ্রার বুকে বিচিত্র

নৌকাপুঞ্জের সম্মিলিত জলকেলি। বিজয়নগরের প্রজাগণ রাজাকে ভালবাসে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

রাজসভার প্রাঙ্গণেও বিপুল মণ্ডপ রচিত হইয়াছে। সেখানে অহোরাত্র পান ভোজন, রঙ্গরস, নৃত্যগীত চলিয়াছে।

তারপর বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। হাতী-ঘোড়ার শোভাযাত্রা; সৈন্যবাহিনী বাজনা বাজাইয়া সদর্পে কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল। দলে দলে নাগরিক নাগরিকা মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পম্পাপতির মন্দিরের দিকে ধাবিত হইল; তাহারা রাজার বিবাহ দেখিবে।

রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী একটি ভৃঙ্গারে কোহল লইয়া অতিথি-ভবনে উপস্থিত হইলেন। রসরাজ সবেমাত্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জলযোগে বসিয়াছিলেন; দামোদর স্বামী দ্বারের নিকট হইতে ডাকিলেন—'বন্ধু, আমি এসেছি।'

ক্ষীণদৃষ্টি রসরাজ গলা শুনিয়া চিনিতে পারিলেন—'আরে বন্ধু, এস এস।'

দামোদর আসিয়া বসিলেন, ভৃঙ্গারটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—'আজ মহা আনন্দের দিন, তাই তোমার জন্য একটু কোহল এনেছি। সদ্য প্রস্তুত তাজা কোহল, তুমি একটু চেখে দেখ।'

'এ বড় উত্তম কথা। আমার কোহল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং এস, তোমার কোহলই পান করা যাক।'

দুই বন্ধুর উৎসব আরম্ভ হইয়া গেল।

ওদিকে অন্যান্য কন্যাযাত্রীরাও উপেক্ষিত হয় নাই। এতদিন তাহারা রাজার আতিথ্যে পানাহার বিষয়ে পরম আনন্দেই ছিল, কিন্তু আজ তাহাদের সমাদর দশগুণ বাড়িয়া গেল। রাজপুরী হইতে ভারে ভারে মিষ্টান্ন পক্কান্ন পরমান্ন আসিল। সেই সঙ্গে কলস কলস সুরা। একদল রাজপুরুষ আসিয়া মিষ্টভাষায় সকলকে অনুরোধ উপরোধ নির্বন্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন; একবার স্বয়ং রাজা আসিয়া সকলকে

য়া গেলেন। কন্যাযাত্রীরা মাতিয়া উঠিল; অপর্যাপ্ত
রের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্যগীত লম্ফঝম্প
ড়াকৌতুক আরম্ভ করিয়া দিল।

ফলে, বিবাহের লগ্নকাল যখন উপস্থিত হইল তখন দেখা গেল
কাংশ কন্যাযাত্রীই ধরাশায়ী; যাহাদের একটু সংজ্ঞা আছে
রা বিগলিত কণ্ঠে অশ্লীল গান গাহিতেছে এবং নিজ উরুদেশে
বাজাইতেছে।

রসরাজের অবস্থাও অনুরূপ। বস্তুত গান না গাহিলেও তিনি
স্বরে কাব্যশাস্ত্রের রসালো স্থানগুলি আবৃত্তি করিতেছেন এবং
সিক্ত মসৃণ হাস্য করিতেছেন। কয়েকজন রাজপুরুষ আসিয়া
হাকে গরুর গাড়িতে তুলিয়া বিবাহস্থলে লইয়া গেল। কারণ,
নি কন্যাকর্তা, বিবাহ-বাসরে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

রাজপুরুষেরা রসরাজকে লইয়া বিবাহসভার পুরোভাগে বসাইয়া
। পাশাপাশি তিন জোড়া বর-কন্যা বসিয়া আছে: রসরাজ
খিলেন—ছয় জোড়া বর-কন্যা। তিনি পাত্র-পাত্রীর মুখ-চোখ ভাল
রিয়া দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার কী আছে?
তার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি আনন্দাশ্রু মোচন করিলেন,
তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অচিরাৎ উপবিষ্ট
স্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যথাকালে বিবাহক্রিয়া শেষ হইল। সকলে জানিল, কলিঙ্গের
কন্যা বিদ্যুন্মালার সঙ্গে রাজার বিবাহ হইয়াছে। সন্দেহের
না কারণ নাই, তাই কেহ কিছু সন্দেহ করিল না। দর্শকেরা
দধ্বনি করিতে করিতে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল।

॥ আট ॥

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে কন্যাযাত্রীর দল মহা বাদ্যোদ্যম করিয়া বহিত্রে
। শ্রাবণের ভরা তুঙ্গভদ্রা দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে,

বহিত্র তিনটি স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল। যাত্রীরা এই
রাজ-সমাদরে খুবই সুখে ছিল, কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে গৃ
মন টানিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সকলে বহিত্রের পাটাত
জল্পনা করিতে লাগিল, বহিত্রগুলি দেড় মাসে কলিঙ্গপত্তনে
কিংবা দুই মাসে ফিরিবে। স্রোতের মুখে নৌকা শীঘ্র চ
আরো শীঘ্র চলে।

বিজয়নগর হইতে দূরে তুঙ্গভদ্রার শিলাবন্ধুর সৈক
গ্রামটির কথা ভুলিলে চলিবে না। সেখানে মন্দোদরী
চিপিটকমূর্তি আছেন। মন্দোদরীর মনে কোনো খেদ নাই।
স্বামী পাইয়াছে, গ্রামবধূরা তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়
সে গ্রামের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছে, সকলের সঙ্গে প্র
কথা বলিতে পারে। আর কী চাই? গ্রামে তাহার মন বসি
সারা জীবন এই গ্রামে কাটাইতে পারিলে সে আর কিছু চা

চিপিটকের মনের অবস্থা কিন্তু মন্দোদরীর মত নয়।
মাসে গ্রামের পরিবেশ তাঁহার কাছে সহনীয় হইয়াছে, কি
ফিরিবার আশা তিনি ছাড়েন নাই। এখানে ছাগল চরা
কষ্টকর কর্ম নয়, কিন্তু আত্মমর্যাদার হানিকর। তিনি রাজ
একথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আকাশ লঘু মেঘে ঢাকা ছিল, সূ
থাকিয়া ঘোমটা সরাইয়া নববধূর মত সলজ্জ দৃষ্টিপাত ক
চিপিটক ভোজনান্তে ছাগলের পাল লইয়া বনের দিকে যাই
মন্দোদরীকে বলিয়া গেলেন—'নদীর ধারে যাবি। যদি নৌক

মন্দোদরী বলিল—'আচ্ছা গো আচ্ছা। তিন মাস
ধারে যাচ্ছি, আজও যাব। কিন্তু কোথায় নৌকা! তারা
বসে আছে, কোন্‌কালে দেশে ফিরে গেছে।'

'তবু যাস্‌।' চিপিটক গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ছাগল চরাই
গেলেন। তাঁহার আশার প্রদীপ ক্রমেই নির্বাপিত হইয়া আ